ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ

ডঃ সুধা বসু

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ

ডঃ সুধা বসু

পরিবেশক ঃ
সংস্কৃত বুক ডিপো (প্রা) লিঃ
২৮/১ বিধান সরণী। কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ৩৪-৫১৩৯

প্রকাশক : অমিয় বসু
২৯ গড়পার রোড। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৪

[redacted] Library
[redacted]

মুদ্রণ : জাগরণী প্রেস
৪০-১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ : শ্যামদুলাল কুণ্ডু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭/২, বিধান সরণী। কলকাতা-৬

গ্রন্থন : ডি. এম. বাইণ্ডিং এণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৯ অ্যান্টনীবাগান লেন। কলকাতা-৯

দাম : ত্রিশ টাকা
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

উৎসর্গ

প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব
আচার্য স্বর্গত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ।

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি উপাধির জন্যে অনুমোদন লাভের, বিশেষ করে লেখিকার অকালমৃত্যুর, পর থেকে ধূলি সঞ্চয় করছিল। গ্রন্থাকারে এর প্রকাশ নিছক স্মৃতিরক্ষার তাগিদে নয়, যদিও গ্রন্থপ্রকাশের পিছনে এ-জাতীয় কোনো কারণ থাকা অসঙ্গতও নয়। 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' লেখিকার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল ; আশা করা যায়, গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সাহিত্যের ছাত্র, গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে আদৃত হবে।

লেখিকার যে-সব শুভানুধ্যায়ী এই গ্রন্থের প্রকাশনায় নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাঁরা সকলেই প্রকাশকের কৃতজ্ঞতাভাজন। ভক্তি-দর্শনের মর্মজ্ঞ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের অগ্রগণ্য রসবেত্তা, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, 'শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রণেতা আচার্য শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয় একটি মূল্যবান ভূমিকা রচনা করে গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় গবেষণা-পর্যায়ে লেখিকার অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন ; পরে শারীরিক অসামর্থ্য উপেক্ষা করে লেখিকার প্রতি আজীবন স্নেহবশত একটি বিস্তৃত গ্রন্থ-পরিচিতি লিখে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনার গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীশচীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁদের ঋণ স্বীকার করি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি অপরিশোধ্য ঋণের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা 'যুগান্তর' পত্রিকার যুগ্ম বার্তা-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার সরকার মহাশয়ের কাছে। এই গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা তাঁর, মুদ্রণ

ও প্রকাশের যাবতীয় কৃতিত্বও সম্পূর্ণত তাঁর। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর উদ্যোগ ও উৎসাহেই 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' প্রকাশ করা সম্ভব হল।

পরিশেষে, গ্রন্থের মুদ্রণ-প্রমাদ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। জাগরণী প্রেসের কর্মীরা নির্ভুল প্রকাশনার ব্যাপারে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের অনবধানতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমাদের অনভিজ্ঞতার দরুণ কিছু ভুল শেষ পর্যন্ত থেকেই গেছে। এই সব ভুলের মধ্যে যেগুলি সহজেই ধরা যায় নিষ্প্রয়োজনবোধে তার উল্লেখ করা হল না, যেগুলি গুরুতর এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে কেবল সেইগুলিরই সংশোধিত পাঠ গ্রন্থের শেষে দেওয়া হল। এছাড়া আর একটি বিষয়ের প্রতি এই প্রসঙ্গে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নিতান্ত অনবধানতাবশত কবি জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে (৮২ পৃষ্ঠা) লেখিকা যে-ভুল করেছিলেন পরবর্তী স্তরে সংশোধন ও পরিমার্জনের কালেও সেই ত্রুটি দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

গ্রন্থ-পরিচিতি

অবতরণিকা ১—৬৬

আলোচ্য বিষয়—১, আলোচনার উপাদান—২, শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা-বিচার—৩, শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ মানব—৫, শ্রীকৃষ্ণ এক, না, একাধিক—৬, ঋগ্বেদ ও পুরাণের কৃষ্ণ—৬, ছান্দোগ্য উপনিষদ ও পুরাণের কৃষ্ণ—৭, পুরাণের কৃষ্ণ ও খৃষ্টান প্রভাব—১০, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল—১১, কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত—১৩, ভক্তিধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব-কৃষ্ণ: সেইধর্মের সামান্য লক্ষণ—১৪, ভাগবতধর্মের উৎস গ্রন্থসমূহ—১৫, পঞ্চরাত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব—১৬, বৈষ্ণবধর্মে পঞ্চরাত্রের প্রভাব—১৯, ভাগবতধর্মের বেদমূলকতা বিচার—২০, পঞ্চরাত্রের বৈদিকতা বিচার—২৩, ভাগবতধর্মে খৃষ্টধর্মের প্রভাব—২৬, ভাগবতধর্মের বৈদিকীকরণ—২৮, বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু ও নারায়ণ—২৮, উত্তর ভারতে ভাগবতধর্ম—৩১, দাক্ষিণাত্যে ভাগবত-ধর্ম—৩২, আলোয়ার সম্প্রদায়ের সাধনবৈশিষ্ট্য—৩৪, ভাগবতে আলোয়ার-প্রভাব—৩৬, বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আলোয়ার-প্রভাব—৩৭, শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়—৩৯, ভাগবতধর্মে শ্রীরাধা—৪৪, পঞ্চরাত্র ও প্রাচীন পুরাণে শ্রীরাধার অনুল্লেখ—৪৫, পরবর্তী বৈষ্ণব পুরাণ ও শ্রুতিস্মৃতিতে শ্রীরাধা—৪৫, লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে শ্রীরাধা—৪৭, তামিল সাহিত্যের রাধা—নাপ্পিন্নাই—৪৯, শ্রীরাধার আধ্যাত্মিক রূপান্তর—৫০

প্রথম অধ্যায়: শ্রীকৃষ্ণ ৬৭-৮৬

প্রাচীন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণলীলা—পূতনাবধ—৬৮, কালিয়দমন—৬৯, গোবর্ধন-ধারণ—৭১, রাসলীলা—৭৩, বস্ত্রহরণ—৭৫, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণ-লীলা—৭৬, পদ্মপুরাণে কৃষ্ণলীলা—৭৮, চৈতন্য ও তৎপূর্ববর্তী বৈষ্ণব ধর্ম—৮০, শ্রীকৃষ্ণ-সাহিত্য প্রাক্‌চৈতন্য যুগে—৮১, চৈতন্যোত্তর যুগে—৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: লীলা ৮৭-১০৩

শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি ও নরলীল—৮৭, ব্রহ্মসূত্রে লীলার অর্থ—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা—৮৯, লীলায় বিশ্বকল্যাণ—৯১, ব্রহ্মের লীলা ও মানুষের লীলায়

পার্থক্য—৯২, লীলার বাস্তবতা—৯৪, লীলার নিত্যত্ব—৯৫, লীলা দ্বিবিধ : অপ্রকট ও প্রকট—৯৭

তৃতীয় অধ্যায় : অবতারতত্ত্ব ১০৪-১২০

অবতারের প্রকারভেদ—১০৫, ষড়্‌বিধ অবতার—১০৬, ব্যূহতত্ত্ব—১০৭, গর্গসংহিতায় অবতারপ্রসঙ্গ—১১০, অবতারের মধ্যে গণ্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অবতারী—১১: অবতারের উদ্দেশ্য—১১২, অবতারের আধুনিক ব্যখ্যা—১১৫, অবতারের বৈশিষ্ট্য—১১৭

চতুর্থ অধ্যায় : ঐশ্বর্য ও মাধুর্য ১২১-১৩১

ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের বিশেষত্ব—১২১, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অবিমিশ্র প্রকাশ বিরল—১২৩, পুরলীলা ও ব্রজলীলার কয়েকটি দৃষ্টান্ত—১২৪, উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ করুণাময়—১২৭, উপনিষদে মাধুর্যস্বরূপের সন্ধান—১২৮

পঞ্চম অধ্যায় : আশ্রয়তত্ত্ব ১৩২-১৪৭

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে আশ্রয়তত্ত্ব—১৩২, শুভাশ্রয়কে আশ্রয়ের উপায়—১৩৮, শুভাশ্রয়ের নররূপে আবির্ভাব—১৪০, সৃষ্টি ত্যাগ করিয়া স্রষ্টাকে আশ্রয়ের কারণ—১৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভগবত্তত্ত্বই পূর্ণতত্ত্ব ১৪৮-১৭৫

ব্রহ্মতত্ত্ব—১৪৮, পরমাত্ম-তত্ত্ব—১৫০, ভগবৎ-তত্ত্ব—১৫২, তিন তত্ত্ব সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত—১৫৪, তিন তত্ত্ব তিন শ্রেণীর সাধকের উপাস্য—১৫৬, তিন তত্ত্ব মূলত: এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব—১৫৯, অদ্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ—১৬২, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের শ্রেষ্ঠত্ব—১৬৮

সপ্তম অধ্যায় : শ্রীকৃষ্ণই ভগবান ১৭৬-২০২

শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব—১৭৮, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-বিচার—১৭৯, শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-তত্ত্ব—১৮৩, ‘কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্’-বাক্যের তাৎপর্য বিচার—১৮৫, গীতা ও অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা—১৮৯, শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন—বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত—১৯১, জীবে ও শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য—১৯৮

অষ্টম অধ্যায়ঃ ব্রজভূমি ২০৩-২১৪

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাক্ষেত্র—২০৩, গোলোক ও গোকুলের অভিন্নত্ব—২০৪, ব্রজের ভৌগোলিক পরিচয়—২০৭, ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলাক্ষেত্র—২১০

নবম অধ্যায়ঃ বৃন্দাবনেই নিত্যস্থিতি ২১৫-২২৮

ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বৃত্তি—২১৫, ভগবদ্ধামের বিশেষত্ব—২১৭, বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি—২১৯, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনকাহিনী—২২১, হৃদি-বৃন্দাবনে অপ্রকট লীলা—২২৪, গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা-বাক্য—২২৫

দশম অধ্যায়ঃ উদ্ধব ও বৃন্দাবনতত্ত্ব ২২৯-২৩৯

উদ্ধবের চরিত্র—২৩০, ভক্তিযোগের প্রাধান্য ও তাহার বিশেষত্ব—২৩৩, ভক্তের লক্ষণ—২৩৪, উদ্ধবকে ভক্তিধর্ম উপদেশ—২৩৬

একাদশ অধ্যায়ঃ কান্তাভাব—রাসলীলা ২৪০-২৬৬

কান্তাভাবে সাধনা—২৪০, ভাগবতে পরকীয়াত্বের দৃষ্টান্ত—২৪২, শুকদেব কর্তৃক পরকীয়াদোষ খণ্ডন—২৪৩, রাসের বৈশিষ্ট্য—২৪৭, বেণুগীত ও বস্ত্রহরণের তাৎপর্য—২৪৯, ভাগবতে রাসলীলা—২৫৪, রাসলীলার বিশেষত্ব—২৫৬, রাসলীলা কি কামক্রীড়া—২৫৯, রাসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ—২৬২

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা ২৬৭-২৮৬

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে গোপীদের নামের অনুল্লেখ—২৬৭, ভাগবতে রাধানামের ইঙ্গিত—২৭০, গোপীদের প্রকৃত পরিচয়—২৭১, ব্রজগোপীদের মধ্যে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব—২৭৭, যুগলতত্ত্ব—২৮২, 'গণে'র সাধনা—২৮৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ শ্রীকৃষ্ণই প্রাণনাথ ২৮৭-৩০৯

চতুর্বর্গ—২৮৭, মুক্তিই পরম পুরুষার্থ—২৮৯, গৌড়ীয় মতে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ—২৯১, মহাপ্রভু-রামানন্দ সংবাদঃ সাধ্যতত্ত্ব—২৯৩, সাধনতত্ত্ব—৩০১, সখীভজন—৩০৩, সখী-সাধনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশেষত্ব—৩০৫

চতুর্দশ অধ্যায় : সাধনার ধারা ৩১০-৩৪৭

সখী-সাধনার দুই রূপ : রাগাত্মিকা ও রাগানুগা—৩১০, রাগানুগার সাধন-প্রণালী—৩১৬, সাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ—৩১৮, সাধুসঙ্গ—৩১৯, নাম-সংকীর্তন—৩২১, ভাগবতশ্রবণ—৩২৩, মথুরাবাস—৩২৫, শ্রীমূর্তির সেবা—৩২৫, রাগানুগার দ্বিবিধ সাধন—৩২৬, চৈতন্য-জীবনে বাস্তব রূপায়ণ—৩৩০, দিব্যোন্মাদ—৩৩৪, অন্তর্দশা—৩৪০

পরিশিষ্ট (১) : প্রকট ও অপ্রকট লীলার শ্রেণীভেদ ৩৪৯-৩৫১

পরিশিষ্ট (২) : স্বকীয়া-পরকীয়া প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত ৩৫১-৩৬১

শ্রীসনাতন গোস্বামী—৩৫১, শ্রীরূপ গোস্বামী—৩৫১, শ্রীজীব গোস্বামী—৩৫৩, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—৩৫৫, শ্রীজীব কি পরকীয়াবাদী—৩৫৯, শ্রীরূপ কবিরাজ—৩৬০, কবিকর্ণপুর—৩৬০, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ—৩৬০।

গ্রন্থসূচী

নামসূচী

বিবিধ

শ্লোকসূচী

গ্রন্থপঞ্জী

বুধমণ্ডলীর অভিমত

সংশোধন ও সংযোজন

ভূমিকা

শ্রীজনার্দন চক্রবর্ত্তী

৺সুধা বসু, এম. এ., পি. এইচ. ডি., প্রণীত 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' পড়িলাম। অপরিহার্য স্বল্প-বিরতির মধ্য দিয়া এক রকম এক নিশ্বাসেই সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার বইখানির সমস্তটা পড়িয়া ফেলিলাম। ভাগবত-সাহিত্যের উপর এমন একখানি বই না পড়িলে বঞ্চিত থাকিতাম। বইখানি গবেষণা-নিবন্ধ; ইহার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে তাঁহার সারস্বত-সুকৃতি-লভ্য স্বীকৃতি ও পদবী সম্মান পাইয়াছেন অকালমৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে।

কথা আছে, ভাগবতে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা। লেখিকা মহাবিদ্যালযে সংস্কৃত অধ্যাপনায় প্রাবীণ্য অর্জন করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য তাঁহার ছিল, শাস্ত্রেও তিনি অধীতী ছিলেন, যদিও পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশে কোনদিন তাঁহার আগ্রহ দেখি নাই। তাঁহার গ্রন্থপাঠে বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে আবিষ্কার করা গেল, শাস্ত্রজ্ঞানের অতিরিক্ত সচরাচর-সুদুর্লভ একটি বস্তু তাঁহার মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। ভাগবতীয় পরিভাষায় ইহাকে বর্ণনা করা যায়, 'শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।'

কর্মজীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া কিছুদিনের জন্য গ্রন্থকর্ত্রীর সহকর্মী ছিলাম একটি মাতৃকা-মহাবিদ্যালয়ে। তাই একটি ব্যক্তিগত কথা বলিতে হইতেছে। গ্রন্থকর্ত্রীর মনন-সম্পদ এবং ভজনাগ্রহের এই আকস্মিক সন্ধান পাইয়া মনে হইতেছে, এই গ্রন্থপাঠের পূর্বেই অতর্কিতে এবং পরে গ্রন্থসাহচর্যে, আমার দুই ভাবে সাধুসঙ্গ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-প্রোক্ত ভগবদ্ভক্তির অর্থটিও স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে,

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

দূর হইতে দেখিয়াছি, লেখিকার জীবনে সেবা ও সহিষ্ণুতা ছিল, সংগ্রাম ছিল। আজ বুঝিতে পারা গেল, সেই সংগ্রাম ছিল মহীয়ান্, তাহার অন্তরালে ছিল মহীয়সীর 'ভগবদ্-বীর্য-সংবিৎ'। তাই ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল। কারণ 'জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্না ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাগবত-সিদ্ধান্ত কবিকর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথের একটিমাত্র শ্লোকরত্নে সমাহৃত হইয়াছে। সেই শ্লোক অনুসারে, ভাগবত-শাস্ত্র বিশুদ্ধ প্রমাণ, প্রেমই পরম পুরুষার্থ। 'শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্'। মতটি কাহার? শ্রীমন্মহাপ্রভুর। 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।' এই শ্লোকের অনুভব লেখিকার এই নূতনতর ভাগবত-ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। বারিধিতুল্য গভীর ভাগবতের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস সাবধানে সবিনয়ে পরিহার করিয়া তিনি সুনির্বাচিত কয়েকটি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিয়াছেন; সেগুলি মানব-ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ' হইয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। ভাগবতের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিপাদ্যটি ঝঙ্কার তুলিয়াছে এই রচনায়। 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্। রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।' ভাগবতে এবং মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণব সাধনায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবেশার্থীর পক্ষে এমন গ্রন্থ খুব বেশি লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানি না।

গ্রন্থের অবতরণিকা-অংশে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়াছেন, ভারতীয় ও প্রতীচ্য মনীষীদের ভাগবত-সম্পর্কিত উপলব্ধি ও মতামতের প্রাসঙ্গিকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। গোস্বামি-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ পক্ষপাত তিনি

গোপন করেন নাই। শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীব, বিশ্বনাথ, বলদেব, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ ভক্তিদার্শনিক ও ভজনবীরের সিদ্ধান্তের সাঁরোদ্ধার করিয়া ভক্তিজগতের পরিভাষাগুলির এমন সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষাভাষ্য রচনা করিয়াছেন যাহা বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষণারতদের পথিপ্রদর্শক হইবে।

গোস্বামি-শাস্ত্রে অনধীতী ভাগবত-পাঠকের বোধসৌকর্যার্থে গ্রন্থের নাতিদীর্ঘ পরিচ্ছেদগুলির সাহায্যে পরিবেষণ করা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রসঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণ, লীলা, অবতারতত্ত্ব, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, আশ্রয়তত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্বই পূর্ণতত্ত্ব, ব্রজভূমি, কান্তাভাব—রাসলীলা, গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণই প্রাণনাথ (শিক্ষাষ্টকের 'মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ') প্রভৃতি।

এই গ্রন্থপাঠে সুধী ও ভক্তসমাজের প্রভূত আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমি কূপমণ্ডুক, তীর্থপরিক্রমার আকূতি মেটে নাই। অথচ সর্বথা পঙ্গু, দৈহিকভাবে চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছি। এই গ্রন্থসাহচর্যে রাজেন্দ্র-সংগমে তীর্থযাত্রার ফল লাভ করিলাম। সাধনোচিত-ধামগতা জঙ্গমতীর্থরূপিণী ভাগবত-প্রবক্ত্রীর উদ্দেশে ভাগবতের ভাষায় শ্রদ্ধা জানাই :

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।"

গ্রন্থ-পরিচিতি

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যিনি দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে নরবপু ধারণ করে দুষ্কৃতগণের দমন ও ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন করেছিলেন, যিনি নিখিলরসামৃতসিন্ধু, যিনি পীতাম্বরধারী ও 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ'-রূপে গোপীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেছিলেন, যাঁর অপ্রকট বা নিত্য লীলা এখনো মহাজনেরা দেখতে পান, আবার গুণসমূহের উৎকর্ষের দ্বারা কোনো যুগে কোনো মানব যাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি, তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য অনুধাবন করা মানুষের সাধ্যাতীত। তথাপি যুগে যুগে ভারতের কত কবি ও মনীষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-মাহাত্ম্য ধ্যান করে ভাগবতী তনু লাভ করেছেন, কত প্রেমিক ও রসিকজন রাগমার্গে তাঁর ভজনা করে, তাঁর রূপমাধুরী আস্বাদন করে, তাঁর বেণুধ্বনি শ্রবণ করে, তাঁর দিব্য অঙ্গগন্ধ আঘ্রাণ করে লীলাশুকের মতো উপলব্ধি করেছেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

অবশ্য, যাঁরা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করেছেন, শ্রীকৃষ্ণই যে নিখিল ভারতের প্রাণ-পুরুষ বা ভারতাত্মার বাণীমূর্তি, এই সত্য যাঁরা উপলব্ধি করেন নি অথবা যাঁরা শুধু ইউরোপীয় চশমা পরে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বিচার করেছেন, তাঁদের দৃষ্টি যে আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় যে বৈদগ্ধ্য ও রসোপলব্ধির সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন আছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় সর্বপ্রথম

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং যুক্তিবাদ আশ্রয় করে ধর্মরাজ্য-সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণকে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শরূপে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য গ্রন্থ রচনা করলেও নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা ও ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ভক্ত নবীনচন্দ্র 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', ভাগবতের এই উক্তিতে বিশ্বাসী হয়েও 'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে' এক অখণ্ড, অবিভাজ্য ধর্মরাজ্যে বেঁধে দেওয়াই যে তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, এই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন কাব্যত্রয়ীতে। কিন্তু যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চোখে শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু, যাঁর সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

রাসলীলার সময়ে যিনি স্ময়মানমুখাম্বুজ, পীতাম্বরধারী, স্রগ্বী ও সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ—বঙ্কিমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের রচনা তাঁদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করতে পারে নি।

কৃষ্ণলীলার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আমাদের এক দিকে মহাভারত ও অপর দিকে হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতির অনুসরণ করতে হবে। ভাগবত-ধর্মের রসমাধুর্য যিনি আস্বাদন করেন নি, গোস্বামিগণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যিনি ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের আলোচনা করেন নি, শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে তাঁর কোনো অধিকার নেই। 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' নামক গবেষণা-গ্রন্থের লেখিকা পরলোকগত ডক্টর সুধা সিংহ (মিসেস সুধা বসু) এ বিষয়ে যথার্থ অধিকারিণী, কেননা, গবেষণার গুরুত্ব স্বীকার করলেও তাঁর রসোপলব্ধি কখনো ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়

নি। আমরা বৈদিক সাহিত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ পাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এক না বহু—এ প্রশ্ন স্বভাবতই পণ্ডিতগণের আলোচ্য বিষয় হয়েছে। কোনো কোনো গবেষক আবার শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ওপর খ্রীষ্টের প্রভাব আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন। লেখিকা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। তারপর বাসুদেব-কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম বা ভাগবতধর্মের বৈশিষ্ট্য, ভাগবতধর্মের বৈদিকতার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, ভক্তিধর্মের ওপর পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রভাব, ভাগবতে আলোয়ার-(আড়্বার) গণের প্রভাব, আলোয়ার সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতির ওপর আলোয়ারগণের প্রভাব, তামিল সাহিত্যে প্রেমধর্ম, ভাবগতধর্মে শ্রীরাধা ও তাঁর আধ্যাত্মিক রূপান্তর প্রভৃতি সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনা এই গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর গভীর রসবোধ ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদুষী লেখিকা হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি অবলম্বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা ও মাধুর্যলীলা (যেমন পূতনাবধ, কালীয়দমন, গোবর্ধনধারণ, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য অনন্ত কিন্তু তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু আর তাঁর মাধুর্য-লীলাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্রী 'The Idea of the Holy' নামক গ্রন্থের রচয়িতা Rudolf Otto-র উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতও শ্রীভগবানের দুটি বিভাবের (aspect) কথা উল্লেখ করেছেন—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং নিখিল ভুবনের অধিপতি হয়েও মাধুর্য ও সৌন্দর্যাদি গুণে মানুষের চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন।

বাস্তবিক, শ্রীভগবান যে রসস্বরূপ, তিনি যে প্রেমঘন ও আনন্দঘন, একথা ভক্তমাত্রেই স্বীকার করবেন।

শ্রীচৈতন্যযুগে দর্শনে (যেমন বৃহৎ ভাগবতামৃত, লঘু ভাগবতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতিতে), কাব্যে (যেমন গোপালচম্পূ, উদ্ধবসন্দেশ, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতিতে), নাটকে (যেমন বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতিতে) এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে (যেমন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতিতে) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলার তাৎপর্য যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে সে সম্পর্কেও মনস্বিনী লেখিকা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তারপর বাংলা পদাবলী-সাহিত্য ও অনুবাদ-সাহিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-বিষয়ক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে গ্রন্থকর্ত্রী প্রথম অধ্যায়টি শেষ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় লীলা অর্থাৎ শ্রীভগবানের নরবপু-গ্রহণ ও নররূপে লীলা। অধ্যায়ের গোড়াতেই বৈষ্ণব ধর্মের, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী সহৃদয় লেখিকা সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।' ইত্যাদি।

এরপর লেখিকা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে লীলাতত্ত্বের যে সরস বিশ্লেষণ করেছেন, তা পাঠ করে ভক্ত ও রসিক পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ হবেন। লীলার আভিধানিক অর্থ, ব্রহ্মসূত্রে লীলার অর্থ, লীলা সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা, ব্রজলীলা ও মথুরালীলার পার্থক্য, লীলার বাস্তবতা ও নিত্যত্ব, জগতের মঙ্গলের জন্য লীলার প্রয়োজনীয়তা, অপ্রকট ও প্রকট লীলার পার্থক্য, দ্বিবিধ অপ্রকট লীলা, প্রকট লীলার প্রবলতর আবেদন প্রভৃতি সকল জ্ঞাতব্য ও আস্বাদযোগ্য বিষয়ই 'লীলা'-শীর্ষক অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় অবতারতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শ্রীভগবানের অবতার অসংখ্য, 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'। ভাগবতধর্মে এই অবতারবাদের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। খ্রীষ্টধর্মে, বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে অবতারবাদ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নরলীলা স্বীকৃত। তাঁদের উপাস্য—God the Father, God the Son এবং Holy Ghost; শুদ্ধচিত্তা, অপাপবিদ্ধা কুমারী মেরীও তাঁদের উপাস্যা। 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—ঈশ্বরের নররূপে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব, একথা স্বীকার করলে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার হানি ঘটে। অবতারতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে লেখিকা অবতারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রেমানন্দ বিস্তারের জন্যই তিনি নররূপে লীলা করেন—

"যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমি বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি ও ব্রহ্মসংহিতার উক্তি উদ্ধৃত করে বিদুষী লেখিকা অবতার ও শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। অবতারের আধুনিক ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য, অবতারের সঙ্গে জীব ও পরিকরগণের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়েও লেখিকা আলোকপাত করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, কুরুক্ষেত্র, মথুরা ও দ্বারকা-লীলায় ঐশ্বর্যের ও ব্রজলীলায় মাধুর্যের প্রাধান্য। তবে মথুরা-দ্বারকায় মাধুর্য যেমন ঐশ্বর্য-কবলিত, ব্রজে তেমনি ঐশ্বর্য মাধুর্য-কবলিত। কিন্তু উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ করুণাময়, তাঁর লীলাতে সর্বত্রই আছে করুণার অভিব্যক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে শ্রীভগবানের মাধুর্যলীলাই যে সর্বোত্তম এবং

মাধুর্যই যে ভগবত্তার সার আর উপনিষদেও যে তাঁর মাধুর্য-স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, এ সকল কথা পূর্বে বলা হলেও আলোচ্য অধ্যায়ে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। লেখিকা এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'সনাতন-শিক্ষা' থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলেছেন—

"কর্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য সুলভ।"

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য আশ্রয়তত্ত্বে লেখিকা বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ শুধু ঐশ্বর্যঘন ও মাধুর্যঘন নন, তিনি সমগ্র জগতের আশ্রয়।. নিখিল বিশ্ব সেই পরম পুরুষ থেকে উৎপন্ন, তাঁতে বিধৃত এবং অন্তিমে তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, বিষ্ণু-পুরাণ, ভাগবত ও শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ভাগবতপুরাণের টীকা, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে সকল জগতের আশ্রয়, এ কথা স্বীকৃত হয়েছে। ভাগবতধর্মের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: শুভাশ্রয় ভগবান নররূপে আবির্ভূত হন এবং যিনি ভোগবাসনাকে সংযত করতে পারেন তিনিই তাঁর আশ্রয় লাভ করেন। গোপালতাপনী শ্রুতি, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও তাঁর নরবপু-ধারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যোগমায়ার দ্বারা তিনি স্বরূপকে আবৃত করেন বলে নরবপু ধারণ করলেও তাঁর নিত্যত্ব ও বিভুত্বের হানি হয় না। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বস্রষ্টা সত্য ও নিত্য আর জগৎ সত্য হলেও অনিত্য, এই জন্যই বৈষ্ণবগণ বিশ্বস্রষ্টাকে আশ্রয় করে থাকেন। শুধু বিশ্বস্রষ্টাকে আশ্রয় করা নয়, তাঁর চরণে নিঃশেষে ও পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করার জন্যে ভক্ত তাঁর প্রাণে যে তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করেন, সেই ব্যাকুলতার ফলেই দুর্যোগময়ী রজনীর মধ্যে

তিনি দুঃখের দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই পরম পুরুষের স্বরূপ কি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাই আলোচিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলেন, তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে কথিত হন। জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্তম বস্তু (ইনি অদ্বৈত-বাদীর নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম নন) যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনিই ঐশ্বর্যঘন, মাধুর্যঘন শ্রীভগবান। পরম পুরুষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গ্রন্থকর্ত্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব ও ভগবৎ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তারপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহকারে তিনি দেখিয়েছেন, এই তিন তত্ত্ব তিন শ্রেণীর সাধকের উপাস্য—

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

তথাপি এই ত্রিবিধ তত্ত্বের মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপই পূর্ণতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

*   *   *

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি, তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস॥"

অদ্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে বৈষ্ণব আচার্যগণ আচার্য শঙ্করের মতবাদের বিরোধিতা করলেও তাঁদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট মত-পার্থক্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতির সিদ্ধান্তের পার্থক্য প্রদর্শন করে লেখিকা গৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। এই মতবাদে জীব অণুচৈতন্য আর শ্রীভগবান বিভুচৈতন্য সুতরাং তাঁদের মধ্যে, সূর্য ও সূর্যরশ্মির মতো অথবা অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের মতো যুগপৎ ভেদ ও অভেদ-সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, মৃগমদ আর তার গন্ধের মতো শক্তি ও শক্তিমানে সম্পূর্ণ ভেদসম্বন্ধও নাই, সম্পূর্ণ অভিন্নত্বও নাই। এই ভেদাভেদ-সম্পর্ক অচিন্ত্য, সুতরাং তর্কের অতীত। ('অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।')

এরপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতবাদের অনুসরণ করে বিদুষী লেখিকা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ অত্যন্ত ব্যাপক। এতে সকল প্রকার শ্রুতিবাক্যের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি (স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি) স্বীকার করলেও তাঁর অদ্বয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁরা কিন্তু ব্রহ্মের স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণই যে পরমতত্ত্ব, তিনিই যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও সর্ব্বকারণ-কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। এই অধ্যায়ে লেখিকা গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কৃষ্ণ নামের তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা ও অবতারসমূহের ওপর কর্তৃত্ব, তাঁর সর্বাকর্ষকত্ব প্রভৃতি বিষয় প্রতিপন্ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরূপের লঘু ভাগবতামৃত, শ্রীজীবের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, শ্রীলকৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ একদিকে অবিচিন্ত্যতত্ত্ব, অপর দিকে তিনিই সর্ব্বজন-চিত্তাকর্ষক, অখিলরসামৃতসিন্ধু। উপনিষদেও ব্রহ্মকে বলা হয়েছে অবাঙ্মনসগোচর, আবার

তাঁকেই বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ'। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Rudolf Otto-র উক্তি উদ্ধৃত করে লেখিকা দেখিয়েছেন—পরব্রহ্মের দুটি বিভাব (aspect) অর্থাৎ একদিকে সর্বব্যাপকত্ব ও বিরাটত্ব, অপর দিকে পরম রমণীয়ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতও তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The Idea of the Holy-তে স্বীকার করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা গীতা, গর্গসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে জন্ম অপ্রাকৃত হলেও নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণতম প্রকাশ। তাই শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীলক্ষ্মীধর, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্বই প্রতিপন্ন করেছেন। বাস্তবিক গোকুলেই তাঁর ঐশ্বর্য, করুণা ও মাধুর্যের আতিশয্য দৃষ্ট হয়। নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ শুধু অখিলরসামৃতসিন্ধু নন, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

এরপর শ্রীকৃষ্ণলোকের আলোচনাপ্রসঙ্গে ভাগবতধর্মের ব্যাখ্যাত্রী নানা শাস্ত্রের সাহায্যে গোকুল ও গোলোকের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর মতে শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন গোকুলেরই নামান্তর। ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা চলেছে কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠকের জন্যে লেখিকা বৃন্দাবনের ভৌগোলিক বিবরণও দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। তবে বৈষ্ণব সাধকগণ প্রাকৃত বৃন্দাবনের চেয়ে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের মহিমাই অধিকতর কীর্তন করেছেন। এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন সম্পর্কেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'। বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি, এখানেই তিনি স্বয়ংরূপে বিরাজিত। ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, গর্গসংহিতা, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে। এই

ব্রজলীলার প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তাই বলা হয়েছে ব্রজবিধু বা বৃন্দাবনচন্দ্র।

গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি'। শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে বলেছিলেন—

"কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না পারে থাকিতে॥"

শ্রীভগবানের নিত্যধাম এই বৃন্দাবন তাঁর স্বরূপশক্তিরই অংশ। এই বৃন্দাবন প্রপঞ্চাতীত, চিন্ময়, মায়াবর্জিত ও অবিনাশী। তাই বৃন্দাবনের সকলই অলৌকিক। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতির কথা বৈষ্ণবগণের প্রামাণ্য নানা শাস্ত্রে বর্ণিত বা সূচিত হয়েছে। অবশ্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি হলেও পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে তিনি কৈশোর লীলার অন্তে দুর্বৃত্ত কংসকে বধের জন্য মথুরায় গমন করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' ও তাঁর মথুরাগমন-কাহিনী পরস্পরবিরোধী হলেও বৈষ্ণবাচার্যগণ যে এই বিরোধের চমৎকার মীমাংসা করেছেন, সে কথার আলোচনা করতেও লেখিকা বিস্মৃত হন নি। ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি, এ কথা তাঁর অপ্রকট লীলা সম্পর্কে প্রযোজ্য, প্রকট লীলায় তিনি ব্রজভূমি ত্যাগ করে কংসবধার্থে মথুরায় গমন করেছিলেন। কিন্তু এ বৃন্দাবন তো কোনো ভূমিখণ্ড নয়, এ বৃন্দাবন হচ্ছে ভক্তের হৃদয়—

"অন্যের যে অন্য মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।"

তাই লেখিকা বলেছেন—'ভক্তের অন্তরে ভগবা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অম্লান মহিমায় চিরজাগরূক, তাহা নিত্য শাশ্বত, চিরভাস্বর।'

মিলনের মধ্যে যেমন একটা চিরবিরহ জেগে থাকে, তেমনি বিরহের মধ্যেও রয়েছে একটা শাশ্বত অন্তর্মিলন। কংসবধের পর

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গমন না করে উদ্ধবের দ্বারা গোপীগণকে যে সান্ত্বনা-বাক্য প্রেরণ করেছিলেন, তাতে আছে নিত্যমিলনের আশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে তিনি এক পাদও গমন করতে পারেন না, সুতরাং গোপীদের সঙ্গে তাঁর তিলমাত্র বিচ্ছেদও অসম্ভব। ভক্ত বৈষ্ণবগণ সত্যই বলেছেন— মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহই অধিকতর প্রার্থনীয়, কেননা, মিলনে যাকে আমরা একান্ত কাছে পাই, বিরহে তাকে নিখিল ভুবনে ব্যাপ্ত করে দিই। কৃষ্ণবিরহের মধ্য দিয়ে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যমিলনের কথা শ্রীরূপ গোস্বামীও তাঁর 'উদ্ধবসন্দেশে' বিবৃত করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ের নাম 'উদ্ধব ও বৃন্দাবনতত্ত্ব'। এই অধ্যায়ের আলোচ্য গোপীপ্রেমের মহিমা, যে প্রেমের নিকট গৃহসংসারের দুর্জয় বন্ধন, লোকধর্ম প্রভৃতি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

বৃন্দাবনলীলার গূঢ়তম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করেছিলেন একমাত্র সর্ববুদ্ধ, ভক্তগণের মধ্যে সর্বোত্তম, প্রিয়সখা উদ্ধবের নিকট ; কারণ, একমাত্র উদ্ধবই শ্রীকৃষ্ণের স্বারূপ্য লাভ করেছিলেন। ব্রজগোপীদের মতো উদ্ধবও ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চান নি, চেয়েছেন নিজের অঙ্গের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে। উদ্ধব ছিলেন উত্তমা ভক্তির অধিকারী, তাঁর মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার লেশমাত্র ছিল না, ছিল শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা, তাই মর্ত্যলীলা-সংবরণের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের কল্যাণের জন্যে তাঁর নিকট শুধু গোপীপ্রেমের মহিমাই প্রকাশ করেন নি, তাঁর সকল প্রশ্নের সমাধান করেছেন। উদ্ধব প্রশ্ন করেন—'ঋষিগণ তো শ্রেয়ঃসাধনের বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন, এই সকল পন্থার কি প্রত্যেকটিই প্রধান, না, ভক্তিযোগ প্রধান ?' শ্রীভগবান উত্তরে বললেন—শ্রেয়ঃ-সাধনের মধ্যে ভক্তিযোগই সর্বপ্রধান। অন্য সকল সাধনাই ভক্তির মুখাপেক্ষী কারণ শ্রীভগবান একমাত্র অনন্যা ভক্তিরই বশীভূত। এই ভক্তি আবার শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের দ্বারা লভ্য। এই প্রসঙ্গে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিধ সাধুর অর্থাৎ মিশ্র ভক্ত ও শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ সবিস্তারে বর্ণনা করে সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এই প্রেমভক্তির চরম বিকাশ ঘটেছিল ব্রজগোপীগণের সাধনায়। যে প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ ঘটে, বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিনির্দিষ্ট ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই অকৈতব প্রেমকে আশ্রয় করেই গোপীগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—'তুমি সর্বদেহীর আত্মা আমাতে প্রপন্ন হও, মনে রেখো, বেদোক্ত কর্মের দ্বারা, জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা, এমন কি, ধ্যানযোগের দ্বারাও আমাকে লাভ করা যায় না, একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।'

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ভক্তিসাধনার যে স্তর-পরম্পরা (সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি ও শরণাগতি) নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অভ্যারোহতত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। অভ্যারোহ কথাটির অর্থ হচ্ছে সাধনার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আরোহণ। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর উদ্ধব ভাগবতধর্মের প্রচারকেই নিজের জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন।

পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, কান্তাভাব—রাসলীলা। ভক্তিসাধনায় শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতি এই পঞ্চ প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। পঞ্চরসের সাধনা সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত এই, প্রত্যেক পরবর্তী রসের সাধনায় পূর্ববর্তী রসের অপেক্ষা গুণাধিক্য ও স্বাদাধিক্য বর্তমান। ব্রজের গোপিকাগণ মধুর ভাবে ভগবদ্ভজন করেন।

এই মধুর ভজন বা কান্তাভাবের সাধনায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত—গোপিকাগণ অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণেই সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। এই গোপীপ্রেমের চরম স্ফূর্তি ঘটেছিল রাসলীলায়।

মধুরভাবে ভগবদ্ভজনের রীতি দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার, পারস্যের সুফী এবং খ্রীষ্টীয় মরমিয়া (mystic) সাধকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাইবেলের Song of Solomon-এ ভক্ত-ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে।

এই মধুর রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে দ্বিবিধা—স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়া রতিতে মিলনের সকল বাধা অতিক্রম করতে হয় বলে. বেদধর্ম, লোকধর্ম. আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করতে হয় বলে এতেই কান্তাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা; শ্রীমদ্ভাগবতে গোপিকাগণের মধ্যে এই পরকীয়া রতিরই দৃষ্টান্ত পাই। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

রাসপঞ্চাধ্যায়ে দেখতে পাই গোপীগণ উপপতিবুদ্ধিতেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন; কিন্তু মনে রাখতে হবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি সকলের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত আর গোপীদের প্রেমও প্রাকৃত প্রেম নয়। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কেন ধর্মবিগর্হিত আচরণ করলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যে সব যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক ধর্মাধর্মের বহু ঊর্ধ্বে, আবার তিনি নিখিল জীবমাত্রেরই অন্তরে (সুতরাং গোপীগণ ও তাঁদের পতিগণেরও অন্তরে) অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল জীবসত্তা যাঁতে অবস্থিত, তাঁর পক্ষে আত্ম-পর বিচারের প্রশ্নই উঠতে পারে না। শ্রীভগবান আপ্তকাম হয়েও ব্রজগোপীদের প্রতি অনুগ্রহবশত আপাতদৃষ্টিতে নিন্দিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এদিকে শ্রীভগবানের যোগমায়া শক্তির প্রভাবে মায়ামোহিত ব্রজবাসিগণ গোপাঙ্গনাগণকে নিজ নিজ শয্যা-পার্শ্বে অবস্থিত দেখেছিলেন। অবশ্য, শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদের

পরকীয়াত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হলেও এ বিষয়ে গৌড়ীয় আচার্যদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই সব আচার্যের বিভিন্ন অভিমত নিয়ে লেখিকা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। দেখা যায়, এ বিষয়ে পরকীয়াবাদী সনাতন গোস্বামী ও উজ্জ্বলনীলমণির রচয়িতা শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত স্বকীয়াবাদী শ্রীজীব গোস্বামীর মতানৈক্য রয়েছে। অবশ্য, শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' নাটক থেকে শ্রীজীব তাঁকে স্বকীয়াবাদী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীজীব বলেন, যাঁরা কান্তাভাবে সাধনার বা মধুররতির গূঢ় তাৎপর্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে সক্ষম, তাঁদের জন্যেই শ্রীরূপ 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচনা করেছেন এবং সেখানে তিনি পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেছেন। শ্রীজীবের মতে কিন্তু 'ব্রজদেবীগণ বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বকীয়া কান্তা, তবে প্রকটলীলায় পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা।' আবার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 'নিত্য পরকীয়াত্বের সম্বন্ধ।' বিশ্বনাথ বলেন, প্রাকৃত নায়কের পক্ষে যা নিন্দনীয়, লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাতেই রসের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের অপরাপর লীলার ন্যায় রাসলীলাও নিত্য। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া, এই মত স্থাপন করার জন্যে প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন, আচার্য বিশ্বনাথ সেগুলি অপ্রাকৃত রসশাস্ত্রের দিক থেকে খণ্ডন করেছেন। অবশ্য, বিশ্বনাথ এবং তাঁর অনুগামী অনেকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, শ্রীজীবও বাস্তবিকপক্ষে পরকীয়াবাদী ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন, পরকীয়া রতির ন্যায় স্বকীয়া রতিতে রসের পরিপুষ্টি হয় না, তবে পাছে কেউ, রাসলীলার বা অপ্রাকৃত ঔপপত্যের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি না করে ধর্মের নামে অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীজীব স্বকীয়াবাদের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আবার কোনো কোনো বৈষ্ণব আচার্য বিশ্বাস করেন, শ্রীজীব যথার্থই ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের

দাম্পত্য-সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে কখনো কখনো পরেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে তিনি পরকীয়াবাদের উৎকর্ষ স্বীকার করেছেন। যা হোক, কবিরাজ গোস্বামী যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরকীয়া রতির উৎকর্ষ স্থাপন করেছেন, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের লেখক মালাধর বসু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-প্রসঙ্গে যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন তাও স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, যদি কোনো অনধিকারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি রাসলীলার গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করে পরদারগমনরূপ মহাপাপে লিপ্ত হয়, তবে তাকে ঘোর নরকে পতিত হতে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরম রসময়ী রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। হরিবংশেও রাসলীলার অনুরূপ হল্লীশক ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। তবে বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তা হল্লীশক ক্রীড়ার ন্যায় লৌকিক নয়, তা অপ্রাকৃত ও কামগন্ধহীন। ('আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।') শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলার গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনস্বিনী লেখিকা বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতশ্রবণে গোপীদের চিত্তবৈকল্য ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রতপরায়ণা গোপীগণের বস্ত্রহরণলীলাকে রাসলীলার পটভূমিরূপে গণ্য করা যায়। বেণুগীতি ও বস্ত্রহরণলীলার তাৎপর্য হচ্ছে—শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্যে গোপীগণের আকুলতা ও তাঁর চরণে সর্বস্ব—এমন কি, নারীর শ্রেষ্ঠ ধন লজ্জা পর্যন্ত সমর্পণ। নিজেকে প্রিয়তমের নিকট নিঃশেষে সমর্পণ না করলে প্রেমসাধনা বা রসসাধনা যে পরম চমৎকারিত্ব লাভ করে না, খ্রীষ্টীয় মরমিয়া সাধকগণও সে কথা স্বীকার করেছেন। রাসলীলার প্রারম্ভে আমরা দেখতে পাই, শারদ রজনীতে মল্লিকা কুসুম বিকশিত হয়েছে দেখতে পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বনে গোপীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতে ইচ্ছা করলেন এবং তাঁর 'অনঙ্গবর্ধন' বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণ

পতিপুত্র, গৃহকর্মাদি ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হন। তখন গোপীগণ করুণ ভাবে বিলাপ করতে থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করতে করতে অন্য একটি নারীর পদচিহ্ন দেখতে পান। (গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে ইনিই রাধা, যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই)। তারপর গোপীদের ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও রাসলীলার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এতেই সর্বপ্রথম রাধার নামের উল্লেখ দেখা যায়। (বঙ্কিমচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' দ্রষ্টব্য।)

রাসলীলার মূলগত ভাব হচ্ছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় বা কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষায় গোপীগণের সর্বস্বত্যাগেই প্রেমের পরিপুষ্টি। এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বা বিরহই প্রেমকে নবনবায়মান করে তোলে। তাই খ্রীষ্টীয় মরমিয়া সাধকগণ এবং সূফী সাধকগণও বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতো মিলনের চাইতে বিরহকেই অধিকতর কাম্য বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে আমদের মনে পড়ে ভক্ত কবীরের কথা—

"কবীর বিরহ বিনা তন্ শূন্য হ্যায় বিরহী হ্যায় সুলতান।
যো ঘট বিরহ না সঞ্চারে সো ঘট জনু মশান॥"

অতঃপর মনস্বিনী লেখিকা শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দপ্রয়োগ ও বর্ণনার অনুসরণ করে এই তত্ত্বই প্রতিপন্ন করেছেন যে, রাসলীলা প্রাকৃত কামলীলা নয়। (দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রাসলীলা' দ্রষ্টব্য।) কামলীলার রূপকে বর্ণিত হলেও রাসলীলা প্রকৃত পক্ষে কামবিজয় লীলা। ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেব এই লীলার বক্তা আর ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী পরীক্ষিৎ ইহার শ্রোতা। সুতরাং এই লীলা কখনও কামলীলা হতে পারে না। এই জন্যে আদিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গর্গসংহিতা

প্রভৃতি নানা গ্রন্থে এই লীলার অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। স্বামিজীও বলেছেন, যে পর্যন্ত আমাদের বিষয়বাসনা সম্পূর্ণ নির্মূল না হবে, যে পর্যন্ত শ্রীভগবানের জন্যে আমরা সর্বস্ব অর্পণ করতে না পারব, সে পর্যন্ত গোপীপ্রেমের নিগূঢ় মর্মে প্রবেশের অধিকারী হব না।

পরবর্তী অধ্যায়ে লেখিকা 'গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কান্তাভাবে সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধিকা এই গোপিকাগণ এবং গোপিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধা। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত বা হরিবংশে কোথাও কোনো গোপীর নাম উল্লিখিত হয় নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ থেকে কয়েক জন গোপীর নাম উদ্ধার করে বৈষ্ণব সমাজে প্রচার করেছেন। অবশ্য, শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীমতী রাধার নামের ইঙ্গিত আছে, আমরা পূর্বেই তা দেখেছি। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও যে ভাগবতোক্ত একটি শ্লোকের (অনয়ারাধিতো নূনম্ ইত্যাদি) এই তাৎপর্যই গ্রহণ করেছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তার প্রমাণ আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান, শ্রীমতী রাধা তাঁর শক্তি। তাঁর শক্তি ত্রিবিধ, স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি এবং জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি। এই স্বরূপশক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "আনন্দাংশে হ্লাদিনী আর সদংশে সন্ধিনী।
> চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান বলি মানি॥"

ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি হচ্ছে সেই শক্তি যার দ্বারা তিনি আনন্দের আস্বাদন করেন এবং অপরকেও করান। এই হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ, এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হচ্ছেন গোপিকাগণ এবং গোপিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা

মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা। লেখিকা এই প্রসঙ্গে মধুরারতি বা কান্তারতির তিনটি প্রকারভেদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে মধুরারতি তিন প্রকার— সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। এই সমর্থা রতিতেই গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে তন্ময় হয়ে গৃহসংসারের দুর্জয় বন্ধন, লোকধর্ম, সমাজ-ধর্ম প্রভৃতি অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করেছিলেন। পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ও আত্মনিবেদনেই যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ব্রজগোপীগণ তার দৃষ্টান্ত। এই প্রেমেরই অপর নাম উত্তমা ভক্তি, ইহা অন্যাভিলাষশূন্যা, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী ; উদ্ধবের অন্তরে এই ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল বলেই তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবার অধিকার চেয়েছিলেন। ব্রজগোপীদের সাধনায় যে ভক্তিধর্মের চরম বিকাশ ঘটেছিল তার নাম প্রেমভক্তি। সাধনভক্তির পরিপাকে ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তির পরিপাকে প্রেমভক্তি লাভ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের কল্যাণের জন্যে প্রিয় শিষ্য উদ্ধবের নিকট ব্রজের সাধনার গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করেন এবং শ্রীভগবানের নির্দেশে তাঁর লীলা সংবরণের পর উদ্ধব ভাগবতধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দেখতে পাই, লীলা সংবরণের পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় শিষ্য ও সখা উদ্ধব কর্তৃক পৃষ্ট হয়ে তাঁর সকল প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিয়েছেন এবং নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয় স্থাপন করে তাঁর ওপর প্রেমধর্ম প্রচারের ভার অর্পণ করেছেন। অর্জুনের ন্যায় উদ্ধবও ছিলেন তাঁর সখা ও প্রিয় শিষ্য, কিন্তু গোপীপ্রেমের নিগূঢ় রহস্য আস্বাদনের অধিকার একমাত্র উদ্ধবেরই ছিল।

গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বিদুষী লেখিকা ত্রিবিধ রতির (সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থার) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুসরণে রতির বিভিন্ন স্তরের (যেমন প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ

অনুরাগ ও ভাবের) নির্দেশ করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে কবিরাজ গোস্বামীর মতে মহাভাবই প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশের অবস্থা আর এই জন্যেই গোপিকাগণের মধ্যে মহাভাবময়ী রাধার শ্রেষ্ঠত্ব। চরিতামৃতকার বলেছেন—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম মহাভাব॥"

সাধারণী রতির শেষ সীমা প্রেম, সমঞ্জসার শেষ সীমা অনুরাগ আর সমর্থার শেষ সীমা ভাব বা মহাভাব। এই ভাব বা মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতো রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাবের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দ্বিবিধ—মোদন ও মাদন। যে মহাভাবে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবসমূহের আতিশয্য দৃষ্ট হয়, তাকেই বলে মোদনাখ্য মহাভাব। এই মোদনাখ্য মহাভাব চন্দ্রাবলী প্রমুখ কৃষ্ণকান্তাগণে একান্ত দুর্লভ, কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীমতী রাধিকা ভিন্ন আর কারো মধ্যে থাকতে পারে না। তাই শ্রীমতী রাধা গোপিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থের আলোচনা করলেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হয়। 'রাধা' শব্দের অর্থ হচ্ছে—যিনি মাধুর্যের সাধনায় চরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। গর্গসংহিতায় শ্রীরাধা শব্দের বর্ণবিশ্লেষ করে প্রত্যেকটি বর্ণের (র্+আ+ধ্+আ) স্বতন্ত্র অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও বলেছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥"

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা—নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
গোবিন্দ-নন্দিনী রাধা—গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্বকান্তা-শিরোমণি॥"

শ্রীমতী রাধিকা সম্পর্কে আমরা কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি উদ্ধৃত করলাম। বিদুষী গ্রন্থকর্ত্রীও এই উক্তির সারমর্ম গদ্যে বিবৃত করেছেন।

আমরা দেখেছি, রাধা ও কৃষ্ণে স্বরূপগত কোনো পার্থক্য নেই। তাই বৈষ্ণব সাধনায়, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় উপাসিকা শ্রীরাধা উপাস্যায় পরিণত হয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলেছেন—'শ্রেষ্ঠ উপাস্য, যুগল-রাধা-কৃষ্ণ নাম'। অবশ্য, অর্ধনারীশ্বরের পরিকল্পনায়, উপনিষদে এবং শাক্ত তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় এই যুগলতত্ত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই যুগলতত্ত্বই যে ভারতের বিচিত্র অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে, এ কথা 'ললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আর এই যুগলতত্ত্বের মূলে রয়েছে শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নত্ব। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যুগল-উপাসনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান স্বয়ং বলেছেন, আমার পূজার চাইতে আমার ভক্তগণের পূজাই শ্রেষ্ঠ তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় ভক্তগণের পূজাই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর এই জন্যেই তাঁরা শুধু যুগলের উপাসনা করেন না, পরিকর-পরিবৃত যুগলেরই উপাসনা করে থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় যুগলতত্ত্বের প্রসঙ্গ আলোচনার পর লেখিকা পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেছেন,

সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ থাকলেও সকলেরই জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখভোগ। এই উদ্দেশ্যে কেউ কামের সেবা করে, কেউ ধনসম্পদ লাভের জন্যে লালায়িত হয়, কেউ বা যুগপৎ ঐহিক কল্যাণ ও পারত্রিক সুখভোগের আশায় শাস্ত্রবিহিত ধর্ম-কর্মে প্রবৃত্ত হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের যথার্থ পুরুষার্থ হচ্ছে মোক্ষ। কারণ, কাম ও অর্থ, এমন কি, ধর্মের সেবার দ্বারাও নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্যসুখ লাভ হতে পারে না। নিত্যসুখ লাভের উপায় হচ্ছে অনিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ, অবিদ্যা বা মায়ার বন্ধন ছেদনের দ্বারা ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে কিন্তু ভক্তি বা প্রেমই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ। ভগবানে যখন মানুষের রতি প্রগাঢ় হয়, তখন মানুষ চায় নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবা। যথার্থ ভগবদ্‌ভক্ত কখনো সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য, ও সারূপ্য মুক্তির অভিলাষ করেন না। তাঁদের মতে—

'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥'

তাঁরা বলেন মুক্তাবস্থায়ও ভক্তগণ সিদ্ধদেহ লাভ করে শ্রীভগবানের ভজনা করে থাকেন। এই সাধ্যভক্তি বা প্রেমরূপা ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী এই ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভক্তি হচ্ছে আনুকূল্যসহকারে কৃষ্ণানুশীলন, তা অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতির দ্বারা অনাবৃত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদেও প্রেমভক্তিই যে সর্বসাধ্যসার এবং শ্রীমতী রাধার প্রেমেই যে এই ভক্তির চরম উৎকর্ষ, তা প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে সাধ্যবস্তু নির্ণয় করতে বললে তিনি যথাক্রমে স্বধর্মাচরণের দ্বারা বিষ্ণুভক্তিলাভ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম,

বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তাপ্রেমকে সাধ্যসার বলে নির্দেশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত রামানন্দকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে তাঁর অন্তরে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহের স্ফুরণ করেন। রামানন্দ রায় বলেন, কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় রয়েছে। কোনো ভক্ত শান্তরতি, কেউ দাস্যরতি, কেউ সখ্যরতি, কেউ বাৎসল্যরতি, কেউ বা মধুররতি অবলম্বন করে শ্রীভগবানের ভজনা করে থাকেন। যদিও যাঁর যে ভাব, তাই সর্বোত্তম, তথাপি নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করলে এদের মধ্যে তারতম্য আছে। প্রত্যেক পরবর্তী রসে পূর্ববর্তী রসের গুণ বিদ্যমান থাকায় স্বাদাধিক্য হয়। মধুররসে শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যরসের সেবা, সখ্যরসের আত্মবৎ ব্যবহার, বাৎসল্যরসের লালন, পালন, ভর্ৎসনা প্রভৃতি ও মধুররসের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন যুগপৎ বর্তমান থাকে। তাই 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'। রাধার প্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্ব কোথায়, তাও শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখে বিবৃত করেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও বিলাসতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পরম বিদগ্ধ ও রসবেত্তা রামানন্দ সংক্ষেপে তার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। রায় রামানন্দ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু হলেও, তিনি যখন ব্রজগোপীদের সঙ্গে থাকেন, তখন তাঁর মাধুর্য বহু গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ব্রজগোপীদের মধ্যে 'রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি, যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন না। রায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, রাধার প্রেম যে সাধ্যশিরোমণি, তার প্রমাণ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের উপেক্ষা করেই শ্রীরাধাকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের ভেতর শক্তি সঞ্চার করে তাঁর মুখ থেকে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শ্রবণ করে-ছিলেন। এর পর তিনি রামানন্দের নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ,

শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি জানতে চান। রায় রামানন্দ অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন এবং পরিশেষে স্বরচিত পদ উদ্ধৃত করে প্রেমবিলাসবিবর্তের অর্থাৎ প্রেমের পরিপূর্ণ অবস্থার ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, গোপীগণের প্রেম অপ্রাকৃত হলেও এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখে এর তাৎপর্য হলেও প্রাকৃত কামের সঙ্গে সাম্য-বশত একে কখনো কখনো কাম বলা হয়ে থাকে কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা নেই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলেন, সখীগণের দ্বারাই লীলার বিস্তার হয় বলে সখীভাবে সাধনাই সাধ্যবস্তু লাভের একমাত্র পন্থা। শ্রীরাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি হলেও তা কিন্তু নিত্যসিদ্ধ, সাধনার দ্বারা লভ্য নয়। এই সখীভাবে সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব আর শ্রীমন্মহা-প্রভুর কৃপাতেই এই সখীভাবে ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব রায় রামানন্দের চিত্তে স্ফুরিত হয়েছিল।

ভক্তি বা ভগবানের চরণে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। প্রিয়তমের অনুরাগ বা বিরাগে এই ভক্তির তারতম্য ঘটে না। এই জন্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।'

গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে লেখিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ধারা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা হচ্ছে—সখীভাবে সাধনার দুই রূপ—রাগাত্মিকা ও রাগানুগা; রাগাত্মিকার দুই অঙ্গ—সম্বন্ধরূপা ও

কামরূপা ; রাগানুগা ভক্তির বিশেষত্ব এবং শাস্ত্রবিহিত বৈধী ভক্তির সহিত শাস্ত্রনিরপেক্ষ রাগময়ী ভক্তির পার্থক্য।

রাগানুগা ভক্তির সাধন আবার বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে আন্তর বা মানসিক সাধনই মুখ্য হলেও শ্রবণকীর্তন প্রভৃতি বাহ্য সাধনও উপেক্ষণীয় নয়।

এরপর লেখিকা সাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে এই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে পঞ্চ অঙ্গই সাধন-প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

অবশ্য মহাপ্রভু যে চৌষট্টি প্রকার ভজনাঙ্গের উল্লেখ করেছেন, ভাগবতোক্ত নববিধা ভক্তিতেই তা পর্যবসান লাভ করে। তবে তিনি পঞ্চ সাধনাঙ্গের ওপর এমন গুরুত্ব আরোপ করলেন কেন, বিদুষী লেখিকা সবিস্তারে সে বিষয়েরও আলোচনা করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে সাধুসঙ্গ বলতে বোঝায়, যিনি নিজে যে ভাবের সাধক, সেই ভাবের উপাসকের সাহচর্য ; এর দ্বারাই ভক্তগণের ভাবের পরিপুষ্টি হয়ে থাকে। নামসংকীর্তনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই বলেছেন—

'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন চিত্তরূপ দর্পণকে নির্মল করে, সংসাররূপ মহা-দাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে, পরম মঙ্গলরূপ শ্বেতপদ্মের ওপর কৌমুদী বর্ষণ করে—কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন পরাবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, তা আনন্দসাগরের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, প্রতি পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ প্রদান করে, সকল আত্মাকে অবগাহন স্নানের স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করে। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই জয়যুক্ত হয়।

(আটত্রিশ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যত্র বলেছেন—

"নাম-সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়।
সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।
নাম-সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ-নাশ।
সর্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥"

ভাগবতশ্রবণও সাধনভক্তির এক প্রধান অঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে ভাগবতোক্ত লীলা অবলম্বনে কাব্য রচনা কিংবা সেই কাব্য পাঠ করলেও ভাগবতশ্রবণের তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধনার আর একটি অঙ্গ হচ্ছে মথুরাবাস কিন্তু মনে রাখতে হবে, এখানে মথুরা শব্দের দ্বারা সমস্ত ব্রজমণ্ডলই লক্ষিত হয়েছে। আর পঞ্চ সাধনের শেষ অঙ্গ শ্রীমূর্তির সেবা বলতে বোঝায় সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণমূর্তির সেবা।

শ্রীচৈতন্যোক্ত পঞ্চ ভজনাঙ্গের বিশ্লেষণের পর লেখিকা রাগানুগার বাহ্য ও আন্তর সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাবের ক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাগবতধর্মের ইতিহাসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ আমাদের পুরুষার্থ নয়, প্রেমই আমাদের পুরুষার্থ। এই প্রেমের অর্থ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা আর এই প্রেমের আকর্ষণে গৃহধর্ম, লোকধর্ম, শাস্ত্রীয় অনুশাসন সকলই তুচ্ছ হয়ে যায়। ব্রজগোপীদের মধ্যে, বিশেষত, মহাভাবময়ী রাধার মধ্যেই এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা; তাই তিনি গোপীগণের আনুগত্যে মধুরভাবে সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে নির্দেশ করেছেন। সন্ন্যাস আশ্রমে শেষ দ্বাদশ বৎসর তিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহ আস্বাদন করেছেন; এই

লীলাকেই বলা হয়েছে গম্ভীরালীলা বা অন্ত্যলীলা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যজীবনে আমরা দেখি—

'বহিরঙ্গ লৈয়া করে নামসংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ লৈয়া করে রস-আস্বাদন ॥'

অন্ত্যলীলার সময়ে তিনি রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদাবলী, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক আস্বাদন করতেন।

কিন্তু রাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ লীলা ছিল অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের উপলব্ধিগম্য। এই অবস্থায় মহাপ্রভুর দেহে দশটি দশাই স্ফুরিত হোতো—

'রোমকূপে রক্তোদ্‌গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদলীলা কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলায় সূত্রাকারে ও অন্ত্যলীলায় বিশদভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই দিব্যোন্মাদের অবস্থায়—

'তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।
অন্তর্দশা, বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্য আর ॥'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই দিব্যোন্মাদলীলার যে মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন, বিদুষী লেখিকা তারই অনুসরণ করেছেন। শ্রীমতী রাধিকার বিরহের যে আর্তি মহাপ্রভু নিজের অন্তরে অনুভব করে উন্মত্ত দশায় আপাতদৃষ্টিতে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তার রহস্য বুঝেছেন স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ। মহাপ্রভুর এই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম নৃলোকের পদার্থ নয়, এ প্রেমের আস্বাদন 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণের ন্যায়, মুখ জ্বলে, না

যায় ত্যজন'। মহাপ্রভুর এই লীলা সম্পর্কে মনস্বিনী লেখিকা বলেছেন—'কেবল কথায় নহে, কাব্যে নহে, প্রতিদিনের জীবন-চর্যার মধ্য দিয়া ব্রজরস আর কৃষ্ণবিরহের স্বরূপ মহাপ্রভু ফুটাইয়া তুলিলেন। এ যেন মর্ত্যের ধূলিধূসর অঙ্গনে স্বর্গের অমৃত বিতরণ। এমন করিয়া এ অমৃত কে কবে বিলাইয়াছে ?

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলায় স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই, ব্রজে যে লীলার সূচনা, নবদ্বীপে তাহারই সার্থক সমাপ্তি। তাই ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য আলোচনায় অনিবার্য ভাবেই আমাদের নবদ্বীপলীলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ব্রজলীলার মূর্ত রসবিগ্রহ, তাঁহার লীলা যে ব্রজলীলার অকৃত্রিম জীবন্ত ভাষ্য।'

মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদলীলার বর্ণনা করে মনস্বিনী লেখিকা গ্রন্থের উপসংহার করেছেন। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য ও ভাগবতধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে চান, তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি যেমন মূল্যবান, তেমনি যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তথা শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা ও দিব্যোন্মাদলীলার রস আস্বাদন করতে চান, তাঁদের পক্ষেও গ্রন্থখানি তেমনি উপভোগ্য। এই গবেষণা-গ্রন্থে লেখিকা শুধু বৈদগ্ধ্য ও তথ্যনিষ্ঠারই পরিচয় দেন নি, বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ও ভাগবতধর্মের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার বিশ্লেষণে তিনি যোগ্য অধিকারিণী। আমরা এই স্বর্গতা লেখিকার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর এই গ্রন্থখানি যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হলেই তাঁর দিব্যধামবাসী আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করবে, সন্দেহ নাই।

॥ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ॥

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ পরস্য শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য

[ভাগবতপুরাণ ১১।৬।১৪]

ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥

[পদ্যাবলী—৯৯ শ্লোক]

অবতরণিকা

দিগন্তবিস্তৃত সুনীল জলরাশি করে আকর্ষণ, করে তন্ময়। মানুষের সীমিত শক্তি তাহার বিশালতা পরিমাপ করিতে পারে না; তবু তাহার অতৃপ্ত নয়নের নিরন্তর আরতিরও বিরাম নাই। ভারত-ইতিহাসের অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সত্য ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধিও মানবকল্পনার অতীত; তবু তাঁহার প্রতি ভারতীয়মাত্রেরই আকর্ষণ দুর্নিবার। এই দুর্নিবার আকর্ষণে মহাভারতের যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কত যোগি-ঋষি, সাধক-কবি, দার্শনিক-ধর্মপ্রচারক, ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু এ চরিত্র সর্বগুণাধার, অতলস্পর্শী এবং সেই কারণেই বিচিত্র ও জটিল। তিনি একাধারে গোপালক ও ব্রজগোপীদের জীবন, বীরযোদ্ধা ও রাজন্যবর্গের ভাগ্যবিধাতা, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও কূটনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও ধর্মসংস্থাপক, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের প্রবক্তা এবং সমন্বয়কারী। তাঁহার চরিত্রে সন্ন্যাসীর ত্যাগ ও গার্হস্থ্যধর্মের সুখভোগের অপূর্ব মিলন, রজঃ ও সত্ত্ব গুণের মধুর সামঞ্জস্য, প্রচণ্ড কর্মোদ্যম ও মানসিক স্থৈর্যের নির্বিরোধ সমাবেশ। এহেন পরিপূর্ণতম জীবনের প্রতি সকল যুগের সকল মানুষেরই আকর্ষণ অনিবার্য। আর আকর্ষণের ধর্মই হইতেছে তাহা শক্তির সীমাবদ্ধতা ভুলাইয়া দেয়, ব্যর্থতার আশঙ্কা তুচ্ছ করিতে প্রেরণা যোগায়, দুঃসাহসী হইতে সহায়তা করে।

শক্তি আমাদের পরিমিত, দুঃসাহস সীমাহীন সন্দেহ নাই। তথাপি এই দুঃসাহসিক প্রয়াসের পথেও আছে পূর্বাচার্যগণের নিরন্তর সাহচর্য ও অভ্রান্ত পথনির্দেশের নিশ্চিত আশ্বাস।

আলোচ্য বিষয়

এই পাথেয় সম্বল করিয়াই আমরা কৃষ্ণলীলার তাৎপর্য অনুধাবনে

প্রয়াসী হইয়াছি। তবে সমগ্র লীলা নহে, কারণ, মহাভারতে যে-চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও অসম্পূর্ণতার অতৃপ্তিতে স্বয়ং ব্যাসদেবকে পুনরায় ভাগবত রচনা করিতে হইয়াছে, সে-চরিত্রের সামগ্রিক আলোচনার কল্পনাও বাতুলতা। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের পরিপূর্ণতম প্রকাশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে দিক্‌টি পূর্বাচার্যগণকে সর্বাধিক মুগ্ধ করিয়াছে, কেবল সেই দিক্‌টি লইয়াই তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বতোমুখী চরিত্রের কেবল একটি দিক্—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য—আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইব। কারণ, আমাদের অনুভবে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে ব্রজলীলাই শ্রেষ্ঠ। এই লীলাতেই প্রেমঘন, আনন্দসর্বস্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য —উভয়বিধ শক্তির পরিপূর্ণতম প্রকাশ।

আলোচনার উপাদান

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে পুরাণসমূহই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার আকর। পুরাণের মধ্যে হরিবংশ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, পদ্ম, বায়ু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত, স্কন্দ, বামন ও কূর্ম পুরাণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ থাকিলেও কৃষ্ণ-লীলার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় হরিবংশ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রচলিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সন্দেহস্থল[১] বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার তাৎপর্য ও তাহার ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুধাবনে আমরা হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণকেই মুখ্যতঃ ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছি। কারণ প্রাচীনতা, প্রামাণিকতা ও বিবরণের পুঙ্খানুপুঙ্খতায় এই তিন পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তদুপরি অলৌকিক শক্তিধর মানব হইতে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে পরমদেবতার স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, তাহাও এই তিন পুরাণের বিবরণের মধ্য দিয়াই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন গোপবালক; তাঁহার

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়া মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব সকলেই বিস্মিত।

বিষ্ণুপুরাণে এই বিস্ময়ের সহিত আসিয়া যুক্ত হইয়াছে 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'র ভাব। এই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ হরিবংশের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কেবল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গোপবালক নহেন, তিনি দেবতাবিশেষ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার 'আমরা' নামক কবিতায় যে-উক্তি করিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণের শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাহার প্রতিধ্বনি করিযা বলা যায়—'ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া।' এই পুরাণে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি লইয়াই তাঁহার আবির্ভাব।

আর ভাগবতপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ কেবল দেবতাই নহেন, তিনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই ভাগবতধর্মের উদ্ভব।

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের এই ক্রমপরিণতি এবং ব্রজলীলার তাৎপর্য আলোচনার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও তদাশ্রিত ধর্মমত সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী আধুনিক পণ্ডিতদের যে সকল পরস্পরবিরোধী মতবাদ প্রচারিত হইযাছে, তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা বিচার

তবে প্রারম্ভেই উল্লেখযোগ্য, এই আলোচনা একান্তভাবেই ঐতিহাসিক। কারণ, ধর্মপ্রাণ হিন্দুর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা এবং কখন, কোথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহার নিকট নিতান্তই অবান্তর; কেবল অবান্তর নহে, একপ্রকার গর্হিত ধর্মদ্রোহিতা।

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে এবং অব্যবহিত পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্ণনামধারী বিভিন্ন গোত্রীয় ঋষিদের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩তম ঋকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ম ঋকে বিশ্বকায়ের পিতা ঋষি

কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। ঐ বেদেরই অষ্টম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে আর এক কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়; অনুক্রমণীতে তিনি কৃষ্ণ আঙ্গিরসরূপে অভিহিত। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে [৩০।৯] আঙ্গিরস-গোত্রীয় এবং ঐতরেয় আরণ্যকে [৩।২।৬] হারীত-গোত্রীয় দুইজন কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে অংশুমতীতীরনিবাসী এক কৃষ্ণের কথা আছে। এই কৃষ্ণ অনার্য রাজা; ইনি ইন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আর এক কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়; তিনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য, দেবকীপুত্র।[২]

মহাভারতের কৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডবকুলের আত্মীয়, পাণ্ডবদের সুহৃদ্ ও উপদেষ্টা, কুরুক্ষেত্র-সমরে অর্জুনের সারথি। মহাভারতের প্রথম স্তরে তিনি বীর মানব, দ্বিতীয় স্তরে দেবত্ব আরোপের ফলে বিষ্ণুর অংশাবতার, তৃতীয় স্তরে পরম দেবতা, পূর্ণ ব্রহ্ম।[৩]

পুরাণসমূহে কৃষ্ণ যদুবংশসম্ভূত; তাঁহার বাল্যজীবন গোকুলে ও পরবর্তী জীবন মথুরা ও দ্বারকায় অতিবাহিত হয়। তিনি বিষ্ণু-নারায়ণরূপে দেবতায় পরিণত হন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্ণ বাসুদেব অথবা দেবকীপুত্র নামে উল্লিখিত হন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণসমূহের কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্র।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে কৃষ্ণ নামের উল্লেখ নাই; তবে বাসুদেব ও অর্জুনের ভক্তদের কথা আছে।[৪]

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব-ভক্তদের বাসুদেববর্গ ও বাসুদেব-বর্গীয় নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কালে যে বলরাম ও বাসুদেবের মন্দিরে মৃদঙ্গ শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত, বাসুদেব ও কৃষ্ণ-যে একই ব্যক্তি, তাঁহার কালের পূর্বেই যে নারায়ণ-বিষ্ণুর সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছেন।[৫]

বৌদ্ধ ঘটজাতকের মতে বাসুদেব উত্তর মথুরার (মধুরার) রাজবংশের সন্তান, তাঁহার অপর নাম কণ্‌হ (কৃষ্ণ)।[৬]

জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রে বাসুদেব ক্ষত্রিয় যুবরাজ, দ্বাদশ উপাঙ্গে বৃষ্ণিবংশের কণ্‌হ [কৃষ্ণ] বাসুদেব ও বলরামের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।[৭]

গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় Methora এবং Cleisobora নগরীর Sourasenoi-দের নিকট Herakles বিশেষ পূজিত ছিলেন[৮]; Herakles বাসুদেব, Sourasenoi শূরসেন অথবা সাত্বতগণ, Methora ও Cleisobora মথুরা ও কৃষ্ণপুর একথা সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন।[৯]

সাহিত্যের এই সকল নিদর্শন ছাড়াও বেসনগর, ঘোষুণ্ডি, নানাঘাট ও মোরা শিলালেখ হইতে বাসুদেবের পূজার কথা জানা যায়। এই সকল শিলালেখের মধ্যে প্রথম তিনটি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে এবং চতুর্থটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে উৎকীর্ণ।

সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বের এই সকল নিদর্শনের ভিত্তিতে গত শতাব্দী হইতে কৃষ্ণ-সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল মতবাদ আলোচনার পূর্বে বলা প্রয়োজন, আমরা যে-কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, তিনি যাদব, সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত বসুদেব ও দেবকীর পুত্র; তিনি শৌরী, বার্ষ্ণেয়, মাধব প্রভৃতি গোত্রনামেও পরিচিত। আমরা অতঃপর তাঁহাকে পুরাণের কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিব।

শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ মানব

একশ্রেণীর বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ্ শ্রীকৃষ্ণের মানবত্বে আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে লৌকিক দেবতা। Barth-এর মতে শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক সৌরদেবতা,[১০] Hopkins-এর মতে অনার্য গোষ্ঠীবিশেষের উপাস্য দেবতা,[১১] আর Keith-এর মতে কৃষ্ণ মূলতঃ উদ্ভিদজন্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত

দেবতা (Vegetation deity)।[১২] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-যে মূলতঃ মানব তাহা ঋগ্বেদ, উপনিষদ, মহাভারতের আদিস্তরের রচনা, প্রাচীন পুরাণ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। তবে মূলতঃ মানব হইলেও তিনি যে খৃষ্টপূর্ব যুগেই ভাগবতধর্মালম্বীদের নিকট দেবতায় পরিণত হন, তাহার ইঙ্গিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে[১৩] এবং স্পষ্ট প্রমাণ মেগাস্থিনিস ও পতঞ্জলির রচনা তথা বেসনগর, ঘোষুণ্ডি, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে পাওয়া যায়। তারপর খৃষ্টপরবর্তী যুগে বৈদিক দেবতা বিষ্ণু ও নারায়ণের সহিত সমীভবনের ফলে বাসুদেব-কৃষ্ণ বৈদিক দেবতামণ্ডলীতে স্থান লাভ করেন। এইভাবে মানব কৃষ্ণ দেবতায় পরিণত হইলে তাঁহার জীবনীতে যে-সকল অলৌকিক কাহিনী আরোপিত হয়, তাহার ভিত্তিতেই Barth প্রভৃতি গবেষকগণ তাঁহাকে মূলতঃ দেবতারূপে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ এক না একাধিক

শ্রীকৃষ্ণ আদিতে মানব ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়ার পরও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। সাহিত্যে ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, সেই সমস্তই কি যাদব বা সাত্বতবংশীয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কিত অথবা কৃষ্ণ নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন? এ সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়।

ঋগ্বেদ ও পুরাণের কৃষ্ণ

কেহ কেহ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণকে ঋগ্বেদের আঙ্গিরস-কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পৌরাণিক ঐতিহ্যে এই সিদ্ধান্তের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ, পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ কোথাও বৈদিক-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অথবা আঙ্গিরসরূপে উল্লিখিত হন

নাই।[১৪] কেহ কেহ আবার ঋগ্বেদের অংশুমতীতীরনিবাসী অনার্য কৃষ্ণের সহিত পুরাণের বাসুদেব-কৃষ্ণের অভিন্নতায় বিশ্বাসী, কারণ ইঁহাদের মতে অংশুমতী ও যমুনা একই নদীর নাম।[১৫] কিন্তু এই নদী দুইটি যে স্বতন্ত্র, তাহা বৃহদ্দেবতা গ্রন্থ হইতে সমর্থিত হয় এবং পৌরাণিক কৃষ্ণ অনার্য বলিয়া ইঁহারা যে-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং অংশুমতীতীরনিবাসী অনার্য কৃষ্ণের সহিত পুরাণের বাসুদেব-কৃষ্ণের অভেদ সমর্থনযোগ্য নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও পুরাণের কৃষ্ণ

কাহারও মতে আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ এবং পুরাণের কৃষ্ণ অভিন্ন। ইহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে বলেন যে, উভয়ত্রই কৃষ্ণ দেবকীপুত্র এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও গীতার শিক্ষার মধ্যে একটা গভীর ভাবসাদৃশ্য বর্তমান।[১৬] কিন্তু অনেকে[১৭] এই সিদ্ধান্তের সহিত একমত নহেন। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে, মহাভারত এবং পুরাণে গর্গ ও সান্দীপনি শ্রীকৃষ্ণের গুরু, ঘোর আঙ্গিরস নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও গীতার কতকগুলি শ্লোকের বক্তব্যে সাদৃশ্য থাকিলেও কেবল সেই যুক্তিতে উভয় কৃষ্ণকে এক বলা চলে না। উপরন্তু গীতায় দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইলেও ঘোর আঙ্গিরসের উল্লেখ কোথাও নাই। সুতরাং উভয় কৃষ্ণের দেবকীপুত্ররূপে পরিচিতি আকস্মিক বলিয়া গণ্য করাই সমীচীন।

কেহ কেহ আবার মহাভারত, গীতা ও পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতায় সন্দিহান।[১৮] ইঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ একাধিক, পরে তাঁহাদের সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ইঁহারা বলেন—মহাভারতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিবরণ নাই, তেমনই আবার প্রাচীন পুরাণসমূহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদের সম্পর্কের কোন প্রসঙ্গ নাই। দ্বিতীয়তঃ, কুরুক্ষেত্রসমরে শ্রীকৃষ্ণ-

চরিত্রের যে-পরিচয় পরিস্ফুট, তাহা যেমন গীতার শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী, তেমনই আবার ব্রজলীলায় গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ মহাভারত ও গীতার শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পক্ষে অকল্পনীয়।

কিন্তু এই সকল যুক্তির ভিত্তিতে মহাভারত, গীতা ও পুরাণের শ্রীকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, মহাভারতের উপজীব্য কুরু-পাণ্ডবের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যুবক শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সখা ও উপদেষ্টা। এখানে তাঁহার বাল্যলীলা বর্ণনার অবকাশ নাই। তবে মহাভারত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্পর্কে একেবারেই নীরব, একথা মনে করাও ভুল। মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ দেখা যায়। শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা-প্রসঙ্গে পূতনাবধ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি বাল্যলীলার উল্লেখ করিয়াছেন। কংসনিধনকারী গোকুলের শ্রীকৃষ্ণই-যে পাণ্ডবদের সখা ও উপদেষ্টা এবং তিনিই-যে জরাসন্ধবধে তাঁহাদের সাহায্য করেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে।[১১]

প্রাচীন পুরাণসমূহে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সম্পর্কের কোন প্রসঙ্গ নাই সত্য, কিন্তু তাহার কারণও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা মহাভারতে অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই প্রাচীন পুরাণসমূহে নিষ্প্রয়োজনবোধে তাহা বর্ণনা করা হয় নাই। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পরিপূরকরূপেই যে পুরাণসমূহ রচিত, তাহা ভাগবতপুরাণের প্রথম স্কন্দের চতুর্থ অধ্যায়ে নারদব্যাসদেব-সংবাদে জানা যায়।

কুরুক্ষেত্রসমরে দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্যোধনবধে নীতিবিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ যে-ভাবে পাণ্ডবদের প্ররোচনা দিয়াছেন, তাহা গীতার শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী; সুতরাং এই দুই কৃষ্ণ স্বতন্ত্র—এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করা যায় না। কারণ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের ফলে মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্র-যে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং শৈব উপাসকদের হস্তক্ষেপ-যে সর্বশেষে

ঘটিয়াছে, সেকথা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।[২০] সুতরাং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা ছাড়া, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, বিশেষ অবস্থায় বাধ্য হইয়া নীতিবিরুদ্ধ কূটকৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় লইলেও গীতার শ্রীকৃষ্ণচরিত্র হইতে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে স্বরূপতঃ পৃথক বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই।

পুরাণে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলায় গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের শিথিল চরিত্রের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মহাভারত ও গীতার শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অকল্পনীয়; সুতরাং পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভারত ও গীতার শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতেই অভিন্ন বলা চলে না—এই সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পুরাণের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বিরুদ্ধে এই প্রধান অভিযোগটি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই। জাতকের কাহিনীতে এবং মহাভারতে ব্রজগোপীদের কোন প্রসঙ্গ নাই। ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিন্দিত সম্পর্ক থাকিলে শিশুপাল সভাপর্বে কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহার উল্লেখ না করিয়া ছাড়িতেন না।[২১] ইহা হইতে কেহ কেহ গোপীপ্রসঙ্গই ভিত্তিহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[২২] এই সিদ্ধান্তও সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় গোপীপ্রসঙ্গের ঐতিহ্য যে অতি প্রাচীন, তাহা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত[২৩] হইতে জানা যায়। তবে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা যে আদিতে গ্রাম্য নৃত্যগীতমূলক নির্দোষ প্রমোদ ছিল, তাহা ভাসের বালচরিতের[২৪] বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হয়। এই নির্দোষ প্রমোদই ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন পুরাণে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

"এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথমে কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।"[২৫] এই

প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও স্মরণীয়—ব্রজগোপীদের সহিত লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একাদশবর্ষীয় বালক; বৃন্দাবনত্যাগের পর তিনি আর কখনও সেখানে ফিরিয়া যান নাই; ব্রজগোপীদের প্রতি সমাজনিন্দিত আকর্ষণ থাকিলে তিনি অবশ্যই বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতেন। সুতরাং গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে কোন কলঙ্ক আরোপ করা চলে না এবং এই যুক্তি দেখাইয়া মহাভারত, গীতা ও পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। মহাভারত ও পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রাপ্ত ভোজবর্মনের তাম্রশাসন হইতেও প্রতিপন্ন হয়।[২৬]

পুরাণের কৃষ্ণ ও খৃষ্টান প্রভাব

কাহারও মতে আবার পুরাণের কিশোর শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ গোপকৃষ্ণ একান্তভাবে খৃষ্টধর্মের প্রভাবজাত। গোপকৃষ্ণ ও শিশু খৃষ্টের জীবনের কতকগুলি ঘটনায় সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী কোন সময়ে ভারতীয় বণিক্ ও পর্যটক অথবা খৃষ্টান ধর্মযাজক অথবা আভীরগণ কর্তৃক খৃষ্টজীবনের কাহিনী ভারতে প্রচারিত হয়। খৃষ্ট ও কৃষ্ণ নামের ধ্বনিসাম্যের ফলে[২৭] শিশু খৃষ্টের জীবনের কতকগুলি কাহিনীর অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণেরও বাল্যজীবনের কতকগুলি কাহিনীর সৃষ্টি হয় এবং তাহাই পরে পুরাণের শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হয়। Weber-ই[২৮] প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন এবং পরে ইহা অনেকেরই সমর্থন লাভ করে।[২৯] শিশু খৃষ্টের জীবনের কোন কোন ঘটনার সহিত গোপালকৃষ্ণের জীবনের কয়েকটি ঘটনার সাদৃশ্যের ফলে গোপালকৃষ্ণের সৃষ্টিমূলে খৃষ্টান প্রভাব স্বীকার করিতে হইলে গ্রীকবীর Perseus-এর কাহিনীর প্রভাবও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যুসম্পর্কে নারদের ভবিষ্যদ্বাণী (হরিবংশের মতে), পূতনাবধ, কালিয়দমন প্রভৃতি

ঘটনার সহিত Perseus-এর জীবনকাহিনীর সাদৃশ্যই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় খৃষ্টপ্রভাব সম্পর্কে ইহারা যে-যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে।

অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক কল্পনা হইতেই গোপাল-কৃষ্ণের উদ্‌ভব। কারণ ঋগ্বেদে বিষ্ণু 'গোপা' (১৷২২৷১৮) এবং 'যুবা' 'অকুমারঃ' (১৷১৫৫৷৬) বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। 'গোপা' অর্থ গাভীগণের রক্ষক আর 'যুবা' 'অকুমারঃ' অর্থ চিরনবীন, চিরকিশোর[৩০]। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, গোপালকৃষ্ণের কতকগুলি লীলা নিঃসন্দেহে অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক। শ্রীকৃষ্ণ দেবতায় পরিণত হওয়ার পর এই দ৺ন কাহিনীর উদ্ভব।

ঋগ্বেদ, উপনিষদ, মহাভারত ও গীতার কৃষ্ণের সহিত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক আলোচনার পর তিনি কখন আবির্ভূত হন, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তাঁহার উপস্থিতি এবং পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল নির্ণয় করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল

কিন্তু কুরুক্ষেত্র-সমরের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ সহজসাধ্য নহে। এবিষয়ে দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ এতই গুরুতর যে, তাঁহাদের সকলের মতামতকে তুল্যমূল্য দিলে বলিতে হয়, ৩১০২ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ, এই আড়াই হাজার বছরের মধ্যে যে-কোন সময় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল।[৩১]

ভারতযুদ্ধ সম্বন্ধে দেশীয় রক্ষণশীল সমাজে দুইটি মত প্রচলিত; একটি আর্যভট্টের, অপরটি বৃদ্ধগর্গ, বরাহমিহির ও কল্‌হণ প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্‌ ও ঐতিহাসিকদের। আর্যভট্টের গণনা অনুযায়ী

ভারতযুদ্ধের কাল ৩১০২ খৃষ্টপূর্বাব্দ আর বৃদ্ধগর্গ, বরাহমিহির ও কল্হণের মতে ২৪৪৯ খৃষ্টপূর্বাব্দ। কিন্তু এই দুই মতই অনুমান-নির্ভর গণনা-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

মহাভারতে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। তাহার ভিত্তিতে আধুনিক ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ্‌গণ ভারত-যুদ্ধের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল তথ্য এত পরস্পরবিরোধী যে. ইহার ভিত্তিতে কোন নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।[৩২]

বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ু পুরাণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহার ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে[৩৩], রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে[৩৪], হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী খৃষ্টপূর্ব নবম শতকের মধ্যভাগে[৩৫] এবং Pargiter[৩৬] আনুমানিক ৯৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, ভারতযুদ্ধের সম্ভাব্য কাল সম্বন্ধে ইঁহারা যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার মধ্যেও প্রায় ছয় শতাব্দীর ব্যবধান। তবে ইঁহাদের সকলের আলোচনা হইতে একটি বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, বাসুদেব-কৃষ্ণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের এবং উপনিষদ্-সমূহ সংকলিত হওয়ার পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। Garbe এবং রমাপ্রসাদ চন্দ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন।[৩৭]

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ্‌-গণের বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার উপসংহারে Winternitz-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়—"Much as has been written on the problem of Krishna, we must admit, nevertheless, that no satisfactory solution has been found."[৩৮] তবে মোটের উপর বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ মানব, পরে তিনি দেবতায় পরিণত হন; বাসুদেব ও কৃষ্ণ স্বতন্ত্র নহেন, বসুদেব

ও দেবকীর পুত্র বলিয়া তিনি বাসুদেব ও দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত, গোপালকৃষ্ণের সৃষ্টিমূলে খৃষ্টান প্রভাবের কল্পনা ভিত্তিহীন, গোপাল-কৃষ্ণ ভারতের নিজস্ব সম্পদ, ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ হইতে তিনি স্বতন্ত্র, কিন্তু মহাভারত ও গীতার কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন।

কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার ন্যায় তৎপ্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কাহারও মতে এই ধর্ম বেদমূলক, কাহারও মতে অবৈদিক, আবার কাহারও মতে এই ধর্ম খৃষ্টধর্মের প্রভাবজাত। ইহাদের এই সকল মত আলোচনার পূর্বে এই ধর্মের বিশেষত্ব নির্দেশ করা প্রয়োজন।

বৈদিক আর্যগণের ধর্মজীবনের কেন্দ্রে ছিল যজ্ঞ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপলব্ধি করিলেন, যাগযজ্ঞে দুঃখের বিনাশ হয় না, শান্তিও লাভ করা যায় না। ইহা ছাড়া বৈদিক কর্মে পশুহিংসা থাকায় অনেকের তাহাও ভাল লাগিল না। সুতরাং ইহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় একদিকে দেখা দিল উপনিষদের জ্ঞানবাদী ঋষিদের ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা, অপরদিকে ভক্তিমার্গে উপাসনা। উপনিষদের যুগে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়া যাঁহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, তাঁহারা ছিলেন ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয়সমাজ আর্য কি আর্যেতর জাতির অন্তর্ভুক্ত, সে তর্কের মীমাংসা সহজে হইবার নয়।[৩১] সে যাহাই হউক, উপনিষদের যুগে যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে যে মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল, ক্ষত্রিয়সমাজই যে তাহার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে ও আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধিদলের

সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে।… …ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ কারতে চাহিয়াছে।……ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনও একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনও দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই এককে দেখিয়াছে।……এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।"[৪০]

ভক্তিধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব-কৃষ্ণ : সেই ধর্মের সামান্য লক্ষণ

এই ভক্তিধর্মের প্রবর্তক ক্ষত্রিয়সন্তান বাসুদেব-কৃষ্ণ। 'মধ্যদেশের' আর্যসমাজের প্রভাবমুক্ত 'বহির্দেশের'[৪১] মথুরা অঞ্চলে যাদবজাতির অন্তর্ভুক্ত সাত্বতবংশে তাঁহার জন্ম। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে তিনি স্বজাতির মধ্যে একেশ্বরবাদের ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই ধর্মের উপাস্য দেবতা 'ভগবৎ'। ভক্তিমার্গে সাধনাই এই ধর্মে মুক্তির একমাত্র পন্থারূপে নির্দিষ্ট। এই ধর্ম আদিতে স্বজাতির মধ্যে প্রবর্তিত হইলেও পরে 'বহির্দেশে'র অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসার লাভ করে এবং খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই এই ধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব-কৃষ্ণ 'ভগবৎ'-এর সহিত একাত্ম হইয়া বুদ্ধদেবের ন্যায় স্বসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতায় পরিণত হন।[৪২]

বাসুদেব-কৃষ্ণ প্রচারিত এই ধর্মমত বর্তমানে বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত হইলেও সম্প্রদায়গত এই নামটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। গুপ্তযুগের পূর্বে যে ইহা প্রচলিত ছিল না, তাহা সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শন আলোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতের

একেবারে শেষের দিকের একটি অংশে[৪৩] ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারত-মহাকাব্যের ফলশ্রুতিমূলক এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতের বর্তমানরূপ পরিগ্রহকালের শেষের দিকে রচিত বলিয়াই পণ্ডিতদের অভিমত। এই মতের সমর্থন পাদ্মতন্ত্র নামক প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র-সংহিতার একটি শ্লোক হইতেও পাওয়া যায়। ইহাতে এই ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নামের যে তালিকা আছে, তাহাতে 'বৈষ্ণব' নামটি নাই। পাদ্মতন্ত্রের সেই শ্লোকটি হইতেছে—

"সূরিস্-সুহৃদ্-ভাগবতস্ সাত্বতঃ পঞ্চকালবিৎ।
একান্তিকস্ তন্ময়শ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি॥"

দেখা যাইতেছে, এই শ্লোকে ভাগবত, সাত্বত, একান্তিক, তন্ময় ও পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি নাম সমার্থবাচক এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ধর্মের বিশেষত্বের দ্যোতক। বাসুদেব-কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্মমতে উপাস্য দেবতা 'ভগবৎ', সুতরাং এই ধর্মের নাম ভাগবতধর্ম; এই ধর্মের প্রবর্তক সাত্বতবংশসম্ভূত বাসুদেব-কৃষ্ণ, তাই এই ধর্মের নাম সাত্বত ধর্ম; এই ধর্ম একেশ্বরবাদী—সেই একদেবতার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণতাই এই ধর্মে প্রয়োজন বলিয়া ইহার নাম একান্তিক বা তন্ময় ধর্ম। কিন্তু এই ধর্মের নাম পাঞ্চরাত্র কেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন নারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহাতে তত্ত্ব, মুক্তিপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, যৌগিক ও বৈশেষিক এই পাঁচ প্রকার জ্ঞানের ('রাত্র') বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে, সেই হেতু ইহার নাম পঞ্চরাত্র। এই ব্যাখ্যা কিছুটা কষ্টকল্পিত হইলেও F. O. Schrader-এর মতে অন্য ব্যাখ্যা হইতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[৪৪]

ভাগবতধর্মের উৎস গ্রন্থসমূহ

বাসুদেব-কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবতধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে, শাণ্ডিল্য-

সূত্রে, ভাগবতপুরাণে, পাঞ্চরাত্র আগমসমূহে, আলোয়ার সাধকদের ও আচার্য রামানুজের রচনাবলীতে। ইহা ছাড়া নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভগবদ্‌গীতাও এই ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায় প্রাচীনতম এবং ইহাতে ভাগবতধর্মের বিশেষত্বের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু বৈদিকীকরণের ফলে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ের বিবরণেও এই ধর্মের আদিম রূপটি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া পণ্ডিতদের অভিমত [৪৫]

এই আদিম রূপটি রক্ষিত আছে পাঞ্চরাত্র আগম ও সংহিতা-সমূহে। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সাধকগণ এই শাস্ত্রবিধি অনুসারেই সাধনা করিতেন। এই শাস্ত্র কোন সময়ে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। 'জনার্দনস্বাত্ম চতুর্থ এব' পতঞ্জলির এই উক্তি হইতে ভাণ্ডারকর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের চতুর্ব্যূহ কল্পনা বাসুদেব-পূজকদের মনে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে এবং খৃষ্টাব্দ আরম্ভের কিছু পরেও 'বীরপূজা' বা 'বীরবাদ' ভাগবতগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; পাঞ্চরাত্রমতের প্রসার ঘটে তাহার পরে।[৪৬]

এই শাস্ত্রের উদ্ভবকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপ কিছু বলা সম্ভব না হইলেও এই শাস্ত্রের যে-সমস্ত গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যে অনেক পরবর্তী কালের রচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। Schrader তাঁহার Introduction to the Pancaratra and the Ahirbuḍhnya Samhita গ্রন্থে ২২৪ খানি পঞ্চরাত্র-সংহিতার এক তালিকা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সংহিতাগুলির রচনাকালের শেষ সীমা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী।[৪৭]

পঞ্চরাত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব

পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য

দেবতাকে পঞ্চরূপে ভাবনা করিতেন। এই পঞ্চরূপ যথাক্রমে—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী এবং অর্চা।[৪৮] পাঞ্চরাত্রিকেরা শ্রীভগবানের পর রূপকে 'পর বাসুদেব' আখ্যা দিয়াছেন। এই মতে পর বাসুদেবই পরম দেবতা, পরম তত্ত্ব, তিনিই পুরুষসূক্তে বর্ণিত পরম পুরুষ। তিনি সর্বশক্তিমান, জগতের কারণ; এই বাসুদেবই সুদর্শনাখ্য বিষ্ণু।

প্রলয়-অবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টি আরম্ভের পূর্বে একমাত্র বাসুদেবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীন ছিল। স্থাবর-জঙ্গমাদি জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির বাসনা যখন সেই নির্বিকল্প ভগবানের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি এই ইচ্ছা তাঁহার একমাত্র মহাশক্তি শ্রীদেবীতে সম্প্রসারিত করেন। ভগবান পরস্পরের সমকার্যক। এই শক্তি অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। তাঁহার এই শক্তির সৃষ্টি উপলক্ষে যে প্রথম উন্মেষ, তাহাই লক্ষ্মীরূপ জগৎরূপে লক্ষ্যমাণ বলিয়া তিনি লক্ষ্মী।[৪৯] শক্তিরূপা বিষ্ণুর যে সৃষ্টি, তাহা দুই প্রকারের—শুদ্ধসৃষ্টি ও শুদ্ধেতর সৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টি হইল 'গুণোন্মেষ দশা' অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে অবস্থিত ব্রহ্মের নিস্তরঙ্গ সত্তায় গুণসমূহের প্রথম উন্মেষ। জ্ঞান, বল, বীর্য, ঐশ্বর্য, শক্তি ও তেজ—এই ছয়টি আদর্শ গুণের আবির্ভাবের নামই 'গুণোন্মেষদশা'। শুদ্ধেতর সৃষ্টি হইল মনু প্রভৃতি অবলম্বনে প্রজাসৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টির ভিতরে চারটি স্তর লক্ষ্য করা যায়; ইহাই পঞ্চরাত্রের প্রসিদ্ধ চতুর্ব্যূহতত্ত্ব। এক-একটি ব্যূহ ভগবানের এক-একটি প্রকাশের স্তর। দীপ্তি ও দাহিকা শক্তিতে যেমন একটি দীপশিখার সহিত অপরটির কোন পার্থক্য নাই, তেমনই ভগবান বাসুদেবের এই ক্রমবিকশিত মূর্তিগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন ভেদ নাই, তবে গুণবিকাশের তারতম্য ও আবির্ভাবের পর্যায়ক্রম আছে। চতুর্ব্যূহের নাম যথাক্রমে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ।[৫০] পরতত্ত্ব হইলেন পর বাসুদেব; সেই পর বাসুদেব হইতেই ব্যূহবাসুদেবের উৎপত্তি। পর বাসুদেব এক অংশে ব্যূহবাসুদেবরূপে আবির্ভূত হন, অন্য অংশে

তিনি নারায়ণ-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই বাসুদেবতত্ত্বই বিষ্ণু-শক্তির প্রথম অবস্থা। ইহা বিষ্ণুর অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রথম অভিব্যক্তির লক্ষণ। শক্তি ও শক্তিমানের প্রথম ভেদকেই বাসুদেব-তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। সর্বশক্তিমান বাসুদেব সৃষ্টির ইচ্ছায় নিজেকে বিভক্ত করেন; আপনাতে আপনি বিভক্ত এই রূপই হইলেন সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণব্যূহেই শুদ্ধসৃষ্টি হইতে ক্রমান্বয়ে শুদ্ধেতর সৃষ্টির অস্ফুট প্রকাশ। সঙ্কর্ষণব্যূহ হইতে প্রদ্যুম্নব্যূহের উৎপত্তি। এই ব্যূহে আসিয়া পুরুষ হইতে প্রকৃতি বিভক্ত হইল অর্থাৎ এই স্তরেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উদ্ভব। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উদ্ভবের পর পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে সৃষ্টির যে-বর্ণনা আছে, তাহাতে মোটামুটি ভাবে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি। অনিরুদ্ধ যেন প্রদ্যুম্নের নিকট হইতে সৃষ্টিভার গ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের আরব্ধ কর্মই সুসম্পন্ন করেন। তিনি জড় ও চেতনের সৃষ্টি করিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরূপে বিরাজ করেন।

বাসুদেব ষড়্‌গুণান্বিত ভগবান, সঙ্কর্ষণে এই ষড়্‌গুণের জ্ঞান ও বল, প্রদ্যুম্নে ঐশ্বর্য ও বীর্য এবং অনিরুদ্ধে শক্তি ও তেজের প্রকাশ।

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে এবং পঞ্চরাত্রসংহিতায় সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের আর এক রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। এই কল্পনা অনুসারে সঙ্কর্ষণ জীবাত্মার, প্রদ্যুম্ন মন বা বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ অহংজ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।[৫১]

বাসুদেবের ব্যূহরূপের পর অন্যতম বিশিষ্টরূপ হইল তাঁহার 'বিভব' রূপ। শ্রীভগবান কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পার্থিবরূপ গ্রহণ করিয়া মর্ত্যধামে অবতরণ করেন এবং সেইজন্যই তাঁহার 'বিভবরূপে'র অপর নাম 'অবতাররূপ'।

পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে কল্পিত ভগবানের চতুর্থরূপ তাঁহার অন্তর্যামিরূপ। অন্তর্যামী শব্দের অর্থ—যিনি অন্তরে থাকিয়া সকলকে পরিচালনা করেন। যদিও অন্তর্যামীর কল্পনা বৃহদারণ্যক উপনিষদে[৫২] সর্বপ্রথম

পাওয়া যায়, তথাপি ভগবানের অন্তর্যামিরূপের বৈশিষ্ট্য গীতায় অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[৫৩]

শ্রীভগবানের পাঞ্চরাত্র-কল্পিত শেষরূপ তাঁহার অর্চারূপ। অর্চার অর্থ পূজার যোগ্য প্রতিমা। পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ ইষ্ট-দেবতার বিভিন্ন প্রকাশের প্রতিমাসমূহ নির্মাণ করাইয়া দেবগৃহে প্রতিষ্ঠাপূর্বক পূজার্চনা করিতেন। কারণ তাঁহাদের মতে এই সকল দেবমূর্তি ভগবানের 'শ্রীবিগ্রহ' বা মঙ্গলময় শরীর এবং এগুলি ভক্তদের ভগবৎসম্বন্ধীয় ধ্যানধারণার বিশেষ অনুকূল।

এই পঞ্চরাত্র মতবাদের উদ্ভব উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতে উদ্ভূত হইয়া এই মতবাদ পরে দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে। Schrader বলিয়াছেন—এককালে কাশ্মীর, ওড়িশা ও মহীশূরে (বর্তমানে কর্ণাটক) ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন কেবল দক্ষিণ ভারতেই ইহা অংশতঃ অনুশীলিত হইয়া থাকে।[৫৪]

বৈষ্ণবধর্মে পঞ্চরাত্রের প্রভাব

পঞ্চরাত্র-মতবাদ কালক্রমে লোপ পাইলেও পরবর্তী বৈষ্ণবধর্মে ইহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্ম, জীব ও জগতের অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে আচার্য রামানুজের সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণবধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ প্রপত্তি বা শরণাগতি, প্রতিমাপূজা, তিলক ও ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-ধারণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার পঞ্চরাত্র প্রভাবেরই ফল।[৫৫]

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণও পাঞ্চরাত্র-বর্ণিত শক্তি-ও শক্তিমান্-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবৈষ্ণব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর ইহার প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অহির্বুধ্ন্যসংহিতার দুইটি শ্লোক[৫৬] উদ্ধৃত করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"এই কয়টি শ্লোক দ্বারা জগৎকারণ ও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় অতি বিশদ-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। জগৎপ্রসবিনী বিষ্ণুশক্তির ও জগৎ-কারণ বিষ্ণুর এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের প্রেমভক্তিবাদের মূল ভিত্তিস্বরূপ—ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়।

আচার্য রামানুজ প্রভৃতি ভক্তাচার্যগণও এই ভেদাভেদবাদের অবলম্বনে বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।[৫৭]

ভাগবতধর্মের বেদমূলকতা বিচার

কৃষ্ণ-বাসুদেব-প্রবর্তিত ভাগবতধর্মের স্বরূপ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে যেরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভাগবতধর্ম কি বেদমূলক, এই ধর্মের স্বরূপ যে-পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে নির্দিষ্ট সেই পঞ্চরাত্রমত কি বেদানুমোদিত? এ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই।

যাঁহারা ভাগবতধর্মের বেদমূলকতায় বিশ্বাসী তাঁহারা বলেন, ভাগবতধর্মের প্রধান দুইটি লক্ষণ—একেশ্বরবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব—বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন স্থলে নিঃসংশয় প্রকাশ পাইয়াছে; আর বেদের মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, সে সমস্তই কেবল দানধ্যানের আবেদনপত্র নয়। পারিভাষিক অর্থে 'ভক্তি' শব্দের উল্লেখ বেদে না থাকিলেও বরুণ-স্তুতিতে[৫৮] ভক্তির সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছে।[৫৯] মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠের 'মন্ত্রভাগবতে' উদ্ধৃত ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র[৬০] প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া ভক্তিবাদের শ্রুতিমূলকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন "আমার মনে হয়, ভক্তিরূপ সাধনমার্গ শ্রুতিই আমাদিগকে অতি স্পষ্টভাবে সর্বাগ্রে নির্দেশ করিয়া থাকেন। ঋক্‌সংহিতার মধ্যে অনেকগুলি এরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের স্বারসিক অর্থের উপর নির্ভর করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সকল মন্ত্র স্পষ্টভাবে ভক্তি, ভক্তির ফল ও ভক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন, সেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবৎ-তত্ত্বকেই নির্দেশ করিয়া দিতেছে।[৬১]

বেদে একেশ্বরবাদের অস্তিত্বের প্রসঙ্গে ইঁহারা বলেন, ঋগ্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রাচীনতম স্তরে বহুদেবতায় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া গেলেও ক্রমে ক্রমে ঋষিদের চিত্তে এক ও অদ্বিতীয় মহত্তম সত্তার উপলব্ধিও-যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্র হইতে জানা যায়। বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমার মতে বিপ্রগণ একই সর্বোত্তম সত্তাকে ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি নানা নামে বহুপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন[৬২] এই মন্ত্রে একেশ্বরবাদ নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট।

তাঁহারা আরও বলেন, কৃষ্ণ-বাসুদেব-বর্ণিত ধর্ম-যে প্রাচীন বৈদিক ধর্মমত হইতে উদ্ভূত, তাহা 'ভগবৎ' নাম হইতেই অনুমিত হয়। ঋগ্বেদেও 'ভগ' নামে একটি দেবতার উল্লেখ দেখা যায়[৬৩]

কিন্তু যাঁহারা ভাগবতধর্মের বৈদিকতায় সন্দিহান, তাঁহারা এই সকল যুক্তি মানেন না। তাঁহারা বলেন, ভক্তি কথাটির অর্থ, আরাধ্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাসমন্বিত গাঢ় প্রেমের অনুভব। এই অর্থে ভক্তিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান:—প্রথমতঃ অধ্যাত্মক-সত্তাবিশিষ্ট একমাত্র আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তের আস্তিক্য বুদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস। এই মঙ্গলময় দেবতার অসীম ইচ্ছা ও শক্তি সর্বদাই পাপনাশক ও অমঙ্গলনাশক, তৃতীয়তঃ ঈশ্বরানুগ্রহ ও ভক্তের বন্ধন, তাহা মূলতঃ ধর্মনীতিরই বন্ধন। বৈদিক বহুদেবতাবাদে বিশ্বাস এবং যজ্ঞকর্মের পদ্ধতি ভক্তির এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রসারের প্রতিকূল ছিল। তাঁহাদের মতে বেদে যে 'ভক্তি' বা 'পূজা'র ভাবের বিশেষ স্থান ছিল না, তাহা প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে ভক্তি, পূজা বা তাহার সমার্থক শব্দের অনুল্লেখ হইতেই প্রমাণিত হয়। ভক্তি কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে[৬৪] এবং এই উপনিষদটি-যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী, তাহা এই গ্রন্থে সাংখ্য ও যোগদর্শনের পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগ হইতেই প্রতিপন্ন হয়।[৬৫]

ঋগ্বেদে বরুণের স্তবে ভক্তির সমস্ত লক্ষণই সুস্পষ্ট বলিয়া পূর্বপক্ষ যে-যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে ইঁহারা বলেন, বরুণের স্তবে ভক্তির লক্ষণ কিছুটা প্রকাশ পাইলেও ভাগবতধর্মের পূর্ণ ভক্তিবাদের সম্যক্ পরিচয় ইহাতে নাই। কারণ, "যে দেবতারা অশরীরী ও সূক্ষ্ম, এমন কি বিগ্রহরূপেও যাঁহারা দৃশ্যমান নহেন, সেই বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে প্রকৃত ভক্তি কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?"[৬৬]

ইঁহাদের মতে ভক্তিবাদের উদ্ভব আদিম আর্যেতর জাতির মধ্যে। ইঁহারা বলেন, "ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি সাধারণতঃ কোন বৈদিক দেবতাবিশেষকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। শিব ও যক্ষনাগাদি লৌকিক দেবতাগোষ্ঠী এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতাগণকে কেন্দ্র করিয়াই এই সকল উপাসকমণ্ডলী ক্রমশঃ গঠিত হয়।" ইহার প্রমাণস্বরূপ ইঁহারা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকে রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'নিদ্দেসে' তৎকালীন একশ্রেণীর ভারতীয়দের পূজাপার্বণের যে-তালিকা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৬৭]

বেদে একেশ্বরবাদের অস্তিত্বের প্রসঙ্গে ইঁহারা বলেন, বৈদিক সূক্তদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে দেবতাগণের সংখ্যা সম্বন্ধে-যে মতভেদ ছিল, তাহা বৈদিক আচার্যগণের মধ্যে নৈরুক্ত, যাজ্ঞিক ও আত্মবিদ্ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যায়।

ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে একদেবত্ববাদের কথা থাকিলেও ইঁহাদের মতে তাহার মূলেও আর্যেতর দ্রাবিড়জাতির প্রভাব ছিল। ইঁহারা বলেন, বৈদিক ঋষিরা বরুণের উদ্দেশ্যে যে-ভক্তিগাথা রচনা করেন, দশম মণ্ডলে বহুদেবতার পরিবর্তে যে এক পুরুষোত্তমের কথা বলা হইয়াছে—সে সমস্তই দ্রাবিড়-চিন্তা-প্রভাবিত আর্যদের অথবা বৈদিক ভাষায় অভিজ্ঞ দ্রাবিড়দের সৃষ্টি। কারণ, ঋগ্বেদ শেষবারের মত সংকলিত হইবার পূর্বেই আর্য সমাজে ও সভ্যতায় দ্রাবিড় প্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে।[৬৮]

ভাগবতধর্মের অবৈদিকতা প্রতিপাদনে ইঁহারা আর যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইল—বাসুদেবের উদ্দেশ্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং তাহাতে তাঁহার বিগ্রহ স্থাপনপূর্বক উপাসনা। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে এই জাতীয় উপাসনাপদ্ধতি অবৈদিক সভ্যতারই ফল। ভাগবতধর্মে বাসুদেবের সৃজনীশক্তি যে লক্ষ্মী ও শ্রীরূপে কল্পিত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই কল্পনাও অবৈদিক সভ্যতার পরিণতি। কারণ কয়েকটি স্ত্রীদেবতার উল্লেখ থাকিলেও এইরূপ কল্পনা বেদে নাই।[৬৯]

পঞ্চরাত্রের বৈদিকতা বিচার

এখন প্রশ্ন, পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা কি নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত? পুরাণ ও সংহিতাসমূহের সাক্ষ্য হইতে অন্ততঃ তাহা মনে হয় না। কূর্ম, সাম্ব, বৃহন্নারদীয়, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ এবং বশিষ্ঠ, সূত, বিষ্ণু, শতপথ ও হারীতসংহিতা প্রভৃতির মতে পাঞ্চরাত্রিকগণ 'সর্বধর্ম বহিষ্কৃত', 'অভিশপ্ত সম্প্রদায়', তাহাদের সহিত বাক্যালাপেও 'রৌরব নরক' ভোগ করিতে হয়। অপর পক্ষে বিষ্ণু, ভাগবত, পদ্ম এবং বরাহপুরাণে পাঞ্চরাত্রমতের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখা যায় না। এই পুরাণগুলিতে পাঞ্চরাত্রমতের প্রতি বিশেষ অনুরাগই প্রকাশ পাইয়াছে।[৭০]

মধ্যযুগের দার্শনিকদের মধ্যেও পঞ্চরাত্রের বৈদিকতা সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে [২।২।৪২-৪৫] পঞ্চরাত্রমতের প্রসিদ্ধ চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বের অবৈদিকতা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শাণ্ডিল্য বেদে মানবের পরম শ্রেয়ের সন্ধান না পাইয়া পঞ্চরাত্রমতের প্রবর্তন করেন।[৭১] কুমারিলও তাঁহার তন্ত্রবার্তিকে পঞ্চরাত্রকে বৌদ্ধ, যোগ, সাংখ্য, পাশুপত প্রভৃতি মতের ন্যায় বেদবিরোধী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অপর পক্ষে যামুনাচার্য তাঁহার 'আগমপ্রামাণ্যে' এবং আচার্য রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে নানা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে পঞ্চরাত্রের বৈদিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

যামুনাচার্য তাঁহার 'আগমপ্রামাণ্যে' পাঞ্চরাত্রাগমের বিরুদ্ধে প্রতি-পক্ষের আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, মহাভারতে ও ভাগবতে বাদরায়ণ এবং ভৃগু, ভরদ্বাজ প্রভৃতি সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এই শাস্ত্রের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন; মহাভারতে পঞ্চরাত্রশাস্ত্র 'সাত্বতবিধি' বলিয়া উল্লিখিত; কিন্তু সাত্বত কোন জাতির নাম নহে, সাত্বত অর্থ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ভক্তসম্প্রদায়; পঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে বেদ-নিন্দিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, কিন্তু এই অভিযোগ সত্য নহে, কারণ অন্যতম প্রামাণ্য পঞ্চরাত্র গ্রন্থ 'পাদ্মতন্ত্রে' পঞ্চরাত্রশাস্ত্র 'শ্রুতিমূল' এবং বেদের ন্যায় প্রামাণ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—'শ্রুতিমূলম্ ইদং তন্ত্রং প্রমাণং কল্প-সূত্রবৎ।'[৭২]

পুরাণ, সংহিতা এবং মধ্যযুগের দার্শনিকদের বিতর্ক হইতে পঞ্চরাত্রের বৈদিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া খুবই কঠিন। তবে আধুনিক যুগের দুই জন মনীষী এ সম্বন্ধে যে-সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্বাচার্যদের মতবিরোধের কারণ এবং এই শাস্ত্রের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। Colebrooke বলিয়াছেন, বেদের সহিত পঞ্চরাত্রের কতকগুলি বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকিলেও প্রধান কতকগুলি বিষয়ে গুরুতর বিরোধ দেখা যায়।[৭৩] আর ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন—পঞ্চরাত্রকে বৈদিক বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, এই মত বৈদিক বলিয়া গৃহীত হইতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল।[৭৪]

ভাগবতধর্মে খৃষ্টধর্মের প্রভাব

এই প্রসঙ্গে আরও একটি মত আলোচ্য। এই মতে ভাগবত-ধর্ম বৈদিক নহে, অবৈদিকও নহে, উহা খৃষ্টধর্মের প্রভাবজাত। এই মতের প্রবক্তা Weber। তাঁহার মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতকে ভারতীয় ভক্ত ও পর্যটকগণ মিশর অথবা সিরিয়ায় গিয়া খৃষ্টধর্মের সহিত পরিচিত হন এবং দেশে ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ঐকান্তিক ভক্তিমূলক ভাগবতধর্মের প্রবর্তন করেন।

তিনি তাঁহার এই অভিমতের সমর্থনে চারটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন :

১। ভাগবতধর্মে শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র দেবতাজ্ঞানে ভক্তিমূলক উপাসনার যে বিশেষ রীতি প্রবর্তিত হয়, তাহা ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। ইহা পরবর্তী কালের বহিরাগত প্রভাবেরই ফল।

২। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ মানব কিন্তু মহাভারতের শেষভাগে তিনি অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন দেবতা। এই ক্রমবিবর্তন, মানব হইতে দেবতার স্তরে উত্তরণ, বহিরাগত প্রভাব ব্যতীত অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৩। মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়ে নারদের শ্বেতদ্বীপ গমনের যে-কাহিনী আছে, তাহা হইতে ভাগবতধর্ম-যে খৃষ্টধর্মের প্রভাবজাত তাহা প্রমাণিত হয়। নারদপঞ্চরাত্রের বিবরণ হইতেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

৪। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, জন্মাষ্টমী উৎসব এবং তাঁহার গোকুললীলার অনেক কাহিনীর সহিত খৃষ্টের জীবন-কাহিনীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়।

Weber-এর চতুর্থ যুক্তি ইতঃপূর্বে গোপালকৃষ্ণের উদ্ভব প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার অপর যুক্তিগুলি আলোচনা করা হইতেছে। তাঁহার প্রধান যুক্তি যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, ভক্তি ও একান্তিকবাদ যে ভারতেরই নিজস্ব, খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই যে উহা ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা বেদ, উপনিষদ্ এবং পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রভৃতি খৃষ্টপূর্ব যুগের গ্রন্থকারদের রচনা হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ভাণ্ডারকর, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের মানব শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতে দেবতায় পরিণতিলাভ বহিঃপ্রভাব ব্যতীত অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না বলিয়া Weber যে-অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বিচারসহ

নহে। কারণ, বীর মানবের চরিত্রে অসাধারণ গুণাবলীর প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে ঐশীশক্তির অবতাররূপে কল্পনা আদৌ অস্বাভাবিক নহে; ইহার জন্য বহিঃপ্রভাবের কল্পনা নিরর্থক। পার্শ্বনাথ ও গৌতম বুদ্ধের দেবতার স্তরে উত্তরণের মূলে যেমন কোনরূপ বহিঃপ্রভাব নাই, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তেমনই কোন বহিঃপ্রভাবের কল্পনা অর্থহীন।

নারদের শ্বেতদ্বীপে গমনের কাহিনীতে ভাগবতধর্মের উপর খৃষ্টধর্মের প্রভাব প্রমাণিত, Weber-এর এই অভিমতও ভাণ্ডারকর ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ খণ্ডন করিয়াছেন। ভাণ্ডারকরের মতে এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ইহা নিঃসন্দেহে কাল্পনিক। তাঁহার মতে, কৈলাস যেমন শিবের, বৈকুণ্ঠ যেমন বিষ্ণুর কাল্পনিক আবাসস্থল, শ্বেতদ্বীপও তেমনই নারায়ণের কাল্পনিক অবস্থানভূমি। সুতরাং শ্বেতদ্বীপকে শ্বেতজাতি-অধ্যুষিত খৃষ্টধর্ম-প্রভাবিত দেশ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।[৭৫]

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁহার Comparative Studies in Vaisnavism and Christianity গ্রন্থে Weber-এর এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। তবে নারদের শ্বেতদ্বীপ-গমনের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার মতে, মিশর অথবা এশিয়া মাইনরের খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভারতীয় ভাগবত-ধর্মাবলম্বীদের যোগাযোগের ফলে ভারতীয় ধর্মমত কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তি ও একান্তিকবাদ ভারতে পূর্বে ছিল না, ভারতীয়গণ খৃষ্টধর্ম হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ভাগবতধর্ম নামে প্রচার করেন—Weber-এর এই সিদ্ধান্ত আচার্য শীল স্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভাগবত-ধর্মের প্রতিটি বিশেষত্ব ভারতীয়। এ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা-শেষে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"The evidence I have put forward appears to

me of such a startling character that I believe, it will be considered to be decisive, of an actual historical contact between the two cults in the 4th or 5th century of the Christian era. At the same time I have sought to show that Vaisnavism has developed on lines of its own viz. on the basis of a half-philosophical half-mythological synthesis of the Samkhya and Vedanta systems........I have also shown that the Christian experiences of the Indian Vaisnavas served to liberalise and universalise their faith........But at the same time the history of doctrine, general as well as particular, must have shown that not a single dogma or rite was derived by the Indian Vaisnavas from primitive Christianity."[৭৬]

এই প্রসঙ্গে Grierson-এর মতও আলোচ্য। তিনি একটি প্রবন্ধে ভাগবতধর্মের উপর খৃষ্টধর্মের প্রভাবের কথা বলিয়াছেন।[৭৭] তবে Weber-এর সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার সর্বাংশে মিল নাই; তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে: ভক্তি ও একান্তিকবাদ ভারতীয় ধর্মসাধনায় খৃষ্টপূর্ব যুগ হইতেই পরিলক্ষিত হয়, ইহা খৃষ্টান প্রভাবের ফল নহে। তবে তাঁহার মতে, খৃষ্টোত্তর যুগের ভাগবতধর্মে খৃষ্টধর্মের প্রভাব পড়িয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বহু খৃষ্টধর্মাবলম্বী মালাবার উপকূলে বসতি স্থাপন করেন। ইহাদের ধর্মবিশ্বাস রামানুজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাগবতধর্মের আচার্যদের প্রভাবিত করে।[৭৮]

Grierson-এর বহু পূর্বে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত নারদপঞ্চরাত্রের ভূমিকায় আচার্য রামানুজের ধর্মমতের উপর মালাবার উপকূলের খৃষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করেন।[৭৯]

ইহাদের এই অনুমান সত্য নহে। দক্ষিণ ভারতে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণ যে-সময়ই আসুন না কেন, রামানুজের ধর্মমত-যে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, তাঁহার ধর্মমত-যে দক্ষিণ ভারতীয় আলোয়ার সাধকদের দ্বারা প্রভাবিত, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ আছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে।

অতএব এই আলোচনার শেষে বলা যাইতে পারে যে, ভাগবত-ধর্ম খৃষ্টধর্মের প্রভাবজাত তো নহেই, এমন কি আদিতে বৈদিকধর্মের সহিতও ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না; বেদবিরোধী সমাজের ধর্মরূপেই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল।

ভাগবতধর্মের বৈদিকীকরণ

তবে পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ-সমাজের স্বীকৃতিলাভের ফলে এই ধর্ম বৈদিকধর্মের অঙ্গীভূত হয়। এই স্বীকৃতির একটি ইতিহাস আছে। বেদবিরোধী নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় রাজশক্তির আনুকূল্যে প্রবল হইয়া উঠিলে বৈদিকধর্ম চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। বৌদ্ধধর্মের সহিত এই জীবনমরণ সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বৈদিক সম্প্রদায় ভাগবতধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধস্থাপন ও সামঞ্জস্যবিধানে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে এবং নারায়ণ-বিষ্ণুর সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়।

এই সমন্বয়ের চেষ্টা কখন হইতে আরম্ভ হয় এবং বিষ্ণুর সঙ্গেই বা সমন্বয় কেন ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচনার পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু ও নারায়ণের স্থান সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু ও নারায়ণ

সমগ্র ঋগ্বেদে অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণু প্রায় একশতবার উল্লিখিত হইলেও কেবল বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া সূক্তের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি।[৮০] বৈদিক বিষ্ণু স্বর্গের প্রধান দেবতা সূর্যের প্রকারভেদ।[৮১] এই সূর্য ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ণিত হইয়াছেন। সূর্য ও সবিতা ব্যতীত মিত্র, পূষন্, ভগ, বিবস্বৎ, দক্ষ, মার্তণ্ড, ধাতা, বিষ্ণু ইত্যাদি নামেও তিনি উল্লিখিত। সুতরাং

বিষ্ণু-যে মুখ্যতঃ সূর্যের অন্যতম প্রকাশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে ও অন্যান্য বেদে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, উরুক্রম, উরুগায় রূপেও উল্লিখিত। শেষোক্ত শব্দ দুইটির অর্থ 'যিনি বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল'। আর ত্রিবিক্রম শব্দটির অর্থ 'যিনি ত্রিপাদবিক্ষেপে জগৎ পরিভ্রমণ করেন'। তাঁহার দুই পদ মনুষ্যদৃষ্টির গোচর কিন্তু তৃতীয় পদ (পরমপদ) মনুষ্যদৃষ্টির বহির্ভূত। এই পরমপদ মধুময়, দেবতাদের আনন্দ-নিকেতন।[৮২] ঋগ্বেদে বিষ্ণু ঋতগর্ভ অর্থাৎ নৈতিক শৃঙ্খলা অথবা যজ্ঞের বীজস্বরূপ, সমরক্ষেত্রের নেতা, ইন্দ্রের সহিত একযোগে বিশ্বের প্রভুরূপেও উল্লিখিত। তাঁহার মহত্ত্ব ধারণাতীত এবং তিনি শিপিবিষ্ট অর্থাৎ রশ্মিজালে আবৃত বলিয়া পূজিত।[৮৩] এই সকল বর্ণনা হইতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, ঋগ্বেদের যুগেও বিষ্ণু একজন বিশিষ্ট দেবতারূপে পরিগণিত হন। কিন্তু বিশিষ্ট দেবতা হইলেও বিষ্ণু ঋগ্বেদে পরম দেবতা নহেন। তবে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাহার গুরুত্ব ও মহিমা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অসুরদের কবল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়া তিনি যে দেব ও মানবকুলের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।[৮৪] ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভেই বিষ্ণুকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ঘোষণা করা হয়।[৮৫]

ঋগ্বেদে বিষ্ণু গোপা, শিপিবিষ্ট, উরুক্রম প্রভৃতি বলিয়া উল্লিখিত হইলেও নারায়ণ রূপে কখনও অভিহিত হন নাই। নারায়ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে।[৮৬] কিন্তু এখানে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই সর্বপ্রথম নারায়ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত। বিষ্ণু কি করিয়া নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন হইলেন, তাহার ঐতিহাসিক সূত্রটি তেমন স্পষ্ট নহে।

বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু ও নারায়ণের স্বরূপ আলোচনার পর নারায়ণ-বিষ্ণুর সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের সমন্বয়ের প্রশ্ন আলোচনা করা যাইতে পারে।

নারায়ণ-বিষ্ণুর সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের সমন্বয় ঠিক কখন হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন, তবে ইঁহাদের সমন্বয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে[৮৭] পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যে-অংশে বিষ্ণু ও বাসুদেবের একত্র উল্লেখ দেখা যায়, তাহাকে অনেকে পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া মনে করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহাকে খৃষ্টাব্দের প্রথম দিক্‌কার রচনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু Keith ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে ইহার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক। তবে মহাভারত শেষবারের মত সংকলিত হইবার পর যে নারায়ণ-বিষ্ণুর সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের সমন্বয় সর্বতোভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।[৮৮] সমুদ্রগুপ্ত (৩২৬—৩৭৫ খৃষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫—৪১৩ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালের মধ্যেই মহাভারতের কাহিনী শেষবারের মত সংকলিত ও সম্পাদিত হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। সুতরাং বলা যাইতে পারে, মৌর্যযুগে বিষ্ণু-কৃষ্ণের সমন্বয়ের উদ্যোগ আরম্ভ হয় এবং গুপ্তযুগে তাহা সার্থক পরিণতি লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, বেদে দেবতা বহু; বাসুদেব-কৃষ্ণের সহিত সমন্বয় সাধনের জন্য বহুসংখ্যক বৈদিক দেবতার মধ্যে বিষ্ণুকে নির্বাচন করা হইল কেন? এ সম্বন্ধে ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ একাধিক কারণ অনুমান করিয়াছেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর জনগণের ত্রাণকর্তা বন্ধুরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কাহারও মতে বিষ্ণুর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁহার সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের সমন্বয় সাধিত হয়। আবার কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস ছিলেন সূর্যের উপাসক। কৃষ্ণ সূর্য-উপাসক বলিয়াই বিষ্ণুর সহিত তাঁহার সমন্বয় ঘটে, কারণ বৈদিক বিষ্ণু সূর্যেরই প্রকারভেদ।[৮৯] কিন্তু ভাগবত-ধর্মের সহিত সূর্য-উপাসনার সম্পর্ক নিঃসংশয়ে প্রমাণিত

হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ এই অভিমতের বিরোধিতা করেন।[২০]

বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণের সমন্বয়ের কারণ যাহাই হউক, ইহা নিঃসন্দেহে ভাগবতধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। কারণ এই ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণভাবে বৈদিক ও ভাগবত সম্প্রদায়ের আগ্রহ থাকিলেও উভয়কেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল। বৈদিক সম্প্রদায়কে অবৈদিক ভাগবতধর্মের উপাস্যদেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বৈদিক দেবতামণ্ডলীতে স্থান দিতে হইল এবং ক্ষত্রিয় সমাজের একেশ্বর-বাদকে স্বীকার করিতে হইল। ইহাতে ভাগবতধর্মের জয় হইল বটে, কিন্তু বৈদিক সম্প্রদায় কৃষ্ণকে পরমপুরুষ বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করার ফলে কৃষ্ণপ্রবর্তিত ভাগবতধর্ম বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত হইতে লাগিল, ভাগবতধর্মের একমাত্র উপাস্য দেবতা কৃষ্ণের অদ্বিতীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ভাগবতধর্মের ব্যূহপূজার পরিবর্তে অবতার-পূজা এই রূপান্তরিত ধর্মের অন্যতম লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইল।[২১]

ভাগবতধর্ম কিরূপে বৈদিকধর্মের অঙ্গীভূত হয় এই প্রসঙ্গ আলোচনার পর এই ধর্ম কিরূপে আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে প্রসার লাভ করে এবং পরবর্তী কালে তাহার কি প্রকার রূপান্তর ঘটে, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

উত্তর ভারতে ভাগবতধর্ম

ভাগবতধর্ম খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্ব হইতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে আর্যাবর্তে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের বিবরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং ঘোষুণ্ডি ও বেসনগর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে জানা যায়। এই সকল নিদর্শনের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরবর্তী তিন চার শতাব্দীর ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। মৌর্য

সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন শক ও কুষাণ নরপতিগণ। ইহারা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ অথবা শৈব ছিলেন। এই কারণেই এই যুগে মথুরা অঞ্চলে ভাগবতধর্মের প্রতিপত্তি বিশেষভাবে হ্রাস পায়। শক ও কুষাণ আমলের যে-সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই অঞ্চল হইতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভাগবতধর্মের উপর আলোকপাত করে এমন নিদর্শন খুবই কম।

কিন্তু গুপ্তসম্রাটদের সময় হইতে পুনরায় ভাগবতধর্মের সমৃদ্ধি সূচিত হইতে থাকে। গুপ্তযুগ ভাগবতধর্মের স্বর্ণযুগ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ধর্মমত কি ছিল, তাহা সঠিকভাবে জানা না গেলেও সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত এবং পরবর্তী সম্রাটগণের অনেকেই-যে ভাগবতধর্মাবলম্বী অথবা এই ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহাদের মুদ্রা ও শিলালেখ হইতে জানা যায়। ইহাদের আনুকূল্যেই ভাগবতধর্ম এই যুগে পাঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে এবং মগধে বিশেষ প্রসার লাভ করে। গুপ্তযুগে ভাগবতধর্ম কিরূপ বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল, তাহা এই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রাচুর্য হইতে বুঝা যায়। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ভাগবতধর্মের ইতিহাস আলোচনায় যথার্থই বলিয়াছেন, “The Guptas did for Bhagavatism what Asoke had done for Buddhism.”

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর পুনরায় উত্তর ভারতে ভাগবতধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। কারণ পরবর্তী যুগের রাজারা ভাগবতধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তবে গুপ্তযুগের প্রাধান্য হ্রাস পাইলেও ভাগবতধর্ম উত্তর ভারতে যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই, তাহা বরাহমিহিরের ‘বৃহৎসংহিতা’ এবং বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ হইতে প্রতীয়মান হয়।[১২]

দাক্ষিণাত্যে ভাগবতধর্ম

গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ভাগবতধর্ম উত্তর ভারতে একেবারে লোপ

না পাইলেও এই যুগে উত্তর ও মধ্যভারত অপেক্ষা তামিল দেশেই এই ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। ইহার মূলে একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। তাহা আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তামিল দেশে ভাগবতধর্মের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে খোদিত নানাঘাট গুহার শিলালেখের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব যুগেই দাক্ষিণাত্যে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব পূজার পাত্র ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ধ্রদেশে-যে ভাগবতধর্মের প্রচলন ছিল, তাহা সাতবাহন নরপতি যজ্ঞ শাতকর্ণীর একটি লেখ হইতে প্রমাণিত হয়। এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ব্যতীত প্রাচীন তামিল সাহিত্য, মূর্তি ও মন্দির প্রভৃতি হইতেও দাক্ষিণাত্যে ভাগবতধর্মের প্রচলনের কথা জানা যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত 'চিলপ্পধিকাবম্' নামক সুপ্রসিদ্ধ আখ্যানকাব্যের একটি সর্গে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণকাহিনীর কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই কাব্য ও অন্যান্য প্রাচীন তামিল কাব্য হইতে মাদুরা ও অন্যান্য নগরে কৃষ্ণ-বলরামের মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই সকল নিদর্শন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভাগবতধর্ম খৃষ্টপূর্ব যুগেই দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণ তামিলনাদের প্রাচীন অধিবাসীদের নিকট খৃষ্টযুগের সূচনা হইতেই দেবতারূপে পূজিত হইতে থাকেন।[১৩]

তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, ভাগবতধর্ম খৃষ্টপূর্ব যুগে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেও পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ইহার প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ। পঞ্চম শতাব্দীর পর অবৈদিক নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিহত করিবার জন্য শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম-সংগঠনরূপে ভক্তিধর্ম প্রচারে ব্রতী হন।[১৪]

দাক্ষিণাত্যে এই শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তসম্প্রদায় যথাক্রমে নায়ন্‌মার বা নায়নার এবং আড়্‌বার বা আলোয়ার নামে পরিচিত। এই আলোয়ার ভক্তসম্প্রদায়ের সাধনাতেই

পঞ্চম শতাব্দীর পর দাক্ষিণাত্যে ভাগবতধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে।

আলোয়ার সম্প্রদায়ের সাধনবৈশিষ্ট্য

আলোয়ার অর্থ ভগবৎ-প্রেমে নিমগ্ন ব্যক্তি। আলোয়ার সাধকগণের সংখ্যা বারো। ইহাদের নাম হইতেছে পোয়্‌গৈ, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশৈ, নম্মাড়্‌বার, মধুরকবি, কুলশেখর, পেরিয়াড়্‌বার, অণ্ডাল [মহিলা], তোণ্ডারিপূড়ি, তিরুপ্‌পান্‌ ও তিরুমঙ্গই। ব্রাহ্মণ হইতে চতুর্বর্ণ-বহির্ভূত অস্পৃশ্য পর্যন্ত বিভিন্ন কুলে ইহারা আবির্ভূত হন। ইহাদের কেহ ছিলেন রাজা, কেহ ভূস্বামী, কেহ বা নিতান্তই দরিদ্র। ইহাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তবে, মোটামুটি বলা যায়, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে অষ্টম-নবম শতকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহাদের আবির্ভাব ঘটে। ইহারা সকলেই ছিলেন একান্ত-ভাবে বৈষ্ণব। বিষ্ণু ও তাঁহার বিভব-অবতার ত্রিবিক্রম, রাম, কৃষ্ণ, বামন, নৃসিংহ প্রভৃতি ছিলেন ইহাদের উপাস্য। বিগ্রহ ও তীর্থস্থানের প্রতি ছিল ইহাদের বিশেষ নিষ্ঠা। ইহারা কখনও আরাধ্য দেবতার ঐশ্বর্যে, কখনও বা মাধুর্যরসে বিভোর হইয়া থাকিতেন। মাধুর্যরসের সাধনায় তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত হইত। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও নায়িকাভাবের অভিব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে দেখা গেলেও তাঁহারা ছিলেন প্রধানতঃ দাস্য ও নায়িকাভাবের সাধক। নায়িকাদশায় ইহাদের মধ্যে কখনও স্বকীয়া, কখনও পরকীয়া ভাব প্রকাশ পাইত। ভগবানের সহিত মিলনের আনন্দে ইহারা কখনও হাসিতেন, নৃত্য করিতেন, গান করিতেন, আবার বিরহবেদনায় কখনও বা কাঁদিতেন, প্রেমরোষে আক্রোশভরে অভিশাপ দিতেন। তাঁহাদের এই চিত্তদীর্ণ আবেগ যখন হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না, তখনই তাহা গীতি-কাব্যের আকারে স্বতঃস্ফূর্ত হইত। আলোয়ার সাধকগণের ভাবের আবেগে রচিত এই সকল পদ বিচ্ছিন্নভাবে 'তামিলপাণ্ডর' বা

'গীতি' নামে খ্যাত। বিভিন্ন ভাব ও বিষয় অবলম্বনে রচিত এক একজন আলোয়ারের এই জাতীয় পদের সমষ্টিই 'দিব্যপ্রবন্ধ' নামে অভিহিত। দ্বাদশ আলোয়ারের এইরূপ চব্বিশটি 'দিব্যপ্রবন্ধ' আছে। ইহা সর্বসমেত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন; এই দিব্যপ্রবন্ধাবলী সমবেতভাবে দ্রাবিড় বেদ নামেও প্রসিদ্ধ। এই প্রবন্ধাবলীতে আলোয়ার সাধকগণের বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদনুভব, প্রেমভক্তি ও ভজনধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আলোয়ার সাধকদের ভজনধারায় সংকীর্তন একটি প্রধান অঙ্গ। বঙ্গদেশের কীর্তন-পদাবলীর ভাব, সুর ও তালের সহিত আলোয়ার পদাবলীর বহুস্থানে সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদের দিব্যসূক্তিতে মাধব, কেশব, গোবিন্দ, নারায়ণ প্রভৃতি নামকীর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৫]

দ্বাদশ আলোয়ারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নম্মাড়্‌বার বা শঠকোপ-সূরী। দিব্যপ্রবন্ধের চার হাজার পদের মধ্যে ১২৯৬টি পদ তাঁহার রচনা। তাঁহার সংকলিত পদাবলী চার ভাগে বিভক্ত। ইঁহার মধ্যে তিরুবাযমোড়ি বা শ্রীমুখবাণী সর্বশ্রেষ্ঠ। তিরুবায়মোড়ি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্তম্ভস্বরূপ। আচার্য রামানুজ প্রধানতঃ ইঁহার ভিত্তিতেই বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করেন। নম্মাড়্‌বার ভগবানকে প্রেমিক নায়করূপে কল্পনা করিয়া মধুরভাবে সাধনা করিতেন।

নম্মাড়্‌বারের পর উল্লেখযোগ্য মহিলা আলোয়ার অণ্ডাল বা গোদাম্বাজী। তাঁহার পদ-সংগ্রহ তিরুপ্‌পাবৈ ও নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি। নাচ্চিয়ার তিরুমোড়িতে কবি নিজে নায়িকা, নায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ-প্রণয়িনী অণ্ডালের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চমৎকার রসরূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমবিভোরতা স্বতঃই মীরাবাঈর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইজন্যই হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহাকে 'দক্ষিণ ভারতের মীরাবাঈ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ভাগবতে আলোয়ার প্রভাব

আলোয়ার সাধকগণ-সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইঁহাদের সাধনাতেই দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। ভাগবত পুরাণেও এই সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য মিলিবে। এই পুরাণের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ৩৮-৪০ শ্লোকে বলা হইয়াছে—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের মনুষ্যগণ কলি-যুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন; কারণ, কলিযুগে অনেক বিষ্ণুভক্তের আবির্ভাব ঘটিবে। দ্রাবিড় দেশ তাঁহাদের জন্মলাভে ধন্য হইবে; অন্যত্র তাঁহাদের সংখ্যা বেশি হইবে না। তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী ও পশ্চিম মহানদী—এই সকল নদীর জল পান করিয়া সেখানকার অধিবাসিগণ ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবেন।

ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, ভাগবতকার এই কয়টি শ্লোকে নিঃসন্দেহে দ্বাদশ জন আলোয়ার সাধকেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কারণ তাম্রপর্ণী, কৃতমালা প্রভৃতি যে-সকল নদী এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদেরই তীরে এই আলোয়ার সাধকগণ জন্মগ্রহণ করেন।

একাদশ স্কন্ধের পূর্বোদ্ধৃত তিনটি শ্লোক ছাড়াও অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের বিশ সংখ্যক শ্লোকেও ভাগবতকার দক্ষিণ ভারতের এই সাধকগণের সাধন-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই শ্লোকটির অর্থ হইতেছে—ভগবানের শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ অন্য কিছুই কামনা করেন না। তাঁহারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া অতি বিচিত্র মঙ্গলময় চরিতকথা কীর্তন করেন।

এখানে ভক্তের যে-সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই নিঃসন্দেহে আলোয়ার-সাধনার বিশেষত্ব।

আলোয়ার সাধকগণের এই ভাবাবেগপূর্ণ একান্ত-তন্ময় নিষ্কাম সাধনাই পরবর্তী কালে ভাগবত পুরাণের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতে প্রসার লাভ করিয়া বৈষ্ণব ভক্তিসাধনার ইতিহাসে এক নূতন

অধ্যায়ের সূচনা করে। ভাগবতের রচনাকাল ও স্থান সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা সম্ভব না হইলেও একথা সত্য যে, ভগবদ্‌-গীতার ভক্তিবাদ হইতে ভাগবত পুরাণের ভক্তিবাদ স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হইয়াছে। ভগবদ্‌গীতার যুগে প্রাচীনতর ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধীর, প্রশান্ত ও মহিমান্বিত ভক্তিসাধনা প্রচলিত ছিল, তাহা ভাগবতের যুগে নৃত্যগীতপ্রধান ভাবাবেগপূর্ণ ভক্তিতে পরিণতি লাভ করে।[১৬] ভাগবতের ভক্তিবাদে এই পরিবর্তন-যে আলোযার সাধকদের ভক্তিবাদেরই প্রভাবের ফল, তাহা তৃতীয় স্কন্ধের কপিল-দেবহূতি সংবাদ-বিষয়ক অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে। মাতার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি কপিল সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির স্বরূপ তিনটি শ্লোকে[১৭] এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ-মাত্র সমুদ্রের অভিমুখে প্রবহমান গঙ্গাজলের ন্যায় নিষ্কাম ভক্তের পরাভক্তি তাঁহার শ্রীচরণ অভিমুখে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই ভক্তগণের পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং ইহা কোন কিছুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না। এই নিঃশ্রেয়স ভক্তি এইরূপ কামনাহীন যে, এই সকল ভক্তকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও তাঁহারা ভগবানের সেবাকার্য ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।

ঋষি কপিল এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির যে-লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে আলোয়ার-সাধকগণের ভক্তিরই বিশেষত্ব। এই কারণেই কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভাগবতের রচয়িতার পরিচয় সঠিক ভাবে জানা না গেলেও তিনি যে আলোয়ার-সাধনার পরিবেশে বর্ধিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।[১৮]

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আলোয়ার প্রভাব

আলোয়ার-সাধনার প্রভাব কেবল ভাগবত পুরাণের ভক্তিবাদে নহে, শ্রীবৈষ্ণব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরেও পড়িয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত, সাধন-ভজন, অনুভব ও আচার-অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি দুইটি—আচার্য রামানুজ-রচিত শ্রীভাষ্য ও আলোয়ার-গণের দিব্যপ্রবন্ধাবলী। এই কারণেই শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় 'আড়্বার সম্প্রদায়' নামেও পরিচিত।[৯৯]

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও-যে আলোয়ার-সাধক-সম্প্রদায়ের নিকট বহু বিষয়ে ঋণী, তাহা তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুখ্যতঃ পরকীয়া ভাবের এবং আলোয়ারগণ মুখ্যতঃ স্বকীয়া ভাবের সাধক হইলেও উভয়ক্ষেত্রেই আর্তি, ব্যাকুলতা ও উন্মাদনার ভাব প্রায় একরূপ। এমন কি, উভয় সম্প্রদায়ের রস-শাস্ত্রেই নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনায় একই পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে রাধাভাব অপেক্ষা সখীভাবের অধিকতর প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও স্বয়ং চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-কামনায় নায়িকাভাবে (রাধাভাবে) আবিষ্ট থাকিতেন। তামিল বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধা[১০০] নাই বটে কিন্তু তাঁহাদের রচনায় নায়ক-নায়িকা ভাবটি সুপরিস্ফুট। বারোজন আলোয়ারের মধ্যে মহিলা আলোয়ার অণ্ডালের সমস্ত ভাবনাই নায়িকাভাবের। পুরুষ আলোয়ারদের মধ্যে নম্মাড়্বার, কুলশেখর ও তিরুমঙ্গই-এর ভাবনাও বহুস্থলে নায়িকাভাবাপন্ন। এইজন্যই শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তাঁহারা নায়িকা নামে অভিহিত।[১০১]

আলোয়ার ও নায়ন্মার সম্প্রদায়ের ভক্তিসাধনায় তামিলনাদে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইল বটে কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই আবির্ভূত হন অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য। তিনি যেভাবে বেদান্তের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন, তাহাতে অনেকেই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মনে করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। আচার্য শঙ্কর তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দুর্ধর্ষ যুক্তিতর্কের সাহায্যে তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠায় বহুলাংশে কৃতকার্য হন। তাঁহার এই সাফল্য ভক্তিবাদী

সাধনায় আর এক সঙ্কটের সৃষ্টি করিল। পরবর্তী বৈষ্ণব আচার্যগণ উপলব্ধি করিলেন যে, শঙ্করাচার্যের মত খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বেদান্তসূত্রেরই সাহায্য লইতে হইবে। সেইজন্য রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ বেদান্তসূত্রের নিজ নিজ ভাষ্যের সাহায্যে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া আপন আপন মতের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে যত্নবান হন।[১০২] ইহার ফলে আলোয়ার-সাধকদের যুগ শেষ হইয়া যায় এবং বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে আরম্ভ হয় আচার্যদের যুগ; কাব্যের পরিবর্তে রচিত হয় শাস্ত্র; গড়িয়া উঠে শ্রী, সনক, রুদ্র ও গৌড়ীয় প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং এই সকল সম্প্রদায়ের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম দাক্ষিণাত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়

মধ্যযুগের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সর্বাগ্রে ঘটে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নাথমুনি আচার্য শঙ্করের কিছুকাল পরে তামিল দেশে আবির্ভূত হন। আলোয়ার সাধকগণের, বিশেষতঃ নম্মাড়্বারের ভক্তিরসাত্মক দিব্যগীতিসমূহ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁহাদের ভাবাবেগপূর্ণ ভক্তিকে শ্রীবৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেও নাথমুনি সংস্কৃত ভাষায় 'ন্যায়তত্ত্ব' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের প্রবর্তন করেন। নাথমুনির পর এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচার্য তদীয় পৌত্র যামুনাচার্য। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'সিদ্ধিত্রয়', 'আগমপ্রামাণ্য' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই সকল রচনার সাহায্যে আচার্য শঙ্করের 'অবিদ্যা' মত খণ্ডন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার যুগপৎ অস্তিত্ব এবং প্রপত্তিবাদ বা শরণাগতির তত্ত্ব প্রচার করেন। যামুনাচার্যের তিরোধানের পর আচার্য রামানুজ শ্রীবৈষ্ণব

ধর্মের উন্নতি ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রীভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে তিনি আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনপূর্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং ভক্তিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই মতবাদ অনুশীলন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা মূলতঃ পাঞ্চরাত্রমতের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে ইষ্টদেবতার রূপ-কল্পনায় বৈদিক বিষ্ণু ও নারায়ণের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ; ইহাতে গোপীজনবল্লভ গোপালকৃষ্ণের কোন স্থান নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে নাথমুনি, যামুনাচার্য ও রামানুজের অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন—"The school founded by Nathamuni and raised to prominence by Yamunacarya was strengthened by the advent of Ramanuja—'the second founder of Vaisnavism' ··It is said by some historians that had there been no Philip there would have been no Alexander; it may perhaps be said with greater precision that had there been no Yamunacarya there would have been no Ramanuja".[১০৩]

শৈব চোল সম্রাটের কোপে পড়িয়া আচার্য রামানুজ শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি কর্ণাটকের তৎকালীন রাজধানী দেব-সমুদ্রে উপনীত হইয়া জৈনধর্মাবলম্বী নরপতি বল্লালরাজকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে কর্ণাটকে বৈষ্ণবধর্মের প্রচলন হইলেও তখনও সেখানে ছিল বীর শৈব সম্প্রদায়ের পূর্ণ আধিপত্য। কর্ণাটকে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসারের সহিত যাঁহার নিগূঢ় সম্পর্ক তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবগুরু মধ্বাচার্য। অনেক গ্রন্থে তিনি আনন্দতীর্থ নামেও

নিজের পরিচয় দিয়াছেন। মধ্বাচার্যের জন্মভূমি দক্ষিণ কানাড়া জেলায় উড়ুপির নিকটবর্তী পাজক গ্রাম।

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দ্বারা আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেন, মধ্বাচার্যও তেমনই দ্বৈতবাদের সাহায্যে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে যত্নবান হন। মধ্বাচার্য তাঁহার পূর্ববর্তী বৈষ্ণবদের সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া অদ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তাঁহার সমর্থন লাভ করে নাই। তিনি ভাগবত পুরাণের ভক্তির ভিত্তিতে তাঁহার মতবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বসমেত আটত্রিশখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য এবং ভাগবত-তাৎপর্য প্রধান। মাধ্বমত রামানুজের মত হইতে স্বতন্ত্র হইলেও মোক্ষ প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। মধ্বাচার্যের সম্প্রদায় ব্রহ্মসম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইহাদের ইষ্ট দেবতা শ্রীরমাপতি। অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় অপেক্ষা ইহাদের ধর্মানুষ্ঠানে ভাবপ্রবণতার স্থান অল্প। শ্রীরঙ্গম যেমন শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ, তেমনই উড়ুপি ইহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। মাধ্বমত দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিলেও উত্তর ভারতের পরবর্তী বৈষ্ণব আন্দোলনে মধ্বাচার্যের প্রভাব সামান্য নহে।

ইহার পর বৈষ্ণবধর্ম তামিলনাদ ও কর্ণাটকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রামানন্দ, কবীর, তুলসীদাস, নানক, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ, তুকারাম প্রভৃতির সাধনায় উত্তর ও পূর্ব ভারতে প্রসার লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্ম শৈব ও বৈষ্ণব সাধনার দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত আর তামিলনাদ অতিক্রম করিয়া এই ভক্তিধর্ম রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া বিস্তার লাভ করে।

এই যুগের শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মে আবার দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি ধারায় শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর, অপর ধারায় শ্রীকৃষ্ণ

ও শ্রীরাধার উপাসনা। প্রথম ধারার প্রবর্তক জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, তুকারাম প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সাধকগণ আর দ্বিতীয় ধারার প্রকাশ আচার্য নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী, বল্লভ ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি সম্প্রদায়-গুরুর সাধনায়।

বৈষ্ণবসাধনায় রাধাবাদের প্রবর্তক সনক-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নিম্বার্ক। তাহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও পণ্ডিতদের অনুমান তিনি আচার্য রামানুজের তিরোধানের কিছু কাল পরে বর্তমান কর্ণাটকে তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র ছিল ব্রজভূমি এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই তৎপ্রচারিত ধর্মে রাধাকৃষ্ণের আরাধনা প্রাধান্য লাভ করে। আচার্য নিম্বার্ক 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে ব্রহ্মসূত্রের এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য ও দশটি শ্লোক সম্বলিত 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে আচার্য নিম্বার্কের সিদ্ধান্তে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়।[১০৪] তবে একটি বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য লক্ষ্মী ও নারায়ণ কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাস্য শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা কেবল প্রিয়তমা গোপীই নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা।

রাধাকৃষ্ণ-উপাসনার অপর প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী। তিনি মহারাষ্ট্রীয় সাধক জ্ঞানেশ্বরের গুরু বলিয়া কথিত। এই জনশ্রুতি সত্য হইলে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের টীকায় এবং মধ্বাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম উল্লেখ করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের প্রবর্তক এবং বল্লভাচার্য পরে এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত পুনরুজ্জীবিত করেন।[১০৫] কিন্তু বল্লভাচার্য স্বরচিত কোন গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

তিনি তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈতবাদে মায়াবাদী আচার্য শঙ্করের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; একমাত্র ভগবৎকৃপায় (পুষ্টিমার্গ) জীবের মুক্তিলাভ এবং কৃষ্ণলোকপ্রাপ্তি সম্ভব; কৃষ্ণলোক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধিষ্ঠানভূমির উপরে অবস্থিত, কারণ, শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম এবং শ্রীরাধা তাঁহার নিত্যকান্তা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিত্যবৃন্দাবনে ভক্তগণের সহিত নিত্যলীলায় রত। চৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, বল্লভাচার্য পূর্বে বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন এবং বালগোপালমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবা করিতেন। কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার কিশোর-গোপাল উপাসনায় অর্থাৎ মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে এবং মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বল্লভাচার্যের তিরোধানের পর তাঁহার পুত্র বিট্‌ঠলনাথ ও চুরাশীজন প্রধান শিষ্যের চেষ্টায় এই সম্প্রদায় পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রভাববিস্তারে সক্ষম হয়। বিট্‌ঠলনাথ গুজরাটে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং জৈনধর্মের দেশ ধীরে ধীরে ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বল্লভাচার্যের সমকালে পূর্বভারতে আবির্ভূত হন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভাবাবেগপূর্ণ ভগবৎ-প্রেম এই ধর্মের মূল ভিত্তি এবং ইহা কিশোর-কৃষ্ণ, তাঁহার সঙ্গী ব্রজগোপগোপী এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশিত হয়। চৈতন্য সম্প্রদায়ের যুগল-উপাসনা ও লীলাবাদ যেরূপ সমস্ত সাধ্য-সাধনার মূল তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, নিম্বার্ক বা বল্লভ-সম্প্রদায়ের সাধনায় এই যুগল লীলাবাদের উপর সেইরূপ প্রাধান্য আরোপিত হয় নাই। এই দুই সম্প্রদায়ের সাধনায় কেবল কান্তাপ্রেম নহে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতির উপরও সমভাবেই গুরুত্ব দান করা হইয়াছে।

চৈতন্যমহাপ্রভু এই নব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ হইলেও তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশ ও মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চল মাধুর্য-ভাবপূর্ণ রাধাকৃষ্ণলীলার সাধনকেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইত। কবি জয়দেব, উমাপতি ধর, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি তাঁহাদের কাব্যে এবং মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাদের সাধনায় প্রেমভক্তিধর্মের যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু তাহার উপরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সৌধ নির্মাণ করেন।[১০৩] এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, সার্বভৌম, রামানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রভৃতি পার্ষদগণ এবং শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ। ইঁহারা মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত বাণী হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন। এই সিদ্ধান্ত স্থাপনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ বিভিন্ন শাস্ত্রের সমন্বয়সাধনে যে-প্রতিভার পরিচয় দিযাছেন, তাহা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অতুলনীয়।

ভাগবতধর্মে শ্রীরাধা

ভাগবতধর্মের ক্রমবিবর্তনের প্রসঙ্গে আর যে-বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনায় শ্রীরাধার যোগ। আচার্য নিম্বার্ক যে বৈষ্ণবধর্মে রাধাবাদের প্রবর্তক এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনায় যে ইহার পরিপূর্ণতা তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আচার্য নিম্বার্ক এই তত্ত্ব কোথা হইতে পাইলেন?

খৃষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সাত্বতজাতির দেবতায় পরিণত হইলেও সে-উপাসনায় শ্রীরাধার কোন স্থান ছিল না, এমন কি, সে-উপাসনায় শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী কোন স্ত্রী-দেবতার স্থান ছিল বলিয়াও মনে হয় না, কারণ এই যুগের ভাগবতধর্মের যে-সকল বিবরণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে বাসুদেবের সহিত একমাত্র সঙ্কর্ষণ পূজার পাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পাঞ্চরাত্র ও প্রাচীন পুরাণে শ্রীরাধার অনুল্লেখ

পরবর্তী কালে বৈদিক বিষ্ণুর সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের সমন্বয়ের ফলে ভাগবত ধর্মে যে-রূপান্তর ঘটে, তাহাতেই আমরা সর্বপ্রথম বিষ্ণুর শক্তিরূপে লক্ষ্মীর আবির্ভাব লক্ষ্য করি।[১০৭] পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে, হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু বা বাসুদেবের শক্তিরূপা দেবীর বহু নামের নির্দেশ আছে। কিন্তু এই নামের তালিকায় শ্রীরাধার নাম নাই, এমন কি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্‌-ভাগবতেও একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইলেও স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার নামের উল্লেখ নাই।[১০৮] মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ থাকিলেও শ্রীরাধার নাম কোথাও নাই।

তবে, এই সকল গ্রন্থে শ্রীরাধার নামের কোন উল্লেখ না থাকিলেও পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, ঋক্‌পরিশিষ্ট, সম্মোহনতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে শ্রীরাধার নাম, জন্ম-বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাস ও তাঁহার অনন্যসাধারণ মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

পরবর্তী বৈষ্ণব পুরাণ ও শ্রুতিস্মৃতিতে শ্রীরাধা

অধুনা-প্রচলিত পদ্মপুরাণের বিভিন্নাংশে, বিশেষতঃ পাতালখণ্ডে, শ্রীরাধার বহু প্রসঙ্গ নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এবং কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই পুরাণ হইতে মাত্র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১০৯] ইহাতে কেহ কেহ পদ্মপুরাণে শ্রীরাধা সম্বন্ধে উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজনা বলিয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে, রাধাবাদ যথেষ্ট প্রসার ও প্রসিদ্ধি লাভের পর পদ্ম-পুরাণে এই সকল বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহারা আরও বলেন যে, পদ্মপুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন; আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতক, এমন কি অষ্টম শতকের কাছাকাছি কোন সময় ধরিয়া লইলেও তৎকালে বৈষ্ণবধর্মে শ্রীরাধা এতখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।[১১০]

মৎস্যপুরাণের একটি শ্লোকার্ধেও[১১১] শ্রীরাধার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র মৎস্যপুরাণে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা নাই। উপরন্তু এই শ্লোকার্ধ পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডেও পাওয়া যায়। সুতরাং মৎস্যপুরাণে ইহা প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব।

রাধাকৃষ্ণ-লীলার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের[১১২] উৎস ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—এই অনুমানের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে একাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে এই পুরাণ রাধার সৃষ্টিকর্তা নহে—আদি ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেই রাধার প্রথম আবির্ভাব। আদি পুরাণটি অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনেক পূর্ববর্তী রচনা এবং বর্তমানে বিলুপ্ত[১১৩] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীরাধার যোগ হাজার বছরেরও পূর্ববর্তী। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের কেহ কেহ গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের 'নন্দনিদেশ' পদের 'আনন্দদায়ক আদেশ' অর্থ করিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব তথা বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছেন।[১১৪] আবার কেহ কেহ ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণের উক্ত কাহিনীকে জয়দেবের পরবর্তী কালের রচনা অনুমান করিয়া এই পুরাণের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পরবর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহারা আরও বলিয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যদি প্রাচীন পুরাণই হইবে, তাহা হইলে এই পুরাণে রাধাকৃষ্ণ-লীলার এত বর্ণনাপ্রাচুর্য সত্ত্বেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই পুরাণের রাধালীলার উল্লেখ করিলেন না কেন?[১১৫]

এই সকল পুরাণ ছাড়াও বায়ু[১১৬], বরাহ[১১৭] ও আদি পুরাণের[১১৮] দুই একটি শ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিচ্ছিন্ন শ্লোকের কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, কোন্‌টি অকৃত্রিম তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন বৈষ্ণব শ্রুতিস্মৃতিতন্ত্র হইতেই প্রধানতঃ শ্রীরাধার প্রাচীনতার প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'র

রাধাপ্রকরণে গোপালতাপনী ও ঋকৃপরিশিষ্ট হইতে রাধা নামের উল্লেখ করিয়াছেন[১১৯], শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার টীকায় বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র ও সম্মোহনতন্ত্রের রাধাসম্পর্কিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১২০] কিন্তু এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে কিছু বলা সম্ভব নহে বলিয়া ইহাদের ভিত্তিতে শ্রীরাধার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা কঠিন।

তবে লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বনে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীরাধার যোগ অন্ততঃ দেড় হাজার বছরেরও প্রাচীন।

লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে শ্রীরাধা

রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় সাতবাহন নরপতি হালের 'গাথাসপ্তশতী' নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতার সংকলনগ্রন্থের একটি শ্লোকে—

মুহ মারুএণ তং কণ্‌হ গো-রঅং
রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাঁণ বল্লবীণং অণ্ণাণ বি
গোরঅং হরসি॥[১২১]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি ফুৎকারের সাহায্যে রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজঃ (ধূলিকণা) উড়াইয়া দিয়া এই গোপীদের এবং অন্য সকল নারীরও গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতেছ।

হালের আবির্ভাবকাল ও এই গাথাগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে হাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, কাহারও মতে তৃতীয় শতাব্দীতে; আবার কাহারও মতে এই গাথাগুলি দুইশত হইতে চারশত পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। তবে ইঁহাদের কেহই গাথাগুলির রচনাকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া মনে করেন না। কারণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি বাণভট্ট তাঁহার 'হর্ষচরিতে' প্রাচীন গ্রন্থকারদের

মধ্যে হালের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং হাল-সংকলিত এই গাথাগুলি-যে সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।[১২২]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বেই যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ বগুড়া জেলার পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ যুগলমূর্তির উল্লেখ করা যায়।

প্রাকৃত সাহিত্যের ও ভাস্কর্যের এই সকল নিদর্শন ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও কম পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের নান্দীশ্লোকে যমুনাতীরে রাসের সময় প্রণয়কুপিতা অশ্রুসিক্তা রাধিকার ও তাঁহার প্রীতি-বিধানের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২৩] নবম শতাব্দীর পূর্বার্ধের আলংকারিক বামন তাঁহার অলংকারগ্রন্থে ভট্টনারায়ণের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ভট্টনারায়ণকে অষ্টম শতকের কবি বলা যাইতে পারে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ আলংকারিক আনন্দবর্ধন জীবিত ছিলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'ধ্বন্যালোক' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখা যায়।[১২৪] ইহাদের মধ্যে "দুরারাধ্যা রাধা" ইত্যাদি শ্লোকটি আনন্দবর্ধনের নিজের রচনা নহে বলিয়াই অনেকের অভিমত।[১২৫] এই শ্লোকটি তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কবির রচিত হইলে ইহা নবম শতাব্দীর পূর্বের বলিয়া অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শ্লোকে প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার সেবায় শ্রীরাধার বিমুখতা ও বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

"তেষাং গোপবধূ" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকটিতে বৃন্দাবনলীলার স্মৃতি নূতন রাজা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-সমুদ্রকে কিরূপ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ধ্বন্যালোকের টীকা 'লোচনে' অভিনবগুপ্ত একটি রাধাবিরহের

পদ[১২৬] উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলে যমুনাতীরের লতাগুলি জড়াইয়া ধরিয়া উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার করুণ ক্রন্দন এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' সংস্কৃত কবিতার একখানি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহার সংকলয়িতার নাম জানা যায় নাই, তবে সংকলনটি দশম শতাব্দীর বলিয়া স্বীকৃত। অতএব ইহার কবিগণ-যে দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সংকলনে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে চারটি শ্লোক[১২৭] সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি শ্লোকে আছে, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা গিরি-গোবর্ধন ধারণ করিয়া আছেন এবং শ্রীরাধা প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছেন।

ইহার পর দশম শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতার-চরিতে' রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই কাব্যের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপবধূর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তথাপি ভ্রমরের প্রীতি যেমন জাতী কুসুমের প্রতিই সর্বাধিক সেইরূপ শ্রীরাধাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়—

"প্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামানিচয়চুম্বিনঃ।
জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা।"

ইহা ছাড়া হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণে' উল্লিখিত ভেজ্জল কবির 'রাধাবিপ্রলম্ভ' নাটক, নবম শতাব্দীতে সংকলিত জয়বল্লভের 'বজ্জালগ্‌গা', দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে সংকলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত', চতুর্দশ শতকে সংকলিত প্রাকৃত ছন্দের গ্রন্থ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' প্রভৃতিতে রাধা-প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়।

তামিল সাহিত্যের রাধা—নাপ্পিন্নাই

এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণবসম্প্রদায় আলোয়ারদের দিব্যগীতিসমূহে শ্রীকৃষ্ণলীলার যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার

উল্লেখ প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সাধকগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে অষ্টম-নবম শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তামিলনাদে আবির্ভূত হন। ইহাদের 'দিব্যপ্রবন্ধের' বহু স্থানে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই দিব্যগীতি-সমূহে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ আছে। তাঁহার নাম নাপ্পিন্নাই। ইনি কখনও কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়, কখনও নন্দগোপের পুত্রবধূ, আবার কখনও লক্ষ্মীর অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন।[১২৮] নাপ্পিন্নাই রাধার ন্যায় কৃষ্ণের প্রেয়সীদের মধ্যে প্রধানা, সৌন্দর্যের প্রতিমা; সুতরাং নাপ্পিন্নাইকে তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধা বলা অসঙ্গত নয়।[১২৯]

আলোয়ার সাধকগণের সাধনার বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কালে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রসারিত হইলেও নাপ্পিন্নাই তামিল দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতের বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই; সে স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীরাধা।

শ্রীরাধার আধ্যাত্মিক রূপান্তর

শ্রীরাধা কোন্ সময় হইতে পুরাণ ও লৌকিক সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছেন তাহার কিছু নিদর্শন পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন আলোচনা করিলে মনে হয় যে, শ্রীরাধার প্রথম আবির্ভাব লৌকিক সাহিত্যে পার্থিব প্রেমকাহিনীর নায়িকারূপে, তারপর বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের অধ্যাত্মলোকে দিব্য প্রেমলীলার নায়িকা ও অগণিত ভক্তের উপাস্যারূপে।[১৩০] এই কারণেই বৈষ্ণব ধর্মে রাধাবাদের প্রবর্তক আচার্য নিম্বার্কের দার্শনিক মত আলোচনা প্রসঙ্গে D. S. Sarma বলিয়াছেন—"It is very probable that Nimbarka developed his system out of the legends of Krishna prevailing in Brindaban."[১৩১] আচার্য নিম্বার্কের দার্শনিক চিন্তায় শ্রীরাধার এই যে আধ্যাত্মিক রূপান্তর, তাহাই তত্ত্বরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধ্যানে ও মননে।[১৩২]

যাদব বা সাত্বত জাতির মধ্যে একেশ্বরবাদের প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে স্বীয় সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতায় পরিণত হন, বৈদিক সমাজের স্বীকৃতির ফলে বিষ্ণুর অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে বৈদিক দেবতামণ্ডলীতে স্থান লাভ করেন, কিরূপে ভাগবতধর্ম সাত্বত-অধ্যুষিত অঞ্চলের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবধর্মরূপে ক্রমে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে, তারপর দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবসাধক আলোয়ার সম্প্রদায় এবং মধ্যযুগের ভক্তিবাদী দার্শনিক ও সম্প্রদায়-গুরুগণের ধ্যানে ও মননে তাহার কি রূপান্তর ঘটে, ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাহার আলোচনা শেষ হইল।

এই আলোচনা অকারণ দীর্ঘ এবং মূল আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অবান্তর মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। কারণ A. D. Pusalker[১৩৩] যথার্থই বলিয়াছেন যে, একই ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত সম্বন্ধে এত পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহার বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ অনায়াসে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের উপজীব্য হইতে পারে। অথচ শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মমতের সহিত এই সকল সমস্যা এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করিয়া না লইলে এই ধর্মমতের দার্শনিক ও তত্ত্বগত আলোচনায় অকারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। এই কারণেই মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ঐতিহাসিক দিক্ হইতে এই আলোচনাটুকু করিয়া লইতে হইল।

এইবার মূল আলোচনার কথা। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়, দর্শন ও সাধনতত্ত্বের দিক্ হইতে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য নির্ণয়। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব ও পরিকরতত্ত্ব—এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, লীলা, অবতারতত্ত্ব, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, আশ্রয়তত্ত্ব, বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং

বজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ···, এবং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্—এই সাতটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিধর গোপবালক হইতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মে পরিণতি ও বৈষ্ণব সাধকের দৃষ্টিতে তাঁহার স্বরূপ আমাদের আলোচ্য বিষয়; ব্রজভূমি, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি, উদ্ধব ও বৃন্দাবনতত্ত্ব—এই তিন অধ্যায়ে ধামতত্ত্ব অর্থাৎ সাধকের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল ব্রজভূমির স্বরূপ আলোচনা করা হইবে; কান্তাভাব ও রাসলীলা, গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা এবং মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ—এই তিনটি অধ্যায়ে পরিকরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা ও তাঁহার লীলা-সহচরীদের স্বরূপ ও সাধনবৈশিষ্ট্য আলোচিত হইবে। দ্বাপরে ব্রজভূমিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে-লীলার আরম্ভ, কলিযুগে নবদ্বীপে তাহারই পরিপূর্ণতা। তাই সাধনার ধারা অধ্যায়ে মহাপ্রভুর লীলামাধুর্য ও তৎপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার বিশেষত্ব আলোচনার দ্বারা ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য নির্ণয়ের উপসংহার করিব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের দৃষ্টিতেই আমরা এই লীলার তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। তবে ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনবোধে আলোয়ার সাধকগণ এবং আচার্য রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি মধ্যযুগের সম্প্রদায়-প্রবর্তক দার্শনিক ও মনীষীদের রচনা হইতেও সাহায্য লইব।

এই আলোচনায় পূর্বাচার্যগণের যে-সকল রচনা হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করা হইয়াছে। তবে ইহাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন, যাঁহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। বস্তুতঃপক্ষে ইহাদের রচনার সাহায্য ছাড়া আমার ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সমুদ্রের মত বিরাট, গভীর ও বৈচিত্র্যময় শ্রীকৃষ্ণলীলার অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টাও সম্ভব হইত না। গৌরগতপ্রাণ, বৈষ্ণবসাহিত্যে পারদর্শী প্রাণগোপাল গোস্বামী, শ্যামলাল গোস্বামী, পুরীদাস দাস, হরিদাস দাস, সুন্দরানন্দ

বিদ্যাবিনোদ, রাধাবিনোদ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ প্রভৃতি মনীষীর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী হইতে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে আমি যে-সাহায্য পাইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অপরপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রচারিত ধর্মের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক আলোচনায় Garbe, Grierson, Weber, Colebrooke, Schrader, Winternitz, Keith, Farquhar, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আর. জি. ভাণ্ডারকর, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, এস. কে. আয়েঙ্গার, সুশীলকুমার দে, আচার্য যতীন্দ্র রামানুজদাস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের রচনা হইতে যে-সাহায্য পাইয়াছি, তাহাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

ইহা ছাড়া পরম পূজনীয় আচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক শ্রুতকীর্তি ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়া ও নানা বিষয়ে সন্দেহ দূর করিয়া সর্বদা আমাকে অমূল্য উপদেশ ও উৎসাহ দিয়াছেন এবং আমিও অসঙ্কোচে তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছি, তাঁহার স্নেহধন্যা ছাত্রী বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। মামুলি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সেই স্নেহ-সম্পর্কের অবমাননা করার ধৃষ্টতা আমার নাই। তাঁহার অকৃপণ স্নেহে আমি ধন্য, তাঁহার আশীর্বাদ আমার জীবনের পরম পাথেয়।

এই সঙ্গে দুঃখে ও বেদনায় আর যাঁহার কথা বারবার মনে পড়িতেছে, তিনি আমার পিতৃতুল্য আচার্য পরলোকগত পণ্ডিত-প্রবর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। এই জ্ঞানতপস্বী কি অসীম ধৈর্য, অদম্য উৎসাহ এবং ঐকান্তিক স্নেহ ও যত্নেই না দিনের পর দিন এই দুরূহ বিষয়ের প্রতিটি সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়া আমার ন্যায় অকৃতী ছাত্রীকে ব্রজলীলার মাধুর্য আস্বাদনের যোগ্য করিয়া

তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কোনদিন এতটুকু বিরক্তির ভাবও তাঁহার চোখে মুখে প্রকাশ পাইতে দেখি নাই। আমার কাজ শেষ হইল, কিন্তু তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না—এই দুঃখ ও অনুশোচনা হইতে আমি কোনদিনই মুক্তি পাইব না।

এই দুই আচার্যের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভের যে-সুযোগ পাইয়াছি, তাহা যে-কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই দেবতার আশীর্বাদ-স্বরূপ। কারণ দুর্লভ পাণ্ডিত্যের সহিত দুর্লভতর স্নেহশীলতার যে-আশ্চর্য সম্মিলন ইঁহাদের চরিত্রে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি, তাহা বর্তমান যুগে লুপ্তপ্রায়। ইঁহাদের শিক্ষা আমি কতটা কাজে লাগাইতে পারিয়াছি, সে-বিচার সুধীবৃন্দ করিবেন। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় আমি কেবল ইহাই নিবেদন করিতে চাই—

"অথবা কৃতবাগ দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

উল্লেখপঞ্জী

১। M. Winternitz—History of Indian Literature, Vol. I, Part II, (1963), Page 469.

২। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৩।১৭।৬)

৩। Encyclopaedia of Religion and Ethics. Ed. by James Hastings. (1909), Vol. II, article by Garbe, Page 535.

৪। বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্—৪।৩।৯৮
এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডারকর কৃষ্ণ ও বাসুদেবকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও (Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, 1913, Pages 11-12) পতঞ্জলির মহাভাষ্য, বৌদ্ধ জাতক এবং জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্র প্রভৃতি হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, বাসুদেব ও কৃষ্ণ অভিন্ন।

৫। মহাভাষ্য—৪।২।১০৪ ; ৩।১।২৬
৬। Jatakas Edited by E. B. Cowell (1901) Vol. IV, Page 50 ff.
৭। Jaina Sutra Ed. by Hermann Jacobi (1895), Part II, Page 112
৮। J. W. McCrindle—Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (1960), Page 206
৯। R. G. Bhandarkar—Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems (1913), Page 9
১০। A. Barth—The Religions of India (1882), Page 172
J. N. Farquhar—An Outline of the Religious Literature of India (1920), Page 49
১১। E. W. Hopkins—The Religions of India (1894), Pages 466-67
১২। Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1908, Child Krishna-article by Keith, Page 171
১৩। পাণিনি কোথাও বাসুদেবের দেবত্বের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। তবে বাসুদেব ও অর্জুনের ভক্ত বুঝাইতে 'গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্' (৪।৩।৯৯) সূত্রের পরিবর্তে 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্' সূত্র প্রযোগের নির্দেশ দেওয়ায় পতঞ্জলি অনুমান করিয়াছেন যে, বাসুদেব ও অর্জুন কেবল ক্ষত্রিয় বীর নহেন, ঐশীশক্তি-সম্পন্ন সত্তা ("অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্রভবতা।") পতঞ্জলির এই ভাষ্যের ভিত্তিতেই ভাণ্ডারকর, Grierson প্রভৃতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পাণিনির পূর্বেই যে (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক) বাসুদেব

দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেন, পাণিনি এই সূত্রে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১৪। Indian Historical Quarterly Dec. 1942 [article—The Vedic and Epic Krishna by S. K. De]

১৫। S. Radhakrishnan—Indian Philosophy (1956) Vol. I Page 493

১৬। H. C. Raychaudhuri – Materials for the Study of the Early History of the Vaisnava Sect (1936), Pages 78-83

১৭। Sacred Books of the East, Edited by F. Maxmuller (1879), Vol. I, Page 52n

A Macdonell & A. B. Keith—Vedic Index of Names and Subjects (1958), Vol. I, Page 184

Indian Historical Quarterly, Dec., 1942, article by S. K. De. & E. W. Hopkins—তদেব; পৃঃ ৪৬৬-৪৬৭

১৮। Winternitz—তদেব পৃঃ ৪০১

১৯। Mahabharata [Critical Edition] Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona (1943), II 30/11, 38/4, XII 47/72

২০। Hopkins—তদেব পৃঃ ৩৪৯, ৩৫৬ (পাদটীকা)

২১। প্রচলিত মহাভারতের সভাপর্বে দ্রৌপদীর স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণ ‘গোপীজনপ্রিয়’ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও পণ্ডিতগণ এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। F. Edgerton সম্পাদিত সভাপর্বের ভূমিকা Pages XXVIII-XXIX দ্রষ্টব্য।

২২। H. C. Raychaudhuri—তদেব পৃঃ ৭৩ (পাদটীকা)

২৩। অশ্বঘোষ—বুদ্ধচরিত—৪।১৪ Ed. by E. H. Johnston (1935)

২৪। ভাস—বালচরিত, ৩য় অঙ্ক, Ed. by T. Ganapati Sastri, Trivandram (1912)

২৫। বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ৪৫৪ (সংসদ সংস্করণ)

২৬। Belava Plate of Bhojavarmana (1090 A. D.)

২৭। দক্ষিণ ভারতে, গোয়ায় এবং বঙ্গদেশে কৃষ্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণন্, কুষ্টো ও কৃষ্ট-রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

২৮। Indian Antiquary—Vol. XXX (1901), Page 286

২৯। Hopkins—তদেব পৃঃ ৪৩১

Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1907, art. by J. Kennedy, Pages 977-78; ৯৮১ ৯৯০

Encyclopaedia of Religion and Ethics, art.—Bhakti Marga by Grierson, Page 550; Bhandarkar—তদেব পৃঃ ৩৭-৩৮

৩০। H. C. Raychaudhuri—তদেব পৃঃ ১৪৮-৪৯

৩১। বিস্তৃত আলোচনা—A. D. Pusalker—Studies in Epics and Puranas of India [Bhavan Edition—1963] Pages 105-109 ; 145-146

৩২। P. V. Kane—History of Dharmasastra (1946), Vol. III, Page 923

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ৪১৫—১৬ (সংসদ সংস্করণ)

৩৪। R. K. Mookerji—Hindu Civilization [Bhavan Edition, 1963] Part I, Pages 149-52

৩৫। H. C. Raychaudhuri—Political History of Ancient India 1950, Pages 27-36

৩৬। F. E. Pargiter—Ancient Indian Historical Tradition, 1922, Page 182

৩৭। (i) Garbe—Journal of the Royal Asiatic Society, 1905, Page 385 (ii) R. P. Chanda—Indo Aryan Races (1916) Page 102

৩৮। Winternitz—তদেব পৃঃ ৪০২ (প্রথম খণ্ড)

৩৯। Grierson, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির মতে এই ক্ষত্রিয় সমাজ আর্যজাতি, অপরপক্ষে Weber, ভাণ্ডারকর, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির মতে আর্যেতর জাতি—Indian Antiquary 1908, Page 253, art. by Grierson; Indo-Aryan Races, Page 105; Indian Philosophy, Pages 493-96

৪০। রবীন্দ্র রচনাবলী—১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-৪৭ (শতবার্ষিক সংস্করণ)

৪১। বর্তমান দিল্লী ও তৎসংলগ্ন আর্য-অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চল, মধ্যদেশ এবং এই মধ্যদেশের সীমাবহির্ভূত পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল বহির্দেশ নামে পরিচিত ছিল। Grierson-এর Bhakti Marga পৃঃ ৫৩৯-৪০ দ্রষ্টব্য।

৪২। Journal of the Royal Asiatic Society, 1905, Page 385, art. by Weber.

৪৩। স্বর্গারোহণ পর্ব—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯৭ শ্লোক।

৪৪। F. O. Schrader—Introduction to Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita, 1916, Page 24

৪৫। S. Radhakrishnan—তদেব, পৃঃ ৪৯০ (পাদটীকা) ও ৪৯৬

৪৬। পাঞ্চরাত্রমতের বিশিষ্ট অঙ্গ ব্যূহবাদে বাসুদেব আদি পুরুষ, সঙ্কর্ষণ তাঁহার ব্যূহরূপ অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের অগ্রজ হইলেও চতুর্ব্যূহতত্ত্বে বাসুদেবের পরে তাঁহার স্থান। কিন্তু নাগরীগ্রামে ও নানাঘাট গুহায় প্রাপ্ত শিলালেখে প্রথমে সঙ্কর্ষণ ও পরে বাসুদেবের উল্লেখ দেখা

যায়। ইহা হইতে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে, ব্যূহতত্ত্বের প্রসারের পূর্বে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব দেবোপম বীর-রূপে (hero god) পূজিত হইতেন। তিনি এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বায়ু পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্চোপাসনা (১৯৬০), পৃ. ৫৯-৬২

৪৭। Schrader—তদেব, পৃঃ ১৯

৪৮। Schrader—তদেব, পৃঃ ২৫

৪৯। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ৩।৯

৫০। ইহা লক্ষণীয় যে, প্রথম ব্যূহ বাসুদেব বসুদেব-সুত শ্রীকৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম, প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র আর অনিরুদ্ধ হইলেন পৌত্র।

৫১। Schrader—তদেব, পৃঃ ৩৯-৪০

৫২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৭।৩, ২৩

৫৩। গীতা, ১০।২০, ১৮।৬১

৫৪। Schradar—তদেব, পৃঃ ১ ও ১৬

৫৫। S. Radhakrishnan—তদেব, পৃঃ ৪৯৬ ও ৪৯৯

৫৬। "শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্ স্থিতাঃ।
স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্যতস্তু তাঃ॥
সূক্ষ্মাবস্থা তু সা তেষাং সর্বভাবানুগামিনী।
ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে॥"

৫৭। প্রমথনাথ তর্কভূষণ—বাংলার বৈষ্ণব দর্শন, শ্রীগুরু লাইব্রেরী (১৩৭০), পৃঃ ১৬০

৫৮। ঋগ্বেদ, ৭।৮৬, ২ ও ৪

৫৯। "If Bhakti means faith in a personal God, love for Him. dedication of everything to His service and the attainment of moksa or freedom by personal devotion, surely we have

all these elements in Varuna worship."— Radhakrishnan – তদেব (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১০৮

৬০। ঋক্‌সংহিতা, ৮।৪২।৬

৬১। প্রমথনাথ তর্কভূষণ—তদেব, পৃঃ ১৪৯

৬২। ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬

৬৩। S. Radhakrishnan—তদেব, পৃঃ ৪৯১-৯২

৬৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ৬।২৩

৬৫। S. Radhakrishnan – তদেব, পৃঃ ৫১১

৬৬। সি. কুহ্নন্‌রাজা—'ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক্‌-বৈদিক উপাদান' প্রবন্ধ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ৯ [এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৩৬৬]

৬৭। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চোপাসনা, পৃঃ ১২-১৩ [ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০]

৬৮। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য, পৃঃ ৩০ [লেখাপড়া, ১৯৬৪] এই প্রসঙ্গে Grierson-এর উক্তি স্মরণীয়ঃ "The origin of monotheism from which Bhakti sprang must be sought elsewhere than among the Brahmanas of Northern India. Encyclopaedia of Religion and Ethics – Vol. II, Page 539

৬৯। সি. কুহ্নন্‌ রাজা—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮-৯ ; S. N. Dasgupta – History of Indian Philosophy, Vol. III, 1952, Page 19

৭০। S. N. Dasgupta – তদেব, পৃঃ ১৮-১৯

৭১। আচার্য শংকর ও আচার্য রামানুজের বিতর্ক 'অবতার-তত্ত্ব' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৭২। R. P. Chanda – Indo Aryan Races, Varendra Research Society, Rajshahi (1916), Pages 99-101

S. Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. I (1956), Pages 498-99
Jonrnal of the Royal Asiatic Society, London, 1911, art.–The Pancaratra or Bhagavat Sastras by A Govindacarya Svamin, Pages 939 940

৭৩। H. T. Colebrooke—Miscellaneous Essays, Vol. I (1837), Page 414–প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আধুনিক যুগে Colebrooke-ই সর্বপ্রথম পাঞ্চরাত্রমতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৭৪। "The very need for defence seems to show that it took sometime for the system to be accepted as Vedic."—Radhakrishnan—Indian Philosophy, Vol. I, Page 499

৭৫। R. G. Bhandarkar—তদেব, পৃঃ ৫২

৭৬। Brajendranath Seal—Comparative Studies in Vaisnavism and Christianity, Page 102

৭৭। Bhakti Marga—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II

৭৮। Grierson—তদেব, পৃঃ ৫৫০

৭৯। "We cannot however help stating a few facts in connection with the doctrine of Salvation by faith in Vishnu's divine supremacy. This doctrine was not inculcated until a recent period in the history of Brahminism and several hundred years after Christ. The scene of its inculcation was the South of India and Canjeveram is considered to this day as the

original seat of Ramanuja, the first Brahmin who acted on the above doctrine.....Several hundred years before initiation of this novel doctrine by a voice from heaven, Christian communities had been formed in the South of India professing the doctrine of Salvation by faith, and contradicting the old theory of sacrificial rites. The doctrine of Vishnu opened the door of Salvation to classes of men (Yavanas and Mlecchas not excepted) after the fashion of Christianity."— The Narada Pancaratra Ed. by The Rev. K. M. Banerji, 1865, Introduction, Page 8.

৮০। প্রথম মণ্ডলের ২২, ১৫৪ ও ১৫৬ এবং সপ্তম মণ্ডলের ৯৯ ও ১০০ সংখ্যক সূক্ত।

৮১। ঋগ্বেদ—৭, ৯৯, ৩

৮২। ঋগ্বেদ—১, ১৫৪, ৫

৮৩। ঋগ্বেদ—১, ১৫৬, ৩ ; ৬, ৬৯ ও ৭, ৯৯ ; ৭, ১০০, ৬

৮৪। শতপথ ব্রাহ্মণ—১ম কাণ্ড, ২ অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ।

৮৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১'১

৮৬। শতপথ ব্রাহ্মণ—১২শ কাণ্ড, ৩য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ

৮৭। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।১।৮

৮৮। H. C. Raychaudhuri—তদেব, পৃঃ ১০৬-১০৮

৮৯। H. C. Raychaudhuri—তদেব, পৃঃ ১০৬-১০৮ ; Grierson—তদেব, পৃঃ ৫৪০

৯০। Bulletin of the School of Oriental Studies, London, Vol. VI, Pt. III, Pages 669-72, art. by S. K. De.

২১। Grierson—তদেব, পৃঃ ৫৪১-৪২ ; H. C. Raychaudhuri—তদেব, পৃঃ ১৭৬

২২। H. C. Raychaudhuri—তদেব, পৃঃ ১৭৮-৭৯

২৩। "Bhagavatism had penetrated into the Deccan at least as early as the first century B. C."—H. C. Raychaudhuri—তদেব, পৃঃ ১৮০ "Krishna is a loving and loveable God of the ancient Tamilians...Early in the centuries of the Christian era Krishna had attained the status of a deity in Tamil India and he was worshipped by the people as a very ancient God"—Indian Culture, Vol. IV, Pages 267-271—art. Krishna in Tamil Country by V. R. Ramchandra Dikshitar.

২৪। "While Kumarila and Shankara fought Buddhism on the ground of *Karma* and *Jnana* respectively, the Vaisnavite and Shaivite Saints of Southern India fought it on the ground of *bhakti* and vanquished it. It is said that they sang Buddhism and Jainism out of their province." D. S. Sarma—Hinduism through the Ages. Bhavan Edition (1961), Page 31.

২৫। আড়্বার—আচার্য যতীন্দ্র রামানুজদাস, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, ১৩৬৫

২৬। D. S. Sarma—তদেব, পৃঃ ৩৭-৩৮।
S. K. De—Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal. General Printers and Publishers Ltd., 1942, Page 5

২৭ ভা. পু. ৩,২৯।১১-১৩

২৮। J. N. Farquhar—তদেব, পৃঃ ২১৯ ৩০ ; J. S. M. Hooper—Hymns of the Alvars (1929), Page 18

৯৯। D. S. Sarma—তদেব, পৃঃ ৩৫।
আচার্য যতীন্দ্র রামানুজদাস তদেব, পৃঃ ৪৭, ২৩৮-৩৯

১০০। অনেকেই তামিল সাহিত্যের নাপ্পিন্নাই বা নীলা নামটি রাধারই নামান্তর বলিয়া মনে করেন।—Indian Culture, Vol. IV, Page 269

১০১। আচার্য যতীন্দ্র রামানুজদাস—তদেব, পৃঃ ১৭০-৭১

১০২। বিস্তৃত আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১০৩। H. C. Raychaudhuri—তদেব, পৃঃ ১৯৩

১০৪। S. N. Dasgupta—তদেব, পৃঃ ৪০০

১০৫। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যের উপক্রমণিকার টীকায় এবং প্রমেয় রত্নাবলীতে পদ্মপুরাণের শ্লোক বলিয়া এই দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ।
বিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

১০৬। বিস্তৃত আলোচনা 'শ্রীকৃষ্ণ' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১০৭। Grierson-এর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৫৪২।

১০৮। ভাগবত পুরাণে শ্রীরাধার নাম কেন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই সে সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের অভিমত "গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১০৯। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

১১০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, এ. মুখার্জি এণ্ড কোং (১৩৭০), পৃঃ ১১০-১৩

১১১। "রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।"

১১২। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবং শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥"

১১৩। বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণচরিত্র, সংসদ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭০, ৪৬৮, ৭৭৫

১১৪। প্রমথনাথ তর্কভূষণ—তদেব, পৃঃ ২৯৪-২৯৯

১১৫ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—তদেব, পৃঃ ১১৭-১৮

১১৬। "রাধা-বিলাস-রসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্।
শ্রুতবানস্মি বেদেভ্যো যতস্তদ্‌গোচরোঽভবৎ ॥"

১১৭। "তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্।
স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ ॥
রাধাকুণ্ডমিতিখ্যাতং সর্বপাপহরং শুভম্ ॥"

১১৮ শ্রীরূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃতে ধৃত ২।৪৬ শ্লোক

১১৯। ঋক্‌পরিশিষ্টের সেই শ্লোকার্দ্ধ হইতেছে—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।'

১২০। ব্রহ্মসংহিতা—গৌরকিশোর গোস্বামী বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত (১৩৬৭), তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২১। গাথাসপ্তশতী—রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত (১৯৪৬). ১।৮৯

১২২। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রাসলীলা, ১৩৪৫, পৃঃ ৮২ ; রাধাগোবিন্দ বসাক—তদেব, অবতরণিকা—পৃঃ ॥৶০ এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত—তদেব, পৃঃ ১২৩-১২৪।

১২৩ "কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যাদ্‌ভূতরোমোদ্‌গতে-
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ ॥"

১২৪ (ক) "দুরারাধ্যা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজত-

স্তবৈতৎ প্রাণেশাজ্ঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্।
কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈর্বিরম হে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ॥"

(খ) "তেষাং গোপবধূ-বিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়া-তীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পন-মৃদুচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥"

১২৫। 'ধ্বন্যালোকে' উদ্ধৃত নিজের রচিত শ্লোকে তিনি সর্বত্রই 'যথা মম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে গিয়া 'যথা চ' এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন।

১২৬। "যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ তদ্দত্তঝম্পানতাং
কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণ্ঠয়া।
তদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্॥"

১২৭। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, হরিব্রজ্যা ২১, ৩৪, ৪১, ৪২

১২৮। J. S. M. Hooper-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থে মহিলাকবি অণ্ডালের কবিতা, পৃঃ ৫৫, স্তবক সংখ্যা ১৮ এবং ২০

১২৯। Indian Culture—Vol. IV, Page 269

১৩০। S. K. De—(i) তদেব, পৃঃ ৯-১০
(ii) শশিভূষণ দাশগুপ্ত—তদেব, পৃঃ ১২০

১৩১। D. S. Sarma—তদেব, পৃঃ ৫৩

১৩২। 'গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩৩। A. D. Pusalker—তদেব, পৃঃ ৮৪

প্রথম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ

ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ক্রমপরিণতি আলোচনা প্রসঙ্গে অবতরণিকায় বলা হইয়াছে যে, আর্যশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত, গীতা ও পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়. তন্মধ্যে বেদ ও উপনিষদ্ ভিন্ন অপর তিনটি শাস্ত্র-গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। এই শ্রীকৃষ্ণ আদিতে যাদব বা সাত্বত জাতির নেতা ও ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন, পরে নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতায় পরিণত হন এবং ক্রমে ক্রমে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সহিত সমন্বয়ের ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানরূপে ভক্তগণের দ্বারা পূজিত হন। তিনখানি প্রাচীন ও প্রধান বৈষ্ণবপুরাণ—হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করিলেই ইতিহাসের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ প্রতিপন্ন হইবে।

তবে তাহার পূর্বে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। যাঁহারা মহাভারত, গীতা ও পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতায় বিশ্বাসী, তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণজীবনের পরিপূর্ণতা ব্রজলীলায় অথবা কুরুক্ষেত্রলীলায়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মতে, ব্রজলীলা কেবল শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এই লীলা কেবল গোপগোপীদের কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত। কিন্তু মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের পরিণত বয়সের লীলা বর্ণিত. এই লীলায় তিনি কুরুক্ষেত্র সমরের অন্যতম নায়ক, অর্জুনের সারথিরূপে ভগবদ্গীতার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিধর্মের প্রবক্তা অর্থাৎ তখন তিনি ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানব-রূপে ('Universal Man') অবতীর্ণ। সুতরাং মহাভারতেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পরিপূর্ণতম প্রকাশ।

অপরপক্ষে, আর এক শ্রেণী এই সিদ্ধান্তের বিরোধী। তাঁহাদের

মতে কুরুক্ষেত্রলীলায় নহে, ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পূর্ণতা। ইহার সমর্থনে তাঁহারা দুইটি যুক্তি প্রদর্শন করেন; প্রথমতঃ, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ব্যাসদেব মহাভারত রচনার পর অতৃপ্তি বোধ করিতেন না এবং দেবর্ষি নারদের পরামর্শে মহাভারত রচনার পর ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। ভাগবতপুরাণে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।[১] দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা দুইরূপে, ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে, প্রকাশিত ঐশ্বর্যস্বরূপে তিনি জগৎকে নিজলীলা-মাহাত্ম্যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেন; ভক্ত শঙ্কিতচিত্তে একমাত্র নির্ভরজ্ঞানে তাঁহাকে আশ্রয় করে। আর মাধুর্যস্বরূপে তিনি ভক্তের হৃদয় আকর্ষণকারী আপনজন, কেবল আপনজন নহেন, পরমপ্রিয় দয়িতরূপে আবির্ভূত। ভগবত্তার এই দুই রূপের পরিচয় মহাভারতে নাই; সেখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ঐশ্বর্যপ্রধান। কিন্তু ব্রজলীলায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় প্রকার লীলার পরিপূর্ণ প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার চরম স্ফুরণ।. এই কারণেই বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রলীলা অপেক্ষা ব্রজলীলার আকর্ষণ এত অধিক—

> "এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান।
> আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণনাম॥"

প্রাচীন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণলীলা—পূতনাবধ

এখন পর্যায়ক্রমে হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতপুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি লীলা আলোচনা করিয়া দেখা যাক যে, বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গোপনায়ক হইতে দেবতার স্তরে উন্নীত হইয়া ক্রমে মাধুর্যসর্বস্ব স্বয়ং ভগবানে পরিণত হইয়াছেন। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ আলোচনা করিলে দেখা যায়, কংস নিজপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে পক্ষীর ছদ্মবেশধারিণী পূতনাকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। পূতনা স্তন্যদানে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানচ্ছলে তাঁহার প্রাণ হরণ করিলে

পূতনা মাটিতে পড়িয়া যায়। পূতনাবধের প্রকৃত রহস্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিস্ময়বিমূঢ় নন্দ বলেন—একি কাণ্ড, কিছুই বুঝিতে পারি না। পুত্রটির জন্য আমার গুরুতর শঙ্কা জন্মিয়াছে।[২]

বিষ্ণুপুরাণে পূতনাবধ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ 'গৃহীত্বা প্রাণসহিতং পপৌ কোপসমন্বিতঃ' [বিষ্ণুপুরাণ ৫।৫।৯]। এই 'কোপের' উল্লেখ হরিবংশে নাই। 'কোপ' শব্দটি বিশেষ অর্থসূচক, কারণ মানবশিশুর পক্ষে স্তন্যদায়িনীর প্রতি ক্রোধ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। হরিবংশে বধের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ ব্রজবাসিগণের মনে যে বিস্ময়ের ভাব পরিস্ফুট, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের জীবনহানির আশঙ্কায় তাঁহারা ভীত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ব্রজবাসিগণের মনে এইরূপ কোন ভয় বা বিস্ময়ের উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাদর্শনে ব্রজবাসিগণের মধ্যে বিস্ময়ের ভাব দেখা দিলেও শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, হরিবংশ হইতে ইহাই অনুমান করিতে হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণে দেবত্ববুদ্ধির সম্পূর্ণ উন্মেষ লক্ষণীয়। ভাগবতে বিষ্ণুপুরাণের এই দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়।[৩]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূতনার স্তন্যপান করায় সে সঙ্গে সঙ্গেই পাপ-মুক্ত হইয়াছিল। হত্যার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে স্তন্যদান করিয়াও পূতনা সদ্‌গতি লাভ করিয়াছিল। উপরন্তু এই লীলা বর্ণনায় ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণকে 'ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ', 'কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ'[৪] বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই বিশেষণের দ্বারা লীলার স্বাভাবিকতা প্রতিপন্ন ও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সুনিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কালিয়দমন

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি বাল্যলীলা কালিয়দমন। কালিয় নামে একটি সর্প যমুনানদীর দক্ষিণ দিকে কালিয় নামক হ্রদে বাস করিত এবং তাহার বিষে সকলের প্রাণহরণ করিত। হরিবংশে

আছে, শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে শাস্তিদানের ইচ্ছায় হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়া তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের সহচর ব্রজবালকগণ ভীত হইয়া দ্রুতগতিতে যশোদা, নন্দ ও বলরাম প্রভৃতিকে হ্রদের তীরে ডাকিয়া আনে। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া নন্দ, যশোদা প্রমুখ ব্রজবাসিগণ কাঁদিতে থাকেন। তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বলরাম বলেন—হে কৃষ্ণ, শীঘ্র বিষধর কালিয়কে দমন কর। আমাদের বান্ধবগণ তোমাকে মনুষ্য বিবেচনা করিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতেছে।[৫]

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা শুনিয়া সর্পরাজকে বধ করিতে উদ্যত হইলে কালিয় অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য প্রাণভিক্ষা চায়। তারপর সর্পরাজ তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অবিলম্বে হ্রদ ত্যাগ করিয়া সাগরে যাইতে আদেশ দেন এবং গরুড়ের ভয়ে ভীত কালিয়কে অভয় দান করেন। এইরূপে হ্রদটিকে নির্বিষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মানব ও অন্য প্রাণীদের জীবন রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা দর্শনে ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্তুতি করেন।

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কালিয়-দমন লীলার আখ্যানভাগে বিশেষ পার্থক্য নাই।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, গোপবালকদের আহ্বানে নন্দ, যশোদা, বলরাম প্রভৃতি হ্রদের তীরে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্প-রাজের দ্বারা বশীভূত এবং সর্পফণায় আবৃত হইয়াও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বলরাম ভীত ও মূর্চ্ছিত ব্রজবাসিগণকে আশ্বস্ত করিবার ইচ্ছায় 'স্বীয় সঙ্কেতে' শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—

"ত্বমস্য জগতো নাভিররাণামিব সংশ্রয়ঃ।
কর্তাপহর্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যং ত্বং ত্রয়ীময়ঃ॥
অবতীর্ণোঽত্র মর্তেষু তবাংশশ্চাহমগ্রজঃ॥"[৭]

অর্থাৎ তুমি এই জগতের আশ্রয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, এই

কারণে তুমিই ত্রিভুবন, তুমিই ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এর সমবায় বলিয়া ত্রয়ীময়। পৃথিবীর ভার হরণের ইচ্ছায় তুমি মর্তলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং আমি তোমারই অংশে তোমারই অগ্রজরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। পুরাণকার এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও বলিযাছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হস্তে কালিয়নাগের মৃত্যু নিশ্চিত দেখিয়া নাগপত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে থাকে [বিষ্ণু ৫।৭।৪৮] এবং পবিশেষে কালিযনাগ নিজেও স্তব করে। তাহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিযনাগের প্রাণনাশে বিরত হন এবং তাহাকে সমুদ্রে যাইতে আদেশ দিয়া হ্রদটি বিষমুক্ত করেন। অতঃপর ব্রজবাসীদের স্তবে প্রসন্ন হইযা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরিযা আসেন। দুইটি পুরাণের আখ্যান-অংশে ভাবগত পার্থক্য এই যে, হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত লীলা দর্শনে ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইযা 'আপৎসু শরণম্', 'প্রভুঃ' ইত্যাদি প্রশংসা বাক্যে তাঁহার স্তুতি করেন, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে বলরাম, নাগপত্নীগণ, কালিয়নাগ ও ব্রজবাসীদের স্তুতি হইতে স্বভাবতই মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ এই পুরাণে শুধু দেবতার স্থান অধিকার করেন নাই, তিনি 'দেবেশ', জগন্নাথ, 'ব্রহ্মাদ্যৈরর্চ্যতে' ইত্যাদি অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

বিষ্ণুপুরাণের সহিত ভাগবতের কাহিনী-অংশে এইটুকু পার্থক্য দেখা যায যে ভাগবতে কালিয-দমনকালে গন্ধর্ব, সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিযা তাঁহার স্তুতি করেন। ইঁহাদের স্তুতির কথা বিষ্ণুপুরাণে নাই। ইহা ছাড়া ভাগবতকার এই লীলা বর্ণনাকালে শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল জগতের অন্তরাত্মা 'কৃষ্ণস্য গর্ভজগতঃ', আদি পুরুষ প্রভৃতি বিশেষণে বার বার বিশেষিত করায স্বতঃই প্রতীয়মান হয যে, ভাগবতকারের দৃষ্টি ত শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিশিষ্ট দেবতাই নহেন—তিনি পরম দেবতা।

গোবর্ধনধারণ

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি বিস্ময়কর বাল্যলীলা গোবর্ধনধারণ।

হরিবংশের বর্ণনায় আছে, ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিলে শ্রীকৃষ্ণ গোযজ্ঞ ও পর্বতযজ্ঞের উপযোগিতার উল্লেখ করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিতে বলেন। ইন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাতদিন অবিরাম বৃষ্টিপাত ঘটাইলে গোপ ও গাভীগণ অস্থির হইয়া উঠে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্য উপায় না দেখিয়া গোবর্ধন পর্বতকে ছত্ররূপে ধারণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করেন। ইহাতে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দেখিয়া ব্যর্থকাম ও হতগৌরব হইয়া মেঘখণ্ডগুলি ফিরাইয়া লন। মেঘমুক্ত আকাশ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও গোবর্ধন পর্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। তাঁহার এই ক্ষমতা দেখিয়া ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও অন্য দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকেন [হরি ২।১৯।২১] এবং ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ' নামে ভূষিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, আমি থাকিতে তোমার পুত্র অর্জুনের কখনও শত্রুহস্তে পরাজয় ঘটিবে না। সে যে ভাবে বলিবে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে সাহায্য করিব[৭] দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবৎজ্ঞানে স্তবস্তুতি করিলেও তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সহচরদের কথায় কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চিত উপলব্ধির কোন পরিচয় নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তাঁহারা বলেন, হে গোবিন্দ, আমরা তোমার অতিমানবীয় কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই পর্বতধারণে তোমাকে দেবতা বলিয়া মনে হয়।[৮] দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক লীলাদর্শনে বিস্মিত ব্রজবাসিগণের মনে তাঁহার সম্বন্ধে দেবত্ববুদ্ধি জাগ্রত হইলেও তাহা তখনও বদ্ধমূল হয় নাই। তাই প্রসঙ্গটি এড়াইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আপনারা যাহা ভাবিতেছেন, তাহা আমি নই, আমি আপনাদেরই স্বজাতীয় বান্ধব।[৯]

বিষ্ণুপুরাণে কিন্তু এই ভাবটির কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনপর্বত যথাস্থানে রাখিলে ব্রজবাসিগণ বলেন—আমরা আপনাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আপনি

যাহা করিয়াছেন, সমস্ত দেবতা মিলিয়াও তাহা পারিবে না। আপনি বান্ধব, আপনাকে নমস্কার।[১০] এখানে ব্রজবাসিগণের মনে তাঁহার দেবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহারা তাঁহাকে দেবতা, এমন কি, একজন প্রধান দেবতা বলিযা প্রণাম জানান। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ হরিবংশে যেমন ব্রজবাসিগণকে 'আমি তাহা নহি' বলিয়া বিদায় দিযাছেন, বিষ্ণুপুরাণে তেমনটি পারেন নাই। ব্রজবাসিগণের বিশ্বাস বদ্ধমূল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমার সহিত তোমাদের যে সম্বন্ধ, যদি তোমরা তাহাতে লজ্জিত না হও, যদি তোমরা গৌরববোধ করিযা থাক এবং যদি তোমাদের প্রীতি থাকে, তবে আমি কে, এই বিচারে কি প্রয়োজন? তোমরা আমাকে বন্ধু জ্ঞান কর। আমি দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ কিছুই নহি, আমি তোমাদের বান্ধবরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।[১১] শেষ অংশটির তাৎপয লক্ষণীয।

ভাগবতের গল্পাংশে বিশেষ কোন পরিবর্তন নাই, কিন্তু কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবানরূপে তাঁহাদের মধ্যে বিরাজমান, এই বিশ্বাস ব্রজবাসীদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায প্রকট, সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণরূপ অদ্ভুত লীলা দেখিযা তাঁহাদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয নাই। অবিরাম বৃষ্টির তাডনায উৎপীড়িত ব্রজবাসিগণ কম্পিত দেহে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বলেন—এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন, আমি ইহার আশ্রয ও প্রভু। অতএব তোমাদিগকে রক্ষা করিব।[১২] তারপর গোপগণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন যথাস্থানে রাখিলে তাঁহারা মোটেই আশ্চর্যান্বিত না হইযা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'সস্নেহমপূজয়ন্মুদা', আর স্বর্গে দেবগণ ও সিদ্ধ গন্ধর্বগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকেন।

রাসলীলা

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল ঐশ্বর্যপ্রধান লীলা ছাড়া মাধুর্যপ্রধান লীলা আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, প্রধান তিনখানি বৈষ্ণব-

পুরাণের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে স্বয়ং ভগবানে পরিণত হইয়াছেন। রাস শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা মাধুর্যমণ্ডিত লীলা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, রাসলীলাকেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ লীলা বলিয়া মনে করেন; হরিবংশে ইহা 'হল্লীসক ক্রীড়া' নামে উল্লিখিত। এই লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে সেখানে বলা হইয়াছে যে, কিশোর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গোপ বালকদের সহিত আনন্দে বিহারে প্রবৃত্ত হন। (হরি ২।২০।১৫) গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও মধ্যস্থলে, কখনও পার্শ্বে রাখিয়া হল্লীসক নৃত্যের প্রণালীতে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণভাবে বিভোর হইযা পড়ে। নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিযাও তাহাদের তৃপ্তি হয না। গোপীরা মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনের নিষেধ অমান্য করিয়া রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে থাকেন।[১৩]

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইযাছে, গোবর্ধনধারণ লীলার শেষে ব্রজবাসিগণ স্বগৃহে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত গাহিতে থাকেন। গোপীগণ সেই সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইযা গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমবেত হইলে শ্রীকৃষ্ণ 'রাসমণ্ডলী' রচনা করেন। রাস আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ রাসের উপযুক্ত সঙ্গীত গাহিতে থাকেন এবং গোপীরা বার বার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া 'অনুলোম ও প্রতিলোম' গতির দ্বারা তাঁহার ভজনা করেন। সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে অশুভনাশী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই রাসলীলায সকল গোপীই যোগদান করিতে পারেন নাই; যাঁহারা গুরুজনের ভয়ে ঘরে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহারা তন্ময়ভাবে, কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ও নামগান করিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ পরব্রহ্মরূপী জগৎকারণ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষলাভ করেন।

হরিবংশে হল্লীসক বা রাসলীলার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাকে প্রাকৃতলীলা বলিয়াই মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণে কিন্তু এই লীলা কেবল প্রাকৃত লীলা নহে, ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ দেখিতে পাওযা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণাতেই বিষ্ণুপুরাণকার এই লীলার অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনের জন্য শেষ দুই শ্লোকে রাসলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈশ্বর ও সর্বভূতের আত্মস্বরূপ' এবং পঞ্চমহাভূতের মত সর্বব্যাপী বলিয়াছেন।[১৪] এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় রাস আধ্যাত্মিক লীলার স্তরে উন্নীত হইযাছে। এই ভাবের চরম বিকাশ দেখা যায ভাগবতপুরাণে। সেখানে রাসলীলা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম, সর্বজীবের অন্তর্যামী; ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার এই রাসলীলা। আর এই লীলার সহচরী গোপাঙ্গনাগণও প্রাকৃত নায়িকা নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণগতপ্রাণা। তাঁহার আরাধনা তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ; তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমময় মিলন সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই কারণে তিনি 'নিরবদ্যসংযুক্' বলিযা অভিহিত হইয়াছেন। শ্রুতিগণ জ্ঞানকাণ্ডে যেমন পরমেশ্বর-দর্শনে পরিপূর্ণচিত্ত হইয়া কামনা ত্যাগ করেন, ব্রজাঙ্গনাগণও তেমনি কামনাশূন্য হইয়া বাঞ্ছিত লাভে আপ্তকাম হন।[১৫]

বস্ত্রহরণ

এই ভাবে হরিবংশের প্রাকৃতলীলা বিষ্ণুপুরাণের মধ্য দিযা ভাগবতে আধ্যাত্মিক লীলার চরম স্তরে উন্নীত হইয়াছে। ভাগবতে রাস যে প্রাকৃতলীলা নয়, পরন্তু আধ্যাত্মিক লীলা, তাহা এই লীলা বর্ণনার পূর্বে পরিকল্পিত বস্ত্রহরণ লীলায আভাসিত হইযাছে। এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নীব্রত-পরাযণা গোপকুমারীদের বস্ত্রহরণ করেন এবং তাহাদের চরম লজ্জার মধ্যে ফেলিয়া অপহৃত বস্ত্র প্রত্যর্পণ করেন। নগ্নতা সৃষ্টি এই লীলার উদ্দেশ্য নয়। ইহার

তাৎপর্য পরম আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত। ভগবানকে পাইতে হইলে যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হয়, নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা পরিত্যাগের মধ্য দিয়া ভাগবতকার তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই লীলা হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে নাই। ভাগবতের যুগে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানরূপে পূজিত হইতে থাকেন বলিয়াই ভাগবতে এই লীলার অবতারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাগবতকার রাসলীলার প্রারম্ভে এই রূপক লীলার অবতারণা করিয়া ভক্ত-সাধককে রাসলীলার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছেন।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কেবল ভগবত্তাই প্রতিষ্ঠিত হয নাই. সেই ভগবত্তা যে পরম মাধুর্যমণ্ডিত, তাহাও এই লীলাগুলির মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কালিয়দমন, পূতনাবধ প্রভৃতি ব্রজলীলায শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যস্বরূপের প্রকাশে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে ব্রজবাসিগণের মনে ভয় ও বিস্মযের সৃষ্টি হইযাছে ; তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের মধুর সম্পর্ক ক্ষুন্ন হইযাছে। কিন্তু ভাগবতে এই সমস্ত লীলায় ঐশ্বর্যের পূর্ণপ্রকাশ সত্ত্বেও নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতির সহিত তাঁহার স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক আদৌ সঙ্কুচিত হয় নাই। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তির প্রকাশ ব্রজবাসিগণের সহিত তাঁহার সম্পর্কে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ভাগবতে তাই কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্য মাধুর্যমণ্ডিত। তিনি মাধুর্য-সর্বস্ব স্বয়ং ভগবান।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণলীলা

ভাগবতের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতেই পববর্তী কালে আরও দুইখানি পুরাণে—ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা বর্ণিত হইযাছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পূতনাবধ প্রসঙ্গে দেখা যায, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত পূতনা গোপীদের সমক্ষেই গোলোকে গমন করে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বযং ভগবান, তাঁহাকে শত্রুরূপে ভজনাতেও যে মুক্তিলাভ হয়, তাহাই এস্থলে মূল বক্তব্য। পুরাণকারের এই বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনে। এই

কাহিনীতে দেখা যায়, হরিকে গ্রাস করামাত্র দুরাত্মা নাগ কালিয়ের কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ হইয়া যায় এবং কালিয়নাগের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তাহার পত্নী সুবলা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে এবং তাহাকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রাখিবার প্রার্থনা জানায়—হে কৃষ্ণ, সালোক্যাদি মুক্তি আমি চাই না, তোমার পদসেবাই আমার একমাত্র কাম্য।[১৬] শ্রীকৃষ্ণের বরে সুবলা এবং কালিয়নাগের অন্য পত্নীগণও গোলোকে গমন করে। কালিয়ের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও আশীর্ব্বাদ করেন। এখানে আরও একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে আছে, কালিয়হ্রদে ঝাঁপ দিবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় নাই। ইহাতে ব্রজবালকগণ ব্যস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া তাঁহার মাতাপিতাকে সংবাদ দিলে বলরাম 'স্বীয় সঙ্কেতে' শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার দেবত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া এই লীলা সংবরণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সুতরাং তাঁহার বিপদের আশঙ্কা কোথায়, এই বলিয়া বলরাম গোপদের আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন—যিনি অনন্তরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন; যিনি শঙ্কররূপে সকলের সংহারকর্তা এবং যিনি স্বয়ং জগৎসমূহের বিধাতা, সেই পরমেশ্বরের আবার বিপদ কী? যাঁহার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, সেই মহাবিষ্ণুর নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ভয় কি?[১৭]

এই পুরাণে গোবর্ধনলীলা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—গোপগণের ইন্দ্রযজ্ঞের সময় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মুনি ও গোপগণ তাঁহাকে স্তুতি করিয়া রত্নসিংহাসনে বসাইলে[১৮] শ্রীকৃষ্ণ নন্দ প্রভৃতি গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র দধীচির অস্থি-নির্মিত অমোঘ বজ্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া সেই অস্ত্র স্তম্ভিত করেন এবং তাঁহার ইচ্ছাক্রমে মেঘ ও বায়ু স্তব্ধ হয়। কেবল তাহাই নহে, হরি কর্তৃক স্তম্ভিত ইন্দ্র সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময়

দেখিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[১৯] এই বিবরণের বিশেষত্ব এই যে, প্রাচীন পুরাণগুলিতে বলা হইয়াছে, গোবর্ধন-ধারণে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া বিমোহিত গোপগণ তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। আর এই পুরাণটিতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গোপগণ দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসান।

ইহা ছাড়া এই পুরাণের বস্ত্রহরলীলারও একটি বিশেষত্ব দেখা যায়। ভাগবতে বস্ত্রহরণের কাহিনী থাকিলেও 'রাধা' নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেখা যায় যে, রাধার স্তবে তুষ্ট হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত গোপীদের বস্ত্র ফিরাইয়া দেন।

পদ্মপুরাণে কৃষ্ণলীলা

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ন্যায় একই ভাবে ভাবিত (অধুনা-প্রচলিত) পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা বর্ণনায় এই সকল বিশেষত্ব লক্ষিত হয়: শ্রীকৃষ্ণের মাতৃগর্ভে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেবগণ কর্তৃক দেবকীস্তুতি এবং বিশেষভাবে বাসুদেবের কৃষ্ণস্তুতি, গোবর্ধনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতাদর্শনে ইন্দ্র কর্তৃক কেবল শ্রীকৃষ্ণের নহে সমস্ত ব্রজবাসীর স্তুতি,[২০] রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী গোপীরা সামান্য মানবী নহে—রামরূপী কৃষ্ণের বরে গোপীজন্মপ্রাপ্ত দণ্ডকারণ্যের মুনিঋষি,[২১] বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হইলেও অপ্রকটভাবে তিনি/বৃন্দাবনে নিত্যই লীলাময়। এই পুরাণের উত্তরখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন ও দোললীলার বর্ণনাও পাওয়া যায়।[২২] হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণ ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' মতবাদের ভিত্তিকেই প্রশস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে। এই দুই পুরাণে নানাবিধ অলৌকিকতার সংযোগে এই দৃষ্টিভঙ্গিই চরমে পৌঁছিয়াছে। তবে

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা কেবল ঐশ্বর্যাত্মক নয়, তাহা পরিপূর্ণ মাধুর্যেও মণ্ডিত। এই তত্ত্বও এই দুই পুরাণে নানা আকারে বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় এবং পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত ঝুলন ও দোললীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যস্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।[২৩]

হরিবংশ হইতে পদ্মপুরাণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার ক্রমপরিণতির ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যস্বরূপ কিভাবে ক্রমশঃ গৌণ হইয়া মাধুর্যস্বরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে—কিভাবে ব্রজবাসীদের মনে ভয় ও বিস্ময় হ্রাস পাইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ হওয়া যে খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাহা Rudolf Otto তাঁহার The Idea of the Holy নামক গ্রন্থের 'The Element of Fascination' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন: "The qualitative content of the numinous experience to which the 'mysterious' stands as form, is in one of its aspects the element of daunting 'awfulness' and 'majesty'........ it has at the same time another aspect, in which it shows itself as something uniquely attractive and fascinating. These two qualities, the daunting and the fascinating, now combine in a strange harmony of contrast, and the resultant dual character of the numinous consciousness, to which the entire religious development bears witness, at any rate from the level of the 'daemonic dread' onwards, is at once the strangest and most noteworthy phenomenon in the whole history of religion."[২৪]

গ্রন্থকার 'Love', 'Mercy', 'Pity', 'Comfort' প্রভৃতিকে non-rational, attractive and fascinating aspect-এর

element (উপাদান) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে লেখক ভগবানের ঐশ্বর্য (element of daunting awfulness) এবং মাধুর্য গুণের (attractive and fascinating aspect) সমন্বয়ের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় 'daunting aspect of the numen' (ঐশ্বর্যরূপ) ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া তাঁহার 'fascinating and attractive element' (কান্তরূপই) প্রবল হইয়া উঠে ; ভক্ত তাঁহার কান্তরূপের প্রতিই ক্রমশঃ আকৃষ্ট হন। ঈশ্বর তখন তাঁহার কাছে প্রিয়ের প্রিয়, অন্তর হইতে অন্তরতর, অন্তরতম প্রিয়তমরূপে আবির্ভূত এবং সাধক এক অনির্বচনীয় আনন্দঘন অবস্থায় উত্তীর্ণ।

চৈতন্য ও তৎপূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্ম

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ-উপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতে পরিণতি লাভের পর ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাধনায় তাহা নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূল ভিত্তি ভাগবত অর্থাৎ কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান, পরকীয়া-রতিপুষ্ট প্রেমভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ভাগবতের এই সাধনার ধারাই চৈতন্যযুগে অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে ভাগবতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। ভাগবতে গোপীগণ শ্রেষ্ঠ সাধিকা বলিয়া স্বীকৃত এবং একজন গোপী অত্যন্ত প্রিয় হইলেও রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ সেখানে নাই। অথচ চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মে শ্রীরাধা শুধু শ্রেষ্ঠতম সাধিকাই নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি এবং যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আরাধ্যা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার এই অবিচ্ছেদ্য যোগের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, চৈতন্যদেবের পূর্বেই বাংলাদেশে জয়দেবের গীতগোবিন্দে, উমাপতি ধরের রচনায় এবং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে

রাধাকৃষ্ণলীলা অপূর্ব আবেগে ও শিল্পসৌন্দর্যে কীর্তিত হইয়া আসিতেছিল এবং চৈতন্যদেব-প্রচারিত মতবাদ যে, এই সকল উপাদান হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ চৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"[২৫]

এই সব কবির কাব্য ছাড়াও মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতমহাপ্রভু প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাংলার প্রেমভক্তি-সাধনার সূত্র .ত হয়।[২৬] বস্তুতঃপক্ষে মাধবেন্দ্রপুরীই যে বাংলা-দেশে প্রেমভক্তিসাধনার প্রবর্তক, তাহা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের বাল্যকালে তাঁহার তিরোধান ঘটিলেও তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুকে প্রেমভক্তি-সাধনায় দীক্ষা দেন। এই ভাবে প্রেমভক্তির সাধনায় দীক্ষিত হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাকে বিশেষত্বে মণ্ডিত করেন এবং তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সাহিত্য প্রাক্‌চৈতন্য যুগে

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার এই ক্রমপরিণতি আলোচনার পব পৌরাণিক যুগ হইতে চৈতন্য-পরবর্তী যুগ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত সাহিত্যেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ মূলতঃ এইসব সাহিত্যের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার ক্রমবিবর্তনের ইঙ্গিত, শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য ও তাহার তাত্ত্বিক বিশেষত্ব নিহিত।

শ্রীকৃষ্ণ একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতায় পরিণত হওয়ার পর পৌরাণিক যুগ হইতে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচিত

হইতে থাকে। এই সব রচনার মধ্যে হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত এবং পদ্মপুরাণের উল্লেখ ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বের ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণের মধ্যে ব্রহ্ম, বায়ু, স্কন্দ, বামন ও কূর্মপুরাণেও কৃষ্ণলীলার বিবরণ পাওয়া যায়।

এই সব পুরাণ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় আলোয়ার সাধকদের দিব্যসূক্তিতে, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে এবং ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং তাঁহার লীলামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাঁহার সাধনার তাৎপর্য উপলব্ধিতে দক্ষিণ ভারতীয় এই সব রচনা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

এই সব ধর্মমূলক সাহিত্যের উপাদানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অবলম্বনে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে যে মৌলিক কাব্য ও প্রকীর্ণ কবিতা রচিত হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় রচনার মধ্যে হালের গাথাসপ্তশতীর উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভাসের বালচরিত এবং সদুক্তিকর্ণামৃত, ধ্বন্যালোক, প্রাকৃত পৈঙ্গল প্রভৃতিতে উদ্ধৃত প্রকীর্ণ কবিতাও উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও চৈতন্য-পূর্ব যুগ হইতেই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য রচিত হইতে থাকে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলা গভীর আন্তরিকতা ও আবেগের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য। এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণের বসন্তকালে অনুষ্ঠিত রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের অনুরূপ পরিস্থিতি বহুস্থলে দেখা যায়। জয়দেবের পরে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য। এই কাব্যে দানখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড প্রভৃতি তেরটি খণ্ডে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা ছাড়া আর

যে সব লীলার উল্লেখ কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে করিয়াছেন, প্রাচীন পুরাণগুলিতে সেগুলি দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীও স্মরণীয়। তবে এই সব রচয়িতা মুখ্যতঃ কবি, গৌণতঃ তত্ত্বদ্রষ্টা। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীতে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টির যে উপাদান নিহিত, তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই ইঁহারা কাব্য রচনা করেন। চৈতন্যদেব তাঁহার ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে এই কবিদের কাব্য আস্বাদন করিতেন বলিয়া তাঁহার চরিত-কথায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার ফলেই পরবর্তী কালে এই সকল কবি বৈষ্ণব সাধককবিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হন। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনচরিত লইয়া বাংলার কল্পনাকুশল কবিগণ কাব্যনাটক রচনা করিযাছেন। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে কৃষ্ণলীলা-বিযযক আর একখানি কাব্য রচিত হয়। ইহা মহাপ্রভুকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই কাব্য মালাধর বসু রচিত ভাগবতের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয়। ইহাতে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের আখ্যাযিকাভাগের আদ্যন্ত বর্ণনা ও দ্বাদশ স্কন্ধের তত্ত্বাংশের ভাবানুবাদ আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা ভাষায় ভাগবতের প্রথম অনুবাদ হইলেও ইহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে। কবি কোন কোন স্থলে মহাভারত, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতেও সাহায্য লইযাছেন। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা প্রাধান্য লাভ করিলেও মাধুর্যলীলা একেবারে বর্জিত হয নাই, বরং রাসলীলা বর্ণনায় গ্রন্থকার অপূর্ব কবিত্বশক্তিরই পরিচয দিয়াছেন।

ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সাহিত্যের চরম বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটে বঙ্গদেশে চৈতন্যযুগে। চৈতন্যদেবের প্রেরণায কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দিকের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে কাব্য, নাটক, দর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্রের যে বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তেমনটি ইতিপূর্বে আর কোনও অঞ্চলে, কোনও কালেই হয় নাই। এই বিপুল রচনা একদিকে যেমন সাহিত্য হিসাবে

উপভোগ্য, অন্যদিকে তেমনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের রসব্যাখ্যারূপেও আস্বাদ্য।

চৈতন্যোত্তর যুগে

চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলাভাষায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : ১। পদাবলী সাহিত্য ২। ভাগবতের অনুবাদ ও কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য ৩। তত্ত্বসাধন-বিষয়ক নিবন্ধ।

চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় পদকর্তা জ্ঞানদাস; তিনি বাংলা এবং ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। এই সব পদ ভাবের নিবিড়তায় ও প্রকাশভঙ্গীর অনাড়ম্বর সাবলীলতায় সমৃদ্ধ। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ও উত্তরসাধক বলিয়া পরিচিত।

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। ইনি জ্ঞানদাসের সমসাময়িক; রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রচারের উদ্দেশ্যেই গোবিন্দদাস আপনার অলোকসামান্য প্রতিভা নিয়োজিত করেন।

ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলরামদাসের কবিত্ব নির্ঝরিণীর ধারার মত স্বতঃ-উৎসারিত। বাৎসল্যরসের বর্ণনায় ইনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পদাবলী সাহিত্য ছাড়া চৈতন্য ও তৎপরবর্তী যুগে ভাগবতের অনুবাদ এবং ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবপুরাণ ও লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে প্রচুর কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যও রচিত হয়। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চৈতন্যসমসাময়িক রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। ইহা সমগ্র ভাগবতেরই অনুবাদ। তবে ইহার দশম স্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ব্রজবাসিগণ কর্তৃক গোবর্ধন পূজা এবং অন্নকূট মহোৎসব বর্ণিত হইয়াছে।

এই সমস্ত কাব্য ছাড়া চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব

ও সাধনবিষয়ে অনেক নিবন্ধ রচিত হয়। এই সব নিবন্ধ-রচয়িতাদের মধ্যে নরোত্তমদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতায় পরিণত হওয়ার পর তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচিত হয়। সেই সাহিত্যের একটি ধারা পুরাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া চৈতন্যযুগ পর্যন্ত কিভাবে প্রবাহিত, তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সাহিত্যের আর একটি ধারা, পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-পদ্ধতির নির্দেশাত্মক আগমগ্রন্থ এবং ভাগবতের স্তবের অনুকরণে রচিত স্তবমালা। এই আগমগ্রন্থ সংহিতা, পঞ্চরাত্র এবং তন্ত্র—এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই আগম-সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছিন্ন লীলার সংহতিসাধন, প্রকট লীলাকে অপ্রকটলীলার পর্যায়ে উন্নীত করিয়া সাধন-ভজনের আনুষঙ্গিক-রূপে উপস্থাপন, ব্রজলীলার সার যে রাসলীলা তাহা প্রতিপাদন, যুগলরূপে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কথন, ঐশ্বর্যলীলাকে মাধুর্যলীলার অঙ্গরূপে বর্ণন এবং গোপবেশী শ্রীকৃষ্ণে একান্ত আত্মসমর্পণ।

ইহা ছাড়া ভাগবতের ব্রহ্মা (২৭), নারদ (২৮), কুন্তী (২৯) ও গোপীদের (৩০) স্তবের অনুকরণে পরবর্তী কালে স্তব ও স্তোত্রমূলক সাহিত্যও গড়িয়া উঠে।

এইসব আলোচনার উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিক যুগ হইতে ধীরে ধীরে তাঁহার অলোকসামান্য ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের গুণে ভগবত্তার স্তরে উন্নীত হইয়া জ্ঞানী, যোগী, সাধক ও ভক্তের হৃদয়ে এক মহিমময় মূর্তিতে বিরাজমান।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১। ভাগবতপুরাণ—১।৪।২৮, ৩০, ৩১ ; ১।৫।৫, ৮-১০, ২১
২। হরিবংশ—২।৬।৩২
৩। ভাঃ পুঃ—১০ ৬।৩৪-৩৫
৪। ঐ—১০।৬ ৩৯
৫। হরিবংশ—২।১২।৩০
৬। ঐ—২।১২।৪৬
৭। বিষ্ণুপুরাণ—৫ ৭।৩৬,৩৮
৮। হরিবংশ—২।২০।৪
৯। ঐ—২।২০।১১
১০। বিষ্ণুপুরাণ—৫।১৩।৫ — ৮
১১। ঐ—৫।১৩।১০—১২
১২। ভাঃ পুঃ—১০।২৫।১৮
১৩। হরিবংশ—২।২০।২৪ — ২৮
১৪। বিষ্ণুপুরাণ—৫।১৩।৬০ — ৬১
১৫। ভাঃ পুঃ—১০।৩২।১৩, ২২ ; ১০।৩৩।২৮, ৩৫—৩৬
১৬। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৯।৫১
১৭। ঐ — ঐ ১৯।১৪৬—১৪৭
১৮। ঐ — ঐ ২১।৪৩
১৯। ঐ — ঐ ২১।১৭১
২০। পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড ২৬৫ অধ্যায়
২১। ঐ—পাতালখণ্ড ৫২।৪
২২। ঐ—উত্তরখণ্ড ৫২।৪৮, ৫০ — ৫২
২৩। S. K. De—Early History of the Vaisnava faith & movement in Bengal (1942) Page-9
২৪। Rudolf Otto—The Idea of the Holy (1946) 10th impression Page 31
২৫। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য ২
২৬। এস. কে. দে—তদেব—পৃঃ ১৮
২৭। ভাঃ পুঃ—১০।১৪
২৮। ঐ—১০।৩৭
২৯। ঐ—১৮
৩০। ঐ—১০।৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

লীলা

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ভারতীয় সাধনার বিবর্তনের ফলে পাঠকের চিত্তে গোপনায়কের স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে দেবতার স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, কিভাবে তাঁহাতে ভগবত্তা আরোপিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিভিন্ন লীলা পৌরাণিক যুগ হইতে চৈতন্যযুগে প্রাকৃত লীলা হইতে অপ্রাকৃত লীলায় পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল লীলার প্রকারভেদ ও যথাসম্ভব প্রত্যেকের তাৎপর্য বর্ণনাই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। তৎপূর্বে পরমারাধ্য দেবতার নররূপে আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতির অভিমত এবং লীলা শব্দটির আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি ও নরলীল :

শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রার্থনা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥"[১]

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মানুষের আকৃতি ও মানুষের ন্যায় লীলা। মহাপ্রভুর এই উক্তি উপনিষদ্ ও পুরাণ-সাহিত্যে সমর্থিত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমারাধ্য দেবতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ'[২] অর্থাৎ জীব সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ হস্তপদাদিযুক্ত পুরুষাকার আত্মা (বা বিরাট) রূপেই ছিল। বিষ্ণুপুরাণও পরব্রহ্ম বিষ্ণু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

(ক) "যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরং ব্রহ্ম নি (ন) রাকৃতি ॥"

(খ) "ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ।
ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাস্তস্য নিশাময় ॥"[৩]

অর্থাৎ বিষ্ণু নামে নরাকৃতি বা নিরাকার পরম ব্রহ্ম যে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই যদুবংশের কথা শ্রবণ করিলে মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণু ব্যক্ত ব্রহ্ম ; পুরুষ ও কাল তাঁহার অব্যক্ত স্তর। সেই বিষ্ণুর লীলার ইচ্ছা বালকের চেষ্টার ন্যায় জানিবে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, বিষ্ণুপুরাণ পরব্রহ্মকে শুধু নরাকৃতি বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার গতিবিধিও যে মানুষের মত, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাগবতপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম বা পরম দেবতা। তিনিও যে নরাকৃতি তাহা উদ্ধবের উক্তিতে প্রকাশিত—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥"[৪]

ভগবান স্বীয় চিৎ-শক্তির সামর্থ্য দেখাইবার জন্য যাঁহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই নরাকৃতি শ্রীমূর্তিতে ঘটিয়াছে বিচিত্র নরলীলার অতীব বিস্ময়কর সামঞ্জস্য। শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে ভাগবতের এই শ্লোকের টীকায় 'মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকম্' শব্দের অর্থ নরাকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

তাঁহার বহু পূর্বে ভক্তকবি শ্রীলীলাশুকও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবীর আশ্রয় ও নরদেহধারী[৫] বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, উপনিষদ্ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পর্যন্ত সকলের দৃষ্টিতেই পরব্রহ্ম নরাকৃতি এবং নরাকৃতি পরব্রহ্ম যে নরলীলার অনুরূপ লীলার মধ্য দিয়া আপন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও সর্বত্র স্বীকৃত।

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলার তাৎপর্য বুঝিবার পূর্বে 'লীলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিচার প্রয়োজন।

'লীলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ আলোচনায় দেখা যায়, অমরসিংহ তাঁহার অমরকোষে দুই প্রসঙ্গে লীলা শব্দটির দুইটি অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন একটি অর্থ হইল ঃ

"স্ত্রীণাং বিলাসবিব্বোকবিভ্রমা ললিতংস্তথা।
হেলা লীলেত্যমী হাবাঃ ক্রিয়াঃ শৃঙ্গারভাবজাঃ॥"

অর্থাৎ লীলা শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়া। দ্বিতীয় অর্থে লীলা 'বিলাসক্রিয়যোঃ' অর্থাৎ লীলা কেবল শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়া নহে, যে কোন প্রকার ক্রিয়া অর্থেই লীলা শব্দটি প্রযোজ্য। অমরকোষের প্রসিদ্ধ প্রামাণিক টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত বিশ্বকোষে এবং আচার্য হেমচন্দ্র অনেকার্থস গ্রহ নামক কোষগ্রন্থে লীলার প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু Monier Williams-এর সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তিনি sport, play, pastime, amusement ইত্যাদি লীলার প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রে লীলার অর্থ—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা ঃ

ভগবৎ-লীলার ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় অর্থই যে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, তাহা মনীষী বাদরায়ণের 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' সূত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায়। পরব্রহ্ম কর্তৃক জগৎসৃষ্টির কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রে এই উক্তি করা হইয়াছে—ব্রহ্মের লীলা 'লোকের লালার ন্যায় কেবল লীলা'। আচার্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যে এই সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—রাজার কোন অভাব নাই, তৎসত্ত্বেও যেমন বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র কৌতূহলে বা আমোদের উচ্ছ্বাসে তিনি নানারূপ খেলায় প্রবৃত্ত হন অথবা শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন আপাতদৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কেবলমাত্র স্বভাবের বশে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে হয়, ব্রহ্মের

লীলাও সেইরূপ কেবলমাত্র আনন্দের উচ্ছ্বাসে বা স্বভাবের বশে অনুষ্ঠিত হয়। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক শঙ্করের ন্যায় প্রপত্তিমার্গের সাধক রামানুজ বা তত্ত্ববাদী মধ্ব, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভ প্রভৃতি আচার্যগণও ভগবৎ-লীলার তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ভগবানের কোন অভাব নাই; তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞ, পূর্ণানন্দ ও পরিপূর্ণ স্বরূপ; তাঁহার ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। সুতরাং ভগবানের লীলার পশ্চাতে তাঁহার নিজের কোন কামনা নাই, কোনও প্রয়োজনবোধের প্রেরণা নাই। কেবল আনন্দের উচ্ছ্বাসে লীলার জন্যই তাঁহার লীলা।[৬]

শঙ্কর ও ভক্তিবাদী দার্শনিকদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলার পশ্চাতে তাঁহার নিজের কোন কামনা না থাকিলেও ভক্তের আনন্দবিধানের জন্যই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই সিদ্ধান্ত দার্শনিক-প্রবর শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন—পরমেশ্বর নিজের সহিত অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের পার্ষদ, দেবতা ও ভক্তদের আনন্দের জন্য 'স্বরূপ শক্তির' আবিষ্কার করিয়া নানারূপ অবতার ও লীলা প্রকাশ করেন।[৭] শ্রীজীবগোস্বামীর এই মতের সমর্থন ভাগবতপুরাণে পাওয়া যায়—

"প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥[৮]
"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥[৯]

এই শ্লোক দুইটির মধ্যে প্রথমটির অর্থ—হে প্রভু, আপনি মায়াতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দবিধানের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রাদিভাবের অনুকরণ করেন।

দ্বিতীয়টির অর্থ—তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণিমাত্রের পরমাত্মা

বলিয়া জানিও। তিনি জগতের কল্যাণের জন্ম স্বেচ্ছায় দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

তবে ভাগবতে এমন কথাও আছে, যাহা বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুকূল— "ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং

বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।"[১০]

অর্থাৎ হে ঈশ্বর, আপনি জন্মাদিবর্জিত; লীলা ছাড়া আপনার জন্মের অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধের প্রসিদ্ধ টীকা বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—ভক্তের প্রার্থনায় ভূভার-হরণের জন্যই তাঁহার অবতরণ ও লীলা।

কিন্তু দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সংসারে অবতরণের প্রসঙ্গ ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ অবতার-সমূহের ন্যায় পৃথিবীর ভারহরণাদি কার্যসাধনে আবির্ভূত হন নাই। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তখন অংশাবতারসমূহ তাঁহাতে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের ভারহরণাদি লীলা এই সকল অংশাবতারের কার্য। তাঁহাদের কার্যই ভগবানে আরোপিত হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভক্তগণের আনন্দবিধানের জন্যই জন্মাদি লীলায় প্রবৃত্ত হন।[১১] তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সেই লীলার মাধ্যমে জগৎপালনরূপ কার্য বা বিশ্বের মঙ্গল যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহা আনুষঙ্গিকরূপে অর্থাৎ আপনা হইতে সিদ্ধ হইতেছে।[১২]

লীলায় বিশ্বকল্যাণঃ

এখন জিজ্ঞাস্য, স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ লীলায় জগতের কল্যাণ কিভাবে আপনা হইতে সিদ্ধ হয়। উত্তরে শ্রীজীব একটি লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—পার্থিব জগতে দেখা যায়, ভগবৎ-মহিমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মৃদঙ্গবাদকদের সংগ্রহ করিয়া ভক্তগণ যে লীলাকীর্তন করেন, তাহাতে যেমন তাঁহাদের অমঙ্গল-

নাশের সহিত আপনা হইতেই অনভিজ্ঞ মৃদঙ্গবাদকদের মঙ্গলও সাধিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের বিলাসরূপ লীলায় আপনা হইতে জগতের কল্যাণ হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর বক্তব্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরিণত সিদ্ধান্ত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভগবৎ-লীলার তাৎপর্য সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত, কেবল বৈদান্তিকগণের নহে, পূর্ববর্তী ভক্তিবাদী আচার্যদেরও দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পার্থক্য বর্তমান্। তাঁহাদের মতে কেবল আনন্দের উচ্ছ্বাসে বা প্রেরণায় নয়, আনন্দদানের উদ্দেশ্যেও ভগবানের লীলা। ভগবান যে আনন্দের উৎস, আনন্দময় তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্বীকৃত—'এষ হ্যেবানন্দয়াতি'। (২।৭।২)

ব্রহ্মের লীলা ও মানুষের লীলায় পার্থক্য ঃ

এখন দেখা যাক, ব্রহ্মসূত্রে ভগবানের লীলাকে মানুষের লীলার ন্যায় বলা হইলেও এবং যাহার কোন অভাব নাই, সেইরূপ মানুষের লীলার সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও, মানবলীলার সহিত ব্রহ্মের লীলার সম্পূর্ণ মিল আছে কিনা। বস্তুতঃ মানুষের অধিকাংশ লীলার পশ্চাতেই থাকে প্রয়োজনবোধ বা অন্য কোন প্রেরণা, কিন্তু ভগবানের লীলার মূলে এইরূপ কোন প্রেরণা বা উদ্দেশ্য নাই। শাণ্ডিল্যসংহিতায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৩]

ভগবান যে নিস্পৃহ হইয়াই লীলা করেন, তাহা শ্রীগৌড়পাদও মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন—

'দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।'[১৪]

প্রেরণা বা উদ্দেশ্য ছাড়াও মানবলীলার মূলে মায়ার অধীনতা লক্ষণীয়। মানুষ মায়ার অধীন; তাহার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে থাকে একটা দুর্নিবার আসক্তি। এই আসক্তির বশেই মানুষের কর্মে প্রবৃত্তি। কিন্তু ভগবান মায়ার অধীশ্বর; তিনি সৃষ্টিকার্যে মায়া বা

প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলেও কখনো প্রকৃতির অধীন হন না। ভাগবতপুরাণে ভীষ্ম ভগবানের স্তবে ভগবৎ-স্বরূপের এই বিশেষত্বের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন—

"ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্‌ভবপ্রবাহঃ॥" (১।৯।৩২)

অর্থাৎ যে ভগবান যদুবংশের তিলক, অত্যন্ত বৃহৎ, যিনি পরমানন্দ-স্বরূপে বিরাজ করেন এবং কখনো কখনো লীলার জন্য সৃষ্টি-প্রবাহের মূলীভূত কারণ যোগমায়াকে আশ্রয় করেন, সেই ভগবানে আমার নির্মল মন সমর্পিত হইল।

শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলেও, তাহা জীবের ন্যায় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়াপরতন্ত্ররূপে নহে।

মানবলীলার সহিত ভগবানের লীলার আর একটি পার্থক্য—মানুষ তাহার পূর্ববর্তীদের আদর্শের অনুকরণে লীলা করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবান স্বয়ং সমস্ত আদর্শের আদর্শ, সুতরাং তাঁহার লীলার ক্ষেত্রে কোন আদর্শ অনুকরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বৈদান্তিক বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠলাচার্য তাঁহার 'বিদ্বন্মণ্ডন' নামক গ্রন্থে ইহার সমর্থনে বলিযাছেন—ভগবানের রাস প্রভৃতি লীলা যদি কেবল অনুকরণ হইত, তাহা হইলে মানবলীলায় প্রিয়জনের বিরহে যেরূপ দুঃখ-ক্লেশ প্রভৃতি দেখা যায়, তাঁহাব ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখা যাইত! কিন্তু তিনি পূর্ণ, জ্ঞানময়, পরমানন্দস্বরূপ। এই স্বরূপের ব্যতিক্রম কখনও ঘটিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাব লীলাকে অনুকরণ বলা অসঙ্গত।[১৫]

ভগবৎ-লীলার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা মানবলীলার ন্যায় পক্ষপাতদুষ্ট নয়। কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি লীলা করেন না। এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, দৈত্যবধ প্রভৃতি লীলায় ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ এবং দৈত্যদের প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ পায় কি না। আপাতদৃষ্টিতে দৈত্যবধ প্রভৃতি

লীলা পক্ষপাতমূলক মনে হইলেও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই ধরণের লীলায় তিনি দৈত্যদের নিগ্রহ করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কল্যাণই সাধন করিয়াছেন।[১৬] উদাহরণ-স্বরূপ পূতনা ও কালিয়নাগের কথা বলা যাইতে পারে। ইহারা কৃষ্ণের দ্বারা নিগৃহীত হইলেও সেই নিগ্রহের ফলেই তাহাদের মুক্তিলাভ সম্ভব হইয়াছে। আরও, স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।'[১৭] আচার্য শঙ্কর ও মধুসূদন সরস্বতী 'সুহৃদ্' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষঃ সন্নুপকারী'। অতএব ভগবান যদি জীবমাত্রেরই শরণ ও সুহৃদ্ হন, তাহা হইলে তিনি কাহারও সুহৃদ্, কাহারও শত্রু হইতে পারেন না। ইহা ছাড়া ভগবান প্রাকৃতজনের ন্যায় সুখদুঃখ, রাগদ্বেষের অধীন নন; আর বৈষ্ণবগণের মতে তাঁহার লীলাও স্বরূপশক্তির বিলাসমাত্র। সুতরাং ভগবানের লীলাকে মানব-লীলার ন্যায় কোনরূপেই পক্ষপাতদুষ্ট বলা চলে না।

মানবলীলার সহিত ভগবানের লীলার আর একটি পার্থক্য এই যে, মানুষের যে কোন কার্যের সহিত তাহার ফলভোগ অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। কর্ম যে প্রকারেরই হউক না কেন, তাহার ফল মানুষকে ভোগ করিতেই হয়। কিন্তু ভগবৎ-লীলার ক্ষেত্রে এই ফলভোগের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

লীলার বাস্তবতা:

এই সকল বিচারে ভগবৎ-লীলার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইলেও অনেকেই তাহাকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতে পারেন। এই কুণ্ঠার কারণ ভগবানের লীলায় আমাদের বিচারবুদ্ধির অতীত অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ। আসল কথা এই যে, আমাদের সীমিত বিচারবুদ্ধিতে ভগবৎ-লীলার তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহাকে অবাস্তব ও অসম্ভব মনে করার কোন কারণ নাই। এই বিশ্বের বিচিত্র

রহস্য আজ নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার নিকট যেভাবে উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহাও সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির অগম্য। সেই কারণে বিজ্ঞানীদের এই সব বিস্ময়কর আবিষ্কারকে যেমন আমরা অসম্ভব ও অবাস্তব বলিতে পারি না, তেমনই অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের বিচিত্র কার্যকলাপ সীমিতবুদ্ধি মানবের কাছে অবাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, যে সকল ভক্তসাধক সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেব নিকট ভগবৎ-লীলার এই তথাকথিত অলৌকিকতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বাস্তব বলিয়াই মনে হয়। এই কারণেই Shakespeare বলিয়াছেন—"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."

আসল কথা সত্যের যথার্থ উপলব্ধি সাধনাসাপেক্ষ, সে সত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হউক অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই হউক। এক্ষেত্রে আরও স্মরণীয় যে, ভগবানের লীলা অবাস্তব হইলে যুগ যুগ ধরিয়া অগণিত নরনারী তাহা আস্বাদন করিয়া কখনই এমন পরিপূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না; ব্যাসদেবের মত সত্যসন্ধ ঋষি-কবিও ভাগবতকথাকে বেদরূপ কল্পতরুর অমৃতময় ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভক্ত ভাবুকগণকে উহা সকল সময় আস্বাদনের নির্দেশ দিতেন না—

> "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
> শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
> পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
> মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"[১৮]

লীলার নিত্যত্ব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্বরূপ এবং বাস্তবতা আলোচনার পর আমরা সেই লীলার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা করিব। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, তাঁহার লীলাপ্রবাহ অবিরাম চলিতেছে। তাই গর্গসংহিতায় দেবগণের স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে 'কৃত্যনিত্যবিহার-লীল' অর্থাৎ নিত্য লীলাবিলাসী বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্য লীলাপরায়ণ, তাহা ভাগবতপুরাণেও উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবতে দশম স্কন্ধের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্॥"[১৯]

ইহার অর্থ—যিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; যাদবশ্রেষ্ঠগণই যাঁহার সভাসদ; যিনি নিজের বাহুবলে অধর্মের নিরসন করিয়া বৃন্দাবনের তরু-গুল্ম এবং পশু-পক্ষীকেও ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; যিনি ব্রজগোপীদের কামবর্ধক এবং মানুষের অন্তর্যামী সেই ভগবান শ্রীহরি সর্বশ্রেষ্ঠ-রূপে সর্বত্র বর্তমান।

ভগবানের স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে এই শ্লোককে অবলম্বন করিয়া শ্রীজীব ও বিঠ্‌ঠল বলিয়াছেন, ভাগবতবচনে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল—এই তিনটি ধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহারের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।[২০] ভাগবতপুরাণ ছাড়া পদ্মপুরাণ এব স্কন্দপুরাণেও ভগবৎ-লীলার নিত্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্ম-পুরাণে বলা হইযাছে. শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ যেমন নিত্য, তাঁহার লীলাও তেমনই নিত্য। নিত্যই তিনি বনে ও গোষ্ঠে গমনাগমন এবং গোচারণ প্রভৃতি লীলা করিয়া থাকেন।[২১]

স্কন্দপুরাণ হইতেও লীলার নিত্যত্বের ধারণা জন্মে:

"বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥"[২২]

শ্লোকটির অর্থ—মাধব বৃন্দাবনে বলরাম ও গোপবালকদের লইয়া গোবৎসগণের সহিত সর্বদা খেলা করেন।

এই শ্লোকে ক্রীড়্ধাতুর বর্তমান কালের প্রয়োগে লীলার নিত্যত্বই সূচিত হইতেছে।

লীলা দ্বিবিধ ঃ অপ্রকট ও প্রকট

সুধীগণের মতে নিত্য লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুইপ্রকার—অপ্রকট ও প্রকট। যে লীলা কখনও লোকচক্ষুর গোচরে অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা অপ্রকট লীলা আর যে লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি করুণায় লোকচক্ষে প্রকাশিত হন, তাহা প্রকট লীলা। শ্রীজীবগোস্বামী এই দুই রকম লীলার বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বর্ণনা করিয়াছেন।[২৩]

গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক মহাশয় তাঁহার—The Philosophy of the Vaisnava Religion, Vol. I-এ শ্রীজীবের অনুসরণে মন্তব্য করিয়াছেন—"The eternity of Lila means that its flow is incessantly going on, subject to no limitation of time and space, and in the manifest aspect of the Lila, if in the midst of the self-same characteristic of transcendency over time and space limitation, there is the appearance of Krisna's taking birth and the like—there is the display of the limited acts like beginning, mediating and termination, all this is surely to be regarded as owing to the inconceivable willforce of the Lord Krishna."[২৪]

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—প্রকট লীলা অনুষ্ঠানমূলক, অপ্রকট লীলা অভিমানমূলক।

এই উক্তিগুলি হইতে শ্রীকৃষ্ণের দুই রকম লীলার যে পার্থক্য দেখা যায় নিম্নে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

অপ্রকট লীলায় সাংসারিক লোক ও বস্তুর মিশ্রণ নাই। ইহার ধাম, বস্তু সমস্তই অপার্থিব। কিন্তু প্রকট লীলায় মায়িক স্থান ও মায়িক বস্তুর মিশ্রণ আছে। অপ্রকট লীলায় আদি, মধ্য, অন্ত নাই; তাহা নিত্য প্রবহমান। কিন্তু প্রকট লীলায় আদি, মধ্য ও অবসান আছে। তবে এই আদি, মধ্য, অবসান সময় অনুসারে নহে। ইহা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা লীলাশক্তিরই ক্রিয়া।

অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণের জন্মাদি লীলা নাই, কারণ তিনি অজ—অনাদি। জন্ম নাই বলিয়া তাঁহার বাল্যকৈশোর প্রভৃতি বয়সের পরিবর্তনও নাই। অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর। কিন্তু প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা আছে, বাল্যকৈশোর প্রভৃতি বয়সের বিভিন্ন স্তরও আছে।[২৫]

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ও প্রকট লীলার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই, কারণ অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ লীলারত। যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া জগতে লীলামাধুর্য প্রকাশ করেন, তখনই উহা প্রকট লীলা। আর সেই লীলা লোকচক্ষুর অগোচর হইলেই অপ্রকট বলিয়া গণ্য হয়।[২৬] সূর্য ও পৃথিবীর আবর্তনের দৃষ্টান্তে এই বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। সূর্য চিরবিরাজমান; কিন্তু পৃথিবীর আবর্তনের ফলে তাহা যেমন কখনও দৃষ্টিগোচর কখনও অদৃশ্য, দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে যেমন তাহার অস্তিত্ব লোপ পায় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য—তাঁহার ইচ্ছায় কখনও প্রকট, আবার কখনও অপ্রকট; অপ্রকট হইলেও লীলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ও ব্রহ্মসংহিতার টীকায় এই উভয় লীলার সমন্বয়সাধনকল্পে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যধাম বৃন্দাবনে

নিত্যপরিকরগণের সহিত নিত্য লীলারত। এই লীলার কোন বিরাম নাই। বৃন্দাবনে প্রকট লীলা লোকচক্ষুর আগোচর হইলে অপ্রকট রূপে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। তবে-যে বৃন্দাবন-লীলার শেষে মথুরালীলার কথা শুনা যায় তাহার তাৎপর্য কি? শ্রীজীব গোস্বামী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন কখনই ত্যাগ করেন না। সুতরাং মথুরালীলা বৃন্দাবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই উভয় লীলার সমন্বয়ের দ্বিতীয় যুক্তিস্বরূপ তিনি উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—অক্রূর যখন তাঁহাকে মথুরায় লইয়া আসেন, তখন গোপীগণ তাঁর বিচ্ছেদত্বঃখে অন্য কাহাকেও সুখের কারণ বলিয়া ভাবেন নাই। তাঁহাদের বিচ্ছেদ কল্পসম অনুভূত হইয়াছিল।[২৭] শ্রীজীব বলিয়াছেন, এই তুই শ্লোকে 'দদৃশুঃ' ও 'বভূবুঃ' ক্রিযার অতীতকালে প্রযোগ হইতে প্রতীয়মান হয় যে গোপীদের বিচ্ছেদ অতীতের ঘটনা, বর্তমানে বিচ্ছেদবোধ আর নাই। গোপীদের মনোভাবের এই পরিবর্তনের কারণ, তাঁহারা প্রকট লীলা হইতে অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন আর নিত্য অপ্রকট লীলায় যে বিচ্ছেদ নাই তাহা তিনি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজের হৃদয়ে অনাদিকাল বাৎসল্যমাধুরীতে বর্তমান আছেন কিন্তু সেই মাধুর্যকেই বার বার নবনবরূপে প্রকাশের জন্য তিনি ব্রজরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বিভিন্ন লীলা প্রকট করেন। এইরূপে শ্রীজীব গোস্বামী তুই প্রকার লীলার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।[২৮]

শ্রীজীব গোস্বামী প্রকট ও অপ্রকট লীলার সমন্বয় সাধন করিয়াও বলিয়াছেন যে, বিরহমিলন প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্য থাকায়

ভক্তের হৃদয়ে অপ্রকট লীলা অপেক্ষা প্রকট লীলার আবেদনই প্রবলতর।[২৯]

নিত্যপরিকরদের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় যে বিচিত্র রস আস্বাদন করেন, অপ্রকট লীলায় তাহার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই নিত্যকিশোর। কিশোর পুত্রের সংশ্রবে যতটুকু বাৎসল্য প্রকটিত হইতে পারে, অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দযশোদা কেবল ততটুকু বাৎসল্য আস্বাদন করিতে পারেন। পুত্রের বাল্য ও পৌগণ্ডকালে যেরূপ বাৎসল্যের প্রয়োজন, অপ্রকট লীলায় গোকুলে সেরূপ বাৎসল্যের অবকাশ নাই। প্রকট লীলায় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সদ্যোজাত শিশুরূপে অবতীর্ণ এবং ক্রমশঃ কৈশোরে উপনীত হন; সুতরাং প্রকট লীলায় বাৎসল্যের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য আস্বাদিত হইতে পারে। জন্মলীলা প্রকটনহেতু দাস্য ও সখ্যরসেরও অপূর্ব মাধুরী প্রকট লীলায় স্ফুরিত হইতে থাকে; কিন্তু অপ্রকটে ইহা অসম্ভব। সেইজন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকদের রচনায় প্রকট লীলার চমৎকারিত্ব নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপ পদ্যাবলী নামক কোষকাব্যে প্রকট লীলার এই চমৎকারিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহৎভাগবতামৃত, দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মাধুর্যকাদম্বিনী, কবিকর্ণপূরের কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার মাধুর্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অপ্রকট লীলা অপেক্ষা প্রকট লীলার আকর্ষণের আরও একটি কারণ এই যে, উচ্চমার্গের সাধক ভিন্ন অন্যের পক্ষে অপ্রকট লীলার উপলব্ধি সম্ভব হয় না। তাই সাধারণ মানুষের অনুভবের জন্যই অপ্রকট লীলাকে প্রকট লীলায় পরিণত করা হয়। উচ্চ-

স্তরের সাধকদের নিকট যাহা সহজ ও সরস সাধারণ মানবসমাজে তাহাই দুরধিগম্য, তাই অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলাময় হইলেও তাঁহার জন্ম প্রভৃতি বিভিন্ন লীলাকে প্রকটলীলারূপে গণ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানযোগী বা কর্মযোগী যখন জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরপ্রাপ্তি, না, কর্মমার্গে ঈশ্বরপ্রাপ্তি, না, জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়ে ঈশ্বর-প্রাপ্তি ইত্যাদি জটিল তত্ত্বের আলোচনায় এবং বহুবিধ দার্শনিক কূটতর্কের অবতারণায় ধর্মসাধনার পথটি দুর্গম ও জটিল করিয়া তোলেন, ঠিক তখনই দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে ভক্তিই ঈশ্বর লাভের উপায় এবং সর্বদা ঈশ্বরের লীলাচিন্তা ও লীলাকীর্তনের দ্বারা এই ভক্তি জন্মে—বৈষ্ণব সাধকগণ এই কথা বলেন। সাধারণের দুর্বোধ্য জ্ঞান বা কর্মযোগের জটিলতা ইহাতে নাই, আছে প্রাকৃত-জন কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা ভজন ও কীর্তনের দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিতে পারে, তাহারই নির্দেশ। সুতরাং বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি বিভিন্ন লীলা স্মরণ ও কীর্তনের দ্বারা জনসাধারণকে ভক্তিপথে ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই অপ্রকট লীলাকে প্রকট লীলারূপে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

অতএব দেখা যাইতেছে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলাময়। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আনন্দদানের প্রেরণায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় তাঁহার লীলা চলিতেছে। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ কখনও কখনও তিনি জগতে তাঁহার লীলা প্রকট করেন। এই প্রকট লীলায় তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কণামাত্র ভক্তের হৃদয় উপলব্ধি করে। কিন্তু তাঁহার অপ্রকট লীলা অব্যাহতভাবে সর্বদাই চলিতেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২১

২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—১।৪।১

৩। বিষ্ণুপুরাণ—৪।১১।২ ; ১।২।১৮

(এখানে 'বিষ্ণ্বাখ্যং' ও 'কৃষ্ণাখ্যং' এবং 'নিরাকৃতি' ও 'নরাকৃতি' দুই রকম পাঠই আছে ; বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 'কৃষ্ণাখ্যং' ও 'নরাকৃতি' পাঠই অধিকতর আদৃত। দ্রষ্টব্য—রাধাগোবিন্দ নাথ—চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৮৩)

৪। ভাগবতপুরাণ—৩।২।১২

৫। "শৃঙ্গাররসসর্বস্বং শিখিপুচ্ছবিভূষণম্।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্॥"

৬। মধ্বাচার্য 'নারায়ণসংহিতা' হইতে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—
"সৃষ্ট্যাদিকং হরের্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষতে।
কুরুতে কেবলানন্দাদ্যথা মত্তস্য নর্তনম্॥
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তস্যাখিলাত্মন ইতি॥"

৭। পরমাত্মসন্দর্ভ—৯৩ অনুচ্ছেদ

৮। ভাঃ পুঃ—১০।১৪।৩৭

৯। ঐ—১০।১৪।৫৫

১০। ঐ—১০।২।৩৯

১১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২৮ অনুচ্ছেদ

১২। পরমাত্মসন্দর্ভ—৯৩ অনুচ্ছেদ

১৩। শাণ্ডিল্যসংহিতা—পৃঃ ১(খ) শ্লোক ২৫

১৪। আগমপরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় অধ্যায়

১৫। বিদ্বন্মণ্ডন—পৃঃ ১৪৮—১৪৯
১৬। পরমাত্মসন্দর্ভ—৯৩ ও ৯৮ অনুচ্ছেদ
১৭। গীতা—৯।১৮
১৮। ভাঃ পুঃ—১।১।৩
১৯। ঐ—১০।৯০।৪৮
২০। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১১৫ অনুচ্ছেদ ; বিদ্বন্মণ্ডন—পৃঃ ১৬৪, ১৯২
২১। পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড
২২। 'বৃন্দাবনান্তরগতঃ' পদটি বৃন্দাবনের অন্তর্গত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।
২৩। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১৫৩ অনুচ্ছেদ
২৪। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ—পৃঃ ১৫৮
২৫। অপ্রকট ও প্রকট লীলার প্রকারভেদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ পরিশিষ্ট (১) অংশে দ্রষ্টব্য।
২৬। লঘুভাগবতামৃত—১।৬৬৪
২৭। ভাঃ পুঃ—১১।১২।১০-১১
২৮। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১৭৪ অনুচ্ছেদ
২৯ ঐ —১৮১ অনুচ্ছেদ

তৃতীয় অধ্যায়

অবতারতত্ত্ব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দোচ্ছল লীলাময় পরম পুরুষ। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি যে সর্বদাই প্রকট ও অপ্রকট লীলা করিয়া থাকেন, সে আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। তাঁহার এই শ্রেণীর লীলা ছাড়া আর এক প্রকার লীলাও দেখা যায়। এই লীলা তাঁহার অবতারগণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত। এই দ্বিতীয় প্রকার লীলাই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই আলোচনার পূর্বে অবতার বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা প্রয়োজন।

অবতার কথাটিকে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়। 'অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতরণম্ অবতারঃ'—অপ্রপঞ্চ হইতে অর্থাৎ অলৌকিক স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা হইতে লৌকিক অধিষ্ঠানে অবতরণের নাম অবতার। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের বিকারে নির্মিত প্রাকৃত জগৎই প্রপঞ্চ। আর এই পঞ্চভূতের অতীত যে পরব্যোম সেই অপ্রাকৃত ধাম অপ্রপঞ্চ। এই অপ্রপঞ্চ হইতে ভগবান কখনও কখনও প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তখনই তাঁহাকে 'অবতার' বলা হয়।[১]

ভগবানের অবতার অসংখ্য। এই অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভাগবত একটি শ্লোকে বলিয়াছেন—অক্ষয় সরোবর হইতে যেমন হাজার হাজার জলপ্রবাহ বাহির হয়, তেমনই সত্ত্বগুণের আকর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিবিধ অবতারের আবির্ভাব ঘটে।[২]

ভাগবতের এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে 'সত্ত্বনিধি' বলা হইয়াছে। কারণ সগুণ ব্রহ্মরূপে অবতারের যিনি উৎস, তিনি রজোমূর্তি ব্রহ্মা নহেন, তমোমূর্তি রুদ্রও নহেন, সত্ত্বমূর্তি বিষ্ণু বা শ্রীহরি। যিনি

ত্রিমূর্তি—যিনি ব্রহ্মারূপে রজোগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া পালন করেন এবং রুদ্ররূপে তমোগুণ আশ্রয় করিয়া সংহার করেন, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তা শ্রীহরির যে শুদ্ধসিদ্ধ অপাপবিদ্ধ সাত্ত্বিক মূর্তি, তাহাই অবতারের মূল কারণ।

ভাগবতপুরাণে এবং অন্য কয়েকখানি গ্রন্থে এই সকল অবতারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে ইহাদের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে জানা যায়, শক্তিবিকাশের তারতম্য অনুসারে নানা ধামে নানা উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নানা রূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার এই প্রকাশ অনন্ত। অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে একই মূর্তিতে তিনি অনন্ত স্বরূপে বিরাজিত।[৩]

অবতারের প্রকার ভেদ

এই অনন্তস্বরূপ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ।

যে-রূপ অন্যের অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই স্বয়ংরূপ।[৪] ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপ স্বয়ং ও প্রকাশ ভেদে দ্বিবিধ।

স্বয়ংরূপের সহিত যে-রূপের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু আকার (অঙ্গসন্নিবেশ), ভাব, বেশভূষা প্রভৃতির কিছুটা পার্থক্যের জন্য যে-রূপকে স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় (বাস্তবিক ভিন্ন নহে) তাহাকে তদেকাত্মরূপ বলে।[৫]

তদেকাত্মরূপ আবার দুই প্রকার—বিলাস ও স্বাংশ। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোন লীলাবিশেষের জন্য যদি অন্য আকারে প্রতিভাত হন এবং সেই অন্য আকারের শক্তি যদি স্বয়ংরূপের প্রায় সমতুল্য হয় অর্থাৎ স্বয়ংরূপ হইতে কিছু কম হয়, তবে সেই অন্য আকারকে বিলাস

বলে।[৬] বিলাসের মধ্যে তত্ত্বের (noumenon) যে-প্রকাশ তাহা phenomenon পদবাচ্য নহে। যিনি বিলাসের ন্যায় স্বয়ংরূপের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও বিলাস অপেক্ষা যাঁহার শক্তি কম, তাঁহাকে স্বাংশ বলে।[৭] এইরূপ প্রকাশে ভগবৎ-সত্তার 'phenomenal' আবির্ভাব ঘটে। স্বাংশ আবার দ্বিবিধ—পুরুষাবতার ও লীলাবতার। যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ, যিনি প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুর দ্রষ্টা, নিয়ন্তা ও প্রবর্তক, যাঁহা হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে। আর শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল অবতারে বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নিত্য নূতন কার্যকলাপ দেখা যায় তাঁহাদের লীলাবতার বলে। নিজ নিজ ধামে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ স্বাংশ ।

তদেকাত্মরূপের লক্ষণের পর আবেশরূপের লক্ষণ আলোচনা করা যাইতেছে। জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি অংশের দ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন তাঁহাদিগকে আবেশ বলে।[৮] উপনিষদের ভাষায় ইহারা তাঁহার 'ধ্যানাপাদাংশ।'[৯] ইহাদেরই বিচ্ছুরণে 'অতিমানব' বা গীতার পরিভাষায় 'বিভূতিমৎ সত্ত্বের'[১০] আবির্ভাব।

আবেশ মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ, তাঁহাকে অবতার বলে। আর যাঁহাতে শক্তির আভাসের আবেশ তাঁহাকে গৌণ আবেশ বা বিভূতি বলে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ত্রিবিধ স্বরূপের—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ-রূপের মধ্যে তদেকাত্মরূপের অন্তর্গত স্বাংশ এবং আবেশ-রূপ হইতেই প্রধানতঃ অবতারগণের উদ্ভব হয়। [১১]

ষড়্‌বিধ অবতার

এই অবতারসমূহ ছয় প্রকার—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার।

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা পরব্রহ্ম। কিন্তু তিনি স্বয়ংরূপে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য করেন না। তাঁহার অংশ—পুরুষাবতার এবং গুণাবতাররূপেই এই সকল কার্য করিয়া থাকেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অবতার—পুরুষ; ভাগবতপুরাণের উক্তি—'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য।'[১২] পুরুষাবতার তিন প্রকার—প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ, দ্বিতীয় পুরুষ বা গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ এবং তৃতীয় পুরুষ বা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টির দ্বারা মহাপ্রলয়ে সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করেন; তাহাতেই প্রকৃতি বিচলিত হন এবং সৃষ্টির সূচনা হয়। ইঁহার অপর নাম মহাবিষ্ণু। ইনি প্রকৃতি বা সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী বা নিয়ন্তা।

গর্ভোদকশায়ী পুরুষ কারণার্ণবশায়ীরই পরিবর্তিত রূপ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে জলের মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহাকে গর্ভোদকশায়ী পুরুষ বলে। ইনি ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী।

ক্ষীরোদশায়ী গর্ভোদকশায়ীর বিবর্তন। ইনি এক স্বরূপে জগতের পালনকর্তা এবং অন্য স্বরূপে পরমাত্মারূপে বা জীবের অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় পুরুষ বা ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের নিয়ামকরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে দ্বিতীয় পুরুষের গুণাবতার বলে। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু একাধারে গুণাবতার এবং পুরুষাবতার।

ব্যূহতত্ত্ব

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অবতারসমূহের মাধ্যমে যেমন একদিকে সৃষ্টি প্রভৃতি কর্মের একটি ধারা সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে, তেমনই অপর দিকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিভিন্ন

প্রকাশ অবলম্বনে আধ্যাত্মিক স্তরে একটি উপাসনার ধারা নিরন্তর চলিয়া আসিতেছে। ইহারই নাম ব্যূহতত্ত্ব। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ভগবানের এই চতুর্বিধ প্রকাশকে চারটি ব্যূহ বলা হয়। পরমাত্মাকে জীব, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কারভেদে সৃষ্টির মূল তত্ত্বগুলির এক একটির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে কল্পনাই এই তত্ত্বের মূল কথা। সঙ্কর্ষণ জীবের, প্রদ্যুম্ন বুদ্ধির ও অনিরুদ্ধ মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে কল্পিত। ভগবান বাসুদেবই চতুর্ব্যূহরূপে বিরাজমান। পঞ্চরাত্র বলেন, বাসুদেব নামে পরব্রহ্মই স্বীয় বাৎসল্য, কারুণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণরাশির বশীভূত হইয়া ভক্তগণের আশ্রয় অর্থাৎ ভজনীয় হইবার জন্যই স্বেচ্ছায় বাসুদেব প্রভৃতি চতুর্ব্যূহ মূর্তিতে প্রকাশমান। জীব, মন ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণাদি তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া বাসুদেবকে আদিব্যূহ বলা হয়। মহাভারতে[১৩] একান্তিভক্তগণের গৌরবঘোষণায় এই তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ভাগবতপুরাণের অনুকরণে বাংলার বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। ভাগবতপুরাণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়-গণের ঈশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥"[১৪]

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে[১৫] এবং শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'সর্বসংবাদিনী' নামক পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুসরণে ব্যূহতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ বলেন—পরব্যোমের অধীশ্বর মহাবস্থনামে বিখ্যাত চারটি ব্যূহের মধ্যে এই বাসুদেব আদিব্যূহ এবং হৃদয়ে উপাস্য। সঙ্কর্ষণ ইহারই স্বাংশ বা বিলাস। ইহাকে দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সকল জীব-জন্মের উৎস বলিয়া 'জীব'-ও বলা হয়। ইনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য।

এই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্তি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিতত্ত্বে প্রদ্যুম্ন বুদ্ধিমানের উপাস্য।

চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইহার বিলাসমূর্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আদিব্যূহ বাসুদেবের অংশ বা অংশাংশ নহে। ইহারা বাসুদেবেরই সমপ্রকাশ। প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অন্যনিরপেক্ষ, কেবল মাধুর্যগুণের আধিক্যবশতঃ আদিব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।[১৬]

পুরুষাবতার, গুণাবতার এবং সেই সঙ্গে ব্যূহতত্ত্বের আলোচনার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার আলোচনা করা যাইতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সকল অবতারে চেষ্টারহিত বিবিধ স্বেচ্ছাধীন কার্যসমূহ দেখা যায়, তাঁহারা লীলাবতার। এখন শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্কন্ধে লীলাবতারসমূহের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। এই পুরাণের বিভিন্ন তালিকার নাম ও সংখ্যায় সামঞ্জস্য নাই। কারণ প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বাইশ জন, দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে চব্বিশ জন এবং ষষ্ঠ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে কুড়িজন লীলাবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধের তালিকার ভিত্তিতে পঁচিশজন লীলাবতারের উল্লেখ করিয়াছেন।

লীলাবতারের আলোচনার পর মন্বন্তরাবতারের আলোচনা আছে। মন্বন্তরাবতারসমূহ লীলাবতার হইলেও, ইহারা যে যে মন্বন্তরে আবির্ভূত হন, সেই সেই মন্বন্তরকাল পর্যন্ত পৃথিবী পালন করাতেই ইহাদের মন্বন্তরাবতার বলা হইয়া থাকে। মনুর সংখ্যা চতুর্দশ বলিয়া ইহারা সংখ্যায় চতুর্দশ।

মন্বন্তরাবতার আলোচনার পর যুগাবতারের বিশেষত্ব আলোচ্য।

যুগাবতার চারটি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারযুগে কেশব নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম প্রচার করেন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হইয়া ধ্যানধর্ম, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যুগাবতার যজ্ঞমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞধর্ম এবং দ্বাপরে ভগবান শ্যামবর্ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অর্চনারূপ যুগধর্ম প্রচার করেন। কলিযুগে ভগবান কৃষ্ণবর্ণ ("কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং") ও ইন্দ্রনীলজ্যোতিবিশিষ্ট আবেশরূপে অবতরণপূর্বক সঙ্কীর্তন-প্রধান যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেন। (গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে কলিযুগের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।)

গর্গসংহিতায় অবতারপ্রসঙ্গ :

গর্গসংহিতাকার শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণকে অংশাংশ, অংশ, কলা, আবেশ, পূর্ণ ও পরিপূর্ণ—এই ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মরীচি প্রভৃতিকে অংশাংশ অবতার, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে অংশাবতার, কপিল, কূর্ম প্রভৃতিকে কলাবতার, শ্রীভার্গব প্রভৃতিকে আবেশাবতার, নৃসিংহ, বামন, হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ ও নরনারায়ণকে পূর্ণাবতার এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ অবতাররূপে অভিহিত করিয়াছেন।[১৭]

শ্রীরূপ গোস্বামী আবার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশের তারতম্য অনুসারে পূর্বোক্ত পঁচিশজন লীলাবতার, চৌদ্দজন মন্বন্তরাবতার ও চারজন যুগাবতারকে আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থা—এই চারটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। এই বিভাগ অনুযায়ী চতুঃসন, নারদ, পৃথু, পরশুরাম এবং কল্কি আবেশাবতার; মোহিনী, হংস, ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল এবং শুক্লাদি চারটি যুগাবতার প্রাভব অবতার; মৎস্য, কূর্ম, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ (ধ্রুবপ্রিয়), বলরাম এবং যজ্ঞ প্রভৃতি চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার বৈভব অবতার এবং নৃসিংহ, রাঘবেন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থার অবতার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই তালিকায় শ্রীরূপ গোস্বামী বুদ্ধ অবতারকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এবং বর্জনের কোন কারণও দেখান নাই যদিও ইতিপূর্বে ভাগবতের অনুসরণে পঁচিশ জন লীলাবতারের বিবরণে বুদ্ধ অবতারের কথা বলিয়াছেন। কোন কোন আধুনিক পণ্ডিতও[১৮] বুদ্ধদেবকে অবতারের মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের যুক্তি হইতেছে, প্রথমতঃ, ব্রহ্ম ও বায়ুপুরাণে বুদ্ধ অবতাররূপে গণ্য নহেন; বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই, ইঙ্গিতে তাঁহাকে মায়ামোহের অবতার বলা হইয়াছে; ভাগবতে যেভাবে বুদ্ধদেবের উল্লেখ আছে, তাহাতে দেখা যায়, অবতারগণনায় বুদ্ধদেবের স্থাননির্দেশ কষ্টকল্পিত। দ্বিতীয়তঃ, অবতার বলিলে পরব্যোম হইতে বৈষ্ণবীশক্তির ইহলোকে অবতরণ বুঝায়। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ এরূপ অবতার নহেন। তাঁহার সিদ্ধির ব্যাপারও অবতরণ নহে—উত্তরণ। অতএব তাঁহাকে অবতারের মধ্যে গণ্য করা অসঙ্গত।

অবতারের মধ্যে গণ্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অবতারী

ইতিপূর্বে অবতারগণের প্রকারভেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, অবতারসমূহ তাঁহার অংশ বা অংশাংশ। আবার লীলাবতারের বিবরণে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারগণের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ভাগবতকারের নিজেরই মতে যিনি বহুমূর্তি হইয়াও একমূর্তি, অবতারসমূহের উৎস, অক্ষয় সরোবরস্বরূপ, তাঁহাকে অবতারসমূহের সহিত একসূত্রে গণনার কারণ কি? উত্তরে বলা যায়, ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করিলেও সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করাই যে ভাগবতকারের উদ্দেশ্য, তাহা এই

বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে। আর শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম, অজ, নিত্য, শাশ্বত, বিভু ও আদিদেব তাহা মহাভারত ও তাহার অন্তর্গত গীতা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্রই স্বীকৃত ও কীর্তিত।

মহাভারতে সভাপর্বে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তবপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণই লোকসমূহের উৎপত্তিস্থল। তাঁহা হইতেই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন জগৎকর্তা, অচ্যুত, সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্যতম।

"কৃষ্ণ এবহি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥
এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্তা চৈব সনাতনঃ।
পরশ্চ সর্বভূতেভ্যঃ তস্মাৎ পূজ্যতমোঽচ্যুতঃ॥"[১৯]

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, জগতের মাতা ও বিধাতা—'পিতাঽহমস্য জগতো মাতা, ধাতা, পিতামহঃ।'[২০] পদ্মপুরাণকারও বলিয়াছেন, নির্গুণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে প্রকাশ পাইলেও এক; তিনিই আদিকর্তা—

"স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ।
একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদিকৃৎ॥"

সাধক কবি জয়দেবও দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'দশাকৃতিকৃৎ' অর্থাৎ অবতারসমূহের আদি কারণ বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন—'দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।' চৈতন্যচরিতামৃতকারও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবর্ণনায় বলিয়াছেন—'সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী, কিশোরশেখর।' শ্রীজীবও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে নানা যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ('কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে)।

অবতারের উদ্দেশ্য

অবতারের প্রকারভেদ আলোচনার পর জিজ্ঞাস্য এই যে,

কোন্ কার্যের নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অথবা অংশে ইহলোকে অবতরণ করেন এবং তাহাতে কোন্ উদ্দেশ্যই বা সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—সাধুগণের পরিত্রাণ, দুর্বৃত্তগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনই তাঁহার জগতে আবির্ভাবের কারণ :

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"[২১]

ভাগবতেও অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কথাই বলা হইয়াছে—'ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।' অন্যান্য পুরাণেও অবতরণের এই উদ্দেশ্যই পরিলক্ষিত হয়।[২২]

কিন্তু যাহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, শিষ্টের পালন, দুষ্টের বিনাশ, ধর্মস্থাপন প্রভৃতি ব্যাপার তো তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সম্পন্ন হইতে পারে। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিযাছেন, মুহূর্তের মধ্যে দানবগণকে বিনাশের ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাহা হইলে তাঁহার ইহজগতে অবতরণের কারণ কি? শ্রীরূপ গোস্বামী লঘুভাগবতামৃতের একটি শ্লোকে অবতারের সংজ্ঞানির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, জগতের কার্যের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার অবতারগণের সংসারে অবতরণ।[২৩]

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এই শ্লোকের অন্তর্গত 'বিশ্বকার্যার্থম্' পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—বিশ্বকার্যের অর্থ প্রকৃতিকে বিচলিত করিয়া মহৎ-তত্ত্বের সৃষ্টি, দুষ্টের দমন করিয়া জগতের সুখের পরিমাণবৃদ্ধি, সাধকদের মধ্যে প্রেম ও আনন্দ বিস্তার এবং বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম প্রচার। শ্রীরূপের এই সংজ্ঞা যে ব্যাপকতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যে সকল কার্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 'প্রেমানন্দ-বিস্তার' ভিন্ন অন্য সকলই অবতারগণের কাজ। প্রেমানন্দ-বিস্তার শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন ভগবৎস্বরূপের

পক্ষেই সম্ভব নয়। চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি—৩।২০) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন—

"যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে

এই পরম দুর্লভ প্রেমধর্ম প্রচারের জন্যই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংসারে অবতরণ।

শ্রীজীব গোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণের ইহজগতে অবতরণের কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভূভারহরণ প্রভৃতি কাজের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইহলোকে অবতরণ নহে—ঐ সকল কাজ তাঁহার অবতারগণই করিয়া থাকেন। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহে, নিজের লালামাধুর্যে তাঁহাদের আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে ইহলোকে অবতরণ করিয়া থাকেন—একথা প্রকাশ করিবার জন্যই অবতারগণের মধ্যে তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি যে অংশাবতার নহেন, তাহা ব্রহ্মসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোক (৫।৪৮) হইতেও প্রমাণিত হয়।[২৪]

"রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইলেও তিনি ইহজগতে অবতরণ করেন। তবে তাঁহার লালা ও অবতার-সমূহের লীলার মধ্যে পার্থক্য আছে। অবতারগণের লীলা শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন প্রভৃতি জগতের কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে আর শ্রীকৃষ্ণের লীলা কেবল ভক্তের আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলায় দুষ্টের বিনাশ প্রভৃতি কার্যের উল্লেখ থাকিলেও

তাহা যে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কার্য নহে, অংশাবতারসমূহের কার্য, তাহা "লীলা" অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগাবতাররূপে অন্তর্ভুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'ভাগবতসন্দর্ভের' পুষ্পিকায়[২৫] ও স্বরচিত টীকা 'সর্বসংবাদিনী'তে চৈতন্য-অবতারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

অবতারের আধুনিক ব্যাখ্যা

অতঃপর অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আধুনিক মনীষীদের অভিমত আলোচনা করা যাইতে পারে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ভগবানের ইহলোকে অবতরণের একটি সুসঙ্গত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতবিনাশ অবতার ব্যতীতও সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু আদর্শ ছাড়া প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন অসম্ভব। জীবের নিকট এই পূর্ণ আদর্শ স্থাপনের জন্যই অসীম অনন্ত ভগবান সসীম ও সান্তরূপে অবতীর্ণ হন। বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ আর এক ভাবে ভগবানের ইহজগতে অবতরণের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সূর্য ও সূর্যরশ্মির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সূর্য পৃথিবীর প্রাণ কিন্তু সূর্য যদি প্রচণ্ড মূর্তিতে জগতে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এই জন্যই সূর্যের তেজ বায়ুস্তরের দ্বারা সংবৃত ও স্তিমিত হইয়া রশ্মিরূপে অবতরণপূর্বক পৃথিবীকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করিতেছে। ভগবানের সম্বন্ধেও এই একই কথা। ভগবানের ঐশ্বর্যও এত বিরাট, তাঁহার মহিমাও এত প্রচণ্ড যে, তিনি নিজেকে সঙ্কুচিত ও আবৃত না করিয়া পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত হইলে কেবল সাধারণ মানুষ নহে, মহত্তম সাধকগণও সেই ঐশ্বর্য ও মহিমা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারেন না। তাই ভগবান ঐশ্বর্য ও মহিমার পরিপূর্ণতম স্বরূপ হইয়াও সেই স্বরূপ আবৃত

করিয়া মানবদেহ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হন এবং পুত্র, বন্ধু ও প্রিয়রূপে ভক্তগণের আনন্দবিধান ও তাঁহাদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করেন।[২৬]

স্যার অশিভার লজের এই ব্যাখ্যা যে অতীব সঙ্গত, তাহা গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সেই অনাবৃত ঐশ্বর্যরূপ তিনি ধারণ করিতে পারেন নাই। ভীত সন্ত্রস্ত অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার চিরপরিচিত পূর্বরূপটি অর্থাৎ সখার রূপটি দেখাইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।[২৭] ভগবানের অনাবৃত ঐশ্বর্য ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। এইজন্যই যীশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—'No man can see my face and live.'

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁহার একটি প্রবন্ধে আর একদিক হইতে অবতারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের স্বার্থদ্বেষ-কলুষিত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সমাজ-পরিবেশকে শুচিশুভ্র ও সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্যই পরম কারণিক পুরুষোত্তম এই ধূলির ধরণীতে অবতীর্ণ হন। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়াছেন যে, ভগবানের আবির্ভাব সম্পর্কে যত কারণই অনুমান করি না কেন, মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে এই অতুলনীয় কার্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নহে—"The physical and social environment of ours, which is characterised by smallness and mortality is thus sanctified by the august appearance of the supramundane reality, whose essence consists in universality and immortality ....It is indeed humanly impossible to furnish sufficient grounds and rational explanation for

such a great event as the descent of Divinity by mere analysis of natural factors." ।[৭৮]

অবতারের বৈশিষ্ট্য

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অংশসমূহের অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য বর্ণনার পর অবতারগণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, অবতারসমূহ কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বিশেষ কালে, বিশেষ স্থানে ও বিশেষ মূর্তিতে আবির্ভূত হন এবং সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পর তাঁহাদের তিরোভাব ঘটে। লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার এবং যুগাবতার সকলের মধ্যেই এই লক্ষণগুলি বর্তমান। গীতায় (৪।৭) শ্রীকৃষ্ণ তাহার ইহলোকে অবতরণের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

—এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, অবতারসমূহ অনিত্য ও স্থান, কাল প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অবতারগণ প্রকট লীলায় অনিত্য এবং দেশ, কাল প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও, অপ্রকট লীলায় তাঁহারা নিত্য এবং দেশ, কাল প্রভৃতির দ্বারা সীমিত নয়। শ্রীজীব গোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি প্রসঙ্গে তাঁহার অংশসমূহের নিত্যত্ব আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহারই প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবতের (৫।১৭।১৪) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ভগবান নারায়ণ পুরুষদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য নিজ মূর্তি-সমূহের দ্বারা অদ্যাপি সন্নিহিত আছেন। তাঁহার মতে এই সন্নিধান সাক্ষাৎরূপে, প্রতিমাদিরূপে নয়। এখানে ভগবানের নিজ

মূর্তিসমূহের দ্বারা 'অদ্যাপি' অর্থাৎ বর্তমানকালেও সন্নিধান তাঁহার ও তাঁহার অংশসমূহের নিত্যত্বই সূচিত করিতেছে। শ্রীজীব এই প্রসঙ্গে মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতি চতুর্বেদশিখা, নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি হইতেও উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

অবতারগণের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব তাঁহারা মায়ার অধীন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সীতার বিরহে এবং লক্ষ্মণবর্জনে রামচন্দ্রের সাধারণ মানুষের ন্যায় শোককাতরতা, একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরশুরামের বীরদর্পে রাম-অবতারের নিকট উপস্থিতি—দুই অবতারের পরস্পরের প্রতি আস্ফালন এবং শেষে রামচন্দ্রের নিকট পরশুরামের পরাজয় স্বীকার প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবতারগণের এই সকল মানবোচিত কার্যকলাপ মায়ামুগ্ধতারই পরিচায়ক।

এখন প্রশ্ন এই যে, অবতারসমূহ অনিত্য, কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মায়ার অধীন, সাধারণ জীবেরও তাহাই ধর্ম ; তাহা হইলে অবতার কি সাধারণ জীবের সমপর্যায়ভুক্ত ? ইহার উত্তরে বলা যায়, অবতার ও সাধারণ জীব সমপর্যায়ভুক্ত নহে। কারণ ইতিপূর্বে অবতারের প্রকারভেদ আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, অবতারগণ ভগবানের স্বরূপশক্তিরই অংশ বা অংশাংশ। কিন্তু জীব স্বরূপ-শক্তির অংশ নহে—তটস্থশক্তি। এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যই ইহাদের কোনক্রমেই সমপর্যায়ভুক্ত বলা চলে না এবং এই একই কারণে সাধারণ জীব হইতে উন্নত সিদ্ধপুরুষ বা মুক্তপুরুষদেরও যে অবতারের সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না, তাহা আলোচনা করা হইতেছে। ভাগবতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। এই অষ্টসিদ্ধিতে যাঁহারা সিদ্ধ তাঁহারা সিদ্ধ-পুরুষ আর যাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তপুরুষ। অতএব ইহারা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ

নাই। কিন্তু ইঁহারা কেহই ভগবানের স্বরূপশক্তির অংশ নহেন। কারণ মোক্ষদশায়ও জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। অতএব অবতার ও জীবের ভেদ স্বতঃসিদ্ধ।

অবতার ও জীবের পার্থক্য নির্দেশের পর অবতার ও পরিকরের পার্থক্য আলোচনা করা যাইতে পারে। অবতারের ন্যায় পরিকরও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অংশ। তৎসত্ত্বেও অবতার ও পরিকর সমশ্রেণীভুক্ত নহে। কারণ উভয়ের অবতরণের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। অবতারসমূহ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্মসংস্থাপন প্রভৃতি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অবতীর্ণ হন কিন্তু পরিকরদেব একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের লীলায অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দ্বারা ভগবৎ-লীলার চমৎকারিত্বে ভক্তজনের আনন্দবিধান করা। এই উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই তাঁহাদের নাই। সুতরাং অবতার ও পরিকর সমপর্যায়ভুক্ত নহে।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২৮ অনুচ্ছেদ

২। ভাগবতপুরাণ—১।৩।২৬

৩। ঐ —১০।৪০।৭

৪। লঘুভাগবতামৃত—১।১২

৫। ঐ —১।১৪

৬। ঐ —১।১৫

৭। ঐ —১।১৭

৮। ঐ —১।১৮

৯। ছান্দোগ্যোপনিষদ—৭।৬।১

১০। গীতা—১০।৪১

১১। লঘুভাগবতামৃত—১।২৯

১২। ভাগবতপুরাণ—২।৬।৪২

১৩। মহাভারত—শান্তিপর্ব ৩৩৯ অধ্যায়

১৪। ভাগবতপুরাণ—১০।১০।৩০

১৫। লঘুভাগবতামৃত—১।৪৪২-৪৪৬

১৬। ঐ —১।৪৭৭-৪৮২

১৭। গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড—১।১৫-১৮

১৮। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—অবতারতত্ত্ব (১৩৩৫) পৃঃ ১৫৬-১৫৮

১৯। মহাভারত, সভাপর্ব—৩৭।২১-২২

২০। গীতা—৯।১৭

২১। ঐ —৪।৮

২২। তুলনীয়—(ক) "যদা যদাধর্মস্য গ্লানিঃ সমুপজায়তে।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ॥"

—ব্রহ্মপুরাণ

(খ) "ধর্মসংস্থাপনার্থায় তদা সম্ভবতি প্রভুঃ।"—হরিবংশ

২৩। লঘুভাগবতামৃত—১।২৫

২৪। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২৮ অনুচ্ছেদ

২৫। "স্বভজন-বিভজন প্রয়োজনাবতার

শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ"

২৬। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—অবতারতত্ত্ব, পৃঃ ৪-৬

২৭। গীতা—১১।২৩-২৫

২৮। Amrita Bazar Patrika, March, 2, 1961—The Advent of Sree Gouranga প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

—0—

চতুর্থ অধ্যায়

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশের দুইরূপ—লীলা ও অবতার—আলোচিত হইয়াছে। ভক্তের আনন্দবিধানের জন্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তাহা লীলা আর দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মস্থাপনের জন্য অংশ বা অংশাংশরূপে যে প্রকাশ, তাহা অবতার।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের বিশেষত্ব

এই দ্বিবিধ প্রকাশে তাঁহার স্বরূপের দুইটি বিশিষ্ট দিক—মাধুর্য ও ঐশ্বর্যেরই অভিব্যক্তি। এই কারণেই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এই দুইটি প্রকাশের বিশেষত্ব ও তাৎপর্য।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের মতে, শ্রীকৃষ্ণের যে-প্রভাবে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অভিমানী দেবগণের অভিমান চূর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রভাবের নাম ঐশ্বর্য আর শ্রীরূপ গোস্বামীর বিবৃতিতে সর্ব অবস্থায় চেষ্টার যে চারুতা বা মনোহারিত্ব তাহার নাম মাধুর্য।[১] ভক্তশ্রেষ্ঠ সূরিবরেণ্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীও 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা'য় ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন।[২]

যে মূর্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়পয়োধিজলে বেদের উদ্ধারকর্তা, অতি বিশাল পৃথিবীর সংস্থাপক, ত্রিপাদপরিমাণে ত্রিভুবনের আচ্ছাদক, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যের সংহারক, তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্যমূর্তি। এই মূর্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গীতার বিশ্বরূপ অধ্যায়ে; চন্দ্র, সূর্য যাঁহার চোখে, প্রজ্বলিত অগ্নি যাঁহার মুখে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত দশন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ, যিনি বিশ্বরূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান,

সেই আদি, মধ্য ও অন্তহীন মহামূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের চরম দৃষ্টান্ত।

আর যে-মূর্তিতে তিনি সুন্দর, মধুরভাষী, ক্ষমাশীল, করুণ, ভক্তবৎসল, প্রেমের বশীভূত, মঙ্গলময় তাহাই তাঁহার মাধুর্যমূর্তি।[৩] এই মাধুর্যের স্বরূপ বিচিত্র—তাহার মধ্যে লীলামাধুর্য, প্রেমমাধুর্য, বংশীমাধুর্য ও রূপমাধুর্য শ্রীকৃষ্ণে অসাধারণ।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুইটি ভিন্নবৃত্তি হইলেও এই উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। সুতরাং তাঁহাতে এই দুই বৃত্তিরই যে প্রকাশ থাকিবে তাহাই স্বাভাবিক। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মের স্তবরাজ ও কালিয়নাগ-দমনকালে নাগপত্নীদের স্তব ইহার উদাহরণ। ভীষ্মের স্তবে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারূপের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

"বসুদেবসুতঃ শ্রীমান ক্রীড়িতো নন্দগোকুলে।
কংসস্য নিধনার্থায় তস্মৈ ক্রীড়াত্মনে নমঃ॥"[৪]

অর্থাৎ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে ক্রীড়ার উল্লেখ থাকিলেও কংসবধই সেই ক্রীড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের ('কংসস্য নিধনার্থায়') সহিত মাধুর্যও ('ক্রীড়াত্মনে') লক্ষিত হইয়াছে। আর ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে 'খলসংযমাবতারঃ'[৫] বলা হইলেও সেখানে যে তাঁহার মাধুর্যেরই প্রাধান্য তাহার পূর্ণ প্রকাশ কালিয়দমনলীলায়। কারণ কালিয়দমনের পরে নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার পদধূলির জন্য তপস্যা করেন, কালিয়নাগ তাহার অশেষ পুণ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পদধূলির স্পর্শ পাইয়াছে। তাই কালিয়নাগের দমন তাহাদের নিকট নিগ্রহ নহে, পরম অনুগ্রহ বলিয়াই মনে হইয়াছে।[৬] দুষ্কৃতের প্রতি এই করুণার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ 'হতারিগতিদায়কঃ'।[৭]

অতএব এই আলোচনার সিদ্ধান্তরূপে বলা যায় যে, ঐশ্বর্য ও

মাধুর্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির এই বৃত্তি দুইটির প্রকাশ সর্বত্র একই সঙ্গে দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর শক্তিশালী তাহাই বিচার্য।

সাধারণভাবে মথুরা ও দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এবং ব্রজলীলায় তাঁহার মাধুর্যের সমধিক প্রকাশ। মথুরা ও দ্বারকা-লীলায় তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান, দণ্ডদাতা ; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। কংস-ও শিশুপাল-বধ প্রভৃতি লীলায় প্রধানতঃ তাঁহার এই ঐশ্বর্যেরই প্রকাশ। আর ব্রজলীলায় তিনি প্রিয়, জগদ্বন্ধু, করুণাসিন্ধু, সর্বদা ভক্তের অনুগ্রহে তৎপর ও সুন্দর।[৮] ব্রজবাসিগণের কাহাকেও বাৎসল্যে, কাহাকেও সখ্যে, কাহাকেও দাস্যে এবং কাহাকেও বা মধুররসে ভাবিত করিয়া তিনি নিত্যই লীলারত।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অবিমিশ্র প্রকাশ বিরল

ইহার অর্থ এই নয় যে, মথুরা ও দ্বারকায় কেবল ঐশ্বর্যলীলা আর ব্রজে কেবল মাধুর্যলীলা। কারণ মথুরা ও দ্বারকায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চার ভাবের ও চার প্রকারের পরিকর আছেন। দারুকাদি দাস্যভাবের, অর্জুনাদি সখ্যভাবের, বসুদেব-দেবকী বাৎসল্যভাবের এবং রুক্মিণী প্রভৃতি কান্তারতির পরিকর। আবার ব্রজলীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ, কালিয়দমন, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি ঐশ্বর্যলীলা আছে। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য যখন তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, তখন এই দুইটির অবিমিশ্র প্রকাশ সম্ভব নয়। ঐশ্বর্যলীলায় মাধুর্যের এবং মাধুর্যলীলায় ঐশ্বর্যের স্ফুরণ থাকিবেই। পূতনাবধ, কালিয়দমন প্রভৃতি ঐশ্বর্যপ্রধান লীলায় যেমন ঐশ্বর্যের সহিত মাধুর্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে, তেমনই আবার দামবন্ধন ও রাসলীলার ন্যায় মাধুর্যপ্রধান লীলাতেও তাঁহার

ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখা যায়। দুরন্ত পুত্রকে রজ্জুবন্ধনে মাতা যশোদার ব্যর্থতাএবং রাসলীলায় যত গোপী তত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্যেরই প্রকাশ। এই কারণেই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা'য় যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন—একইকালে তোমার এই মুগ্ধতা ও সর্বজ্ঞতা আমাকে অতিশয় আকৃষ্ট করিতেছে। ······দ্বারকালীলায় সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও যেমন মুগ্ধতা, তেমনই বৃন্দাবন লীলায় মুগ্ধতার মধ্যেও সর্বজ্ঞতা শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রকাশ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এইজন্যই শ্রীলীলাশুক বলিয়াছেন, সর্বজ্ঞতা ও মুগ্ধতা একইকালে দেখা যাইতেছে।-

মথুরা, দ্বারকা ও ব্রজের কোন লীলাতেই ঐশ্বর্য অথবা মাধুর্যের অবিমিশ্র প্রকাশ নাই সত্য, তবে উভয় লীলায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের প্রকাশভেদে তারতম্য আছে। মথুরা-দ্বারকায় মাধুর্য ঐশ্বর্য-কবলিত আর ব্রজে ঐশ্বর্য মাধুর্য-কবলিত। অর্থাৎ মথুরা-দ্বারকায় সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাব ঐশ্বর্যজ্ঞানকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়। তাহার ফলে মাধুর্য ভাবের আস্বাদন-যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, ঐশ্বর্যের সহিত ভীতি, গৌরব, রুক্ষতা প্রভৃতি ভাব জড়িত থাকায় প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—প্রেমরসের নির্যাসস্বরূপ সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাব ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু ব্রজলীলায় ইহার বিপরীত। ব্রজেও ঐশ্বর্য আছে, কোন কোন লীলায় ঐশ্বর্যের বিকাশ অন্য ধাম হইতে ব্রজে কমও নহে কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব-বুদ্ধি বা রুক্ষতা মিশ্রিত নাই। এইজন্য ব্রজের ঐশ্বর্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না, বরং বর্ধিত হইয়া ভাবের পুষ্টিসাধন করে।

পুরলীলা ও ব্রজলীলার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

মথুরা, দ্বারকা ও ব্রজের কয়েকটি লীলা আলোচনা করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য ও সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, মিত্রোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি। এই সুহৃদ্ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তাহাতে অর্জুনের সখ্যভাব অন্তর্হিত হইল। সখ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গৌরব-বুদ্ধিতে পরমেশ্বর-জ্ঞানে তিনি করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া পূর্বের সখ্যমূলক আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, দেবকীনন্দন কিন্তু কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া দেবকী-বসুদেব নবজাত শিশুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাৎসল্য তিরোহিত হইল। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম যখন জনকজননী দেবকী ও বসুদেবকে প্রণাম করিলেন, তখন ঐশ্বর্যজ্ঞানে তাঁহাদের ভয় হইল। পরমেশ্বর প্রণাম করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহাদের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইল। রুক্মিণীকে পরিহাস করিবার জন্য দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমাত্মা, নির্বিকার ও নির্মম বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া রুক্মিণী তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইলেন এবং তাঁহার কান্তাপ্রেম তিরোহিত হইল।

ব্রজলীলায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখিয়া ব্রজবাসীদের মনে কখনও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। ব্রজলীলার সহচরগণ অঘাসুর-বকাসুরবধ ও দাবানল-ভক্ষণ প্রভৃতি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের বিকাশ দেখিয়াছেন অথচ তাহাতে অর্জুনের ন্যায় তাঁহাদের সখ্যভাব তিরোহিত হয় নাই; তাঁহার স্কন্ধে আরোহণের ধৃষ্টতা-জনিত অপরাধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই বরং তাঁহার স্কন্ধে পুনরায় আরোহণের দাবী জানাইয়াছেন। এমন কি, এই সব অতি অদ্ভুত লীলা যে তাঁহাদের সখা শ্রীকৃষ্ণেরই, তাহাও মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছেন যে, কোন অচিন্ত্য, অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবেই তাঁহারা ও তাঁহাদের সখা

নানাবিধ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন না ভাবিতে তাঁহাদের অনুরোধ করিয়াছেন। গোবর্ধনলীলায় তাঁহার উক্তি এ বিষয়ে প্রমাণ।[১০]

গোবর্ধনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তিরই প্রকাশ। ইন্দ্র কর্তৃক অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপীড়িত ব্রজবাসীদের রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছত্ররূপে ক্রমান্বয়ে সাতদিন ধারণ করায় ইন্দ্রের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাবেই ঘটিয়াছে, তাহা ব্রজবাসিগণ কোনক্রমেই ভাবিতে পারেন নাই। বিশাল পর্বতকে ছত্ররূপে ধারণ করায় তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু ইহা যে বস্তুতঃপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাব এ ধারণা যদি ব্রজবাসীদের থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারাও অন্য দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিই করিতেন, আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না। মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করায় তাঁহার ঐশ্বর্যভাবের উদয় হইয়াছিল বটে কিন্তু এই জ্ঞান ক্ষণিকের। পরমুহূর্তেই তিনি ঐশ্বর্যশক্তির কথা ভুলিয়া সস্নেহে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লন। শঙ্খচূড়বধ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-গণের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধির উদয় হয় নাই বরং এই সকল লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের ভাবসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই ঐশ্বর্য প্রকটিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর-বুদ্ধি ব্রজপরিকরদের অভিভূত করে নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাহারও ভাব বা প্রীতি সঙ্কুচিত হয় নাই বরং তাহা পরিপুষ্টিই লাভ করিয়াছে। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্যের বিশেষত্ব, ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্যের মাধুর্য। এইখানেই মথুরা-দ্বারকার ঐশ্বর্যের সহিত ব্রজের ঐশ্বর্যের পার্থক্য।

উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ করুণাময়

তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় লীলাতেই তিনি করুণাময়। কারণ, লীলা যেমন তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তি, করুণাও তেমনই তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। যেখানে স্বরূপশক্তির বিকাশ, সেখানে করুণারও প্রকাশ। এই করুণা-প্রকাশ বিষয়ে তাঁহার সংকল্প না থাকিলেও আনুষঙ্গিকভাবে তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাই ভগবানের যে কোন লীলাতেই করুণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মাধুর্য-লীলায় ভগবানের করুণা যে প্রকাশ পাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐশ্বর্যলীলায়ও তাঁহার করুণার অভিব্যক্তি বিরল নহে। কংস, শিশুপাল প্রভৃতি দুরাত্মাদের বধ করিযা তিনি যে তাহাদের মুক্তি দিয়াছেন এবং তাহাতেই যে তাঁহার করুণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা লীলা অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

পুরলীলা ও ব্রজলীলা—উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুয স্বরূপের অভিব্যক্তি। পুরলীলায় মাধুর্য অপেক্ষা ঐশ্বর্যের এবং ব্রজলীলায় ঐশ্বর্য অপেক্ষা মাধুর্যের সমধিক প্রকাশ। তবে উভয় লীলাতেই তিনি করুণার মূর্ত প্রতীক।

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য—দুইরূপের প্রকাশ থাকিলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধুর্যকেই শ্রেয়ঃ এবং ভগবত্তার সার বা প্রাণ বলিয়া মনে করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন:

"মাধুর্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।"[১১]

শ্রীজীব গোস্বামীও প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার স্বরূপ দুই প্রকার হইলেও ঐশ্বর্যে প্রভুত্ব আর মাধুর্যে রমণীয়তা

প্রকাশিত হইয়াছে।[১২] ইহা হইতে সাধকের মনোরঞ্জনে ও সাধনার বিষয়ে মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টই বোঝা যায়।

উপনিষদে মাধুর্য-স্বরূপের সন্ধান

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্যময় স্বরূপকল্পনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রাণ হইলেও ভগবানকে পরম কাম্য, পরম রমণীয়রূপে ধারণার ইঙ্গিত উপনিষদেও পাওয়া যায়। কেন উপনিষদে (৪।৬) ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনায় বলা হইয়াছে 'তদ্‌বনমিত্যুপাসিতব্যম্।' 'বন' শব্দটির ধাতুগত অর্থ পরম কাম্য। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাহিত্যে বহুল-প্রচলিত 'বঁধু' শব্দটিও বন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ধাতুগত অর্থ বিচার করিলে দেখা যায়, ভাগবতে যিনি 'বন্ধুরাত্মা' বা প্রেমধর্মের উৎসরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারই ইঙ্গিত উপনিষদের শ্লোকাংশেও পরিলক্ষিত হইতেছে।

এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্য অপেক্ষা মাধুর্যকে যে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, তাহা কতটা যুক্তিযুক্ত বিচার করিয়া দেখা যাক।

আশ্রিতগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, বশীকরণযোগ্যতা, করুণা প্রভৃতি প্রকাশের দ্বারা ভগবত্তা সূচিত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে মূলতঃ ঐশ্বর্য অপেক্ষা মাধুর্যের শক্তি অধিক। ঐশ্বর্যমূলক ক্ষমতাদির দ্বারা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায় সত্য কিন্তু সে আধিপত্য দেহের উপরই সম্ভব, মনের উপর নহে। তবে করুণা ও মাধুর্য দেহ ও মন উভয়কেই বশীভূত করিতে পারে। সুতরাং এদিক দিয়া বিচার করিলে ঐশ্বর্যের শক্তি পরিমিত, মাধুর্যের শক্তি সর্বাত্মক। আবার মাধুর্যের এমনই শক্তি যে, তাহার উপস্থিতিতে ঐশ্বর্য সঙ্কুচিত ও পরাজিত হয়। ইহার প্রমাণ দামবন্ধনলীলায় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তির প্রতাপে প্রতিবারই দুই অঙ্গুলি

পরিমিত রজ্জু কম হওয়ায় যশোদার পুত্রকে বন্ধনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল—তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মাতার ক্লান্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে দুঃখ ও আক্ষেপের সঞ্চার হইতেই মাধুর্য (করুণা) শক্তির আবির্ভাবে ঐশ্বর্য দূর হইল। মাতার হস্তে পুত্র বাঁধা পড়িলেন। আবার কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন ঐশ্বর্যাত্মক স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা চতুর্ভুজ হইয়া শ্রীরাধার সহিত রহস্য করিতে কৌতূহলী হইয়াছিলেন, তখন শত চেষ্টা ও ইচ্ছা সত্ত্বেও শুদ্ধ মাধুর্যস্বরূপিণী শ্রীরাধার সমক্ষে নিজের চতুর্ভুজ অর্থাৎ ঐশ্বর্যাত্মক রূপ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি দ্বিভুজ হইয়া গেলেন। মাধুর্যের সাক্ষাতে ঐশ্বর্য একমুহূর্ত টিকিতে পারিল না। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্যের তুলনায় মাধুর্যের প্রকাশ কম হইলেও সেখানে ঐশ্বর্য রূপ গুণ লীলা প্রভৃতির মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না।

ভগবত্তার সার মাধুর্যরূপেই প্রকট। সার বলিতে বুঝায় প্রাণস্বরূপ অপরিহার্য বস্তু। যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, যাহার অভাবে সেই বস্তুর অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, তাহাই সেই বস্তুর সার—তাহার পক্ষে অপরিহার্য।

ভগবান আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। এই আনন্দ বাদ দিলে তাঁহাতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং আনন্দ বা রসই হইল ভগবত্তার সার—অপরিহার্য বস্তু। আনন্দ বা রস যাহা, মাধুর্যও তাহাই। সুতরাং মাধুর্যই ভগবত্তার সার।

অধিকন্তু ঐশ্বর্যের বিকাশ ছাড়াও কেবল মাধুর্যের বিকাশেই লীলারসের আস্বাদন সম্ভব। কিন্তু মাধুর্যের বিকাশ ছাড়া কেবল ঐশ্বর্যের বিকাশে লীলা যদি কখনও সম্ভব হয়, (কারণ মাধুর্যহীন ঐশ্বর্যের বিকাশ কোন ভগবৎ-স্বরূপে নাই—অল্প হইলেও মাধুর্যের বিকাশ আছেই) তাহা হইলেও সেই লীলায় আস্বাদ্য রস স্বতঃস্ফূর্ত

হইতে পারে না—সেই লীলায় রসের বিকাশও সম্ভব নহে। সুতরাং ঐশ্বর্যকে ভগবত্তার সার বলা যায় না।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'মাধুর্যকাদম্বিনী'তে যথার্থই বলিয়াছেন, নদ, নদী, দিঘি প্রভৃতিতে জল থাকিলেও সমুদ্র যেমন সকল জলের আশ্রয়স্বরূপ—জলনিধি, সেইরূপ এই মাধুর্যরস ভগবানের অন্য অবতার বা অবতারীতে দেখা গেলেও তাহার পূর্ণ পরিণতি ব্রজেন্দ্রনন্দনে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবানই ঐ রস এবং পুরুষ রসস্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিয়াই আনন্দময় হন। 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি'।[১৩] ইহাই চৈতন্য-চরিতামৃতেরও বক্তব্য।[১৪]

ব্রহ্মসংহিতাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শুধু রসস্বরূপ বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি যে 'উজ্জ্বলাখ্য প্রেমরসবিভাবিত' অর্থাৎ শৃঙ্গাররসস্বরূপ এবং সেই শৃঙ্গাররসমূর্তিতেই সমগ্র জগতের ভক্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহাও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন :

"আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"[১৫]

শ্রীজীব গোস্বামী ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যে-মদন সকল প্রাণীকে মোহিত করে, সেই মদনকে অর্থাৎ মন্মথেরও মন গোবিন্দ মোহিত করায় তিনি 'মদনমোহন' এবং এইরূপে প্রত্যেক প্রাণীর মনে বিরাজমান। সেইজন্যই মাধুর্যলীলার সার রাসলীলায় তিনি 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ'। রসনিবন্ধকার সুদেব মিশ্র তাঁহার 'রসবিলাসে' তাই বলিয়াছেন, কবিগণ পরকীয়া প্রেমকে নিকৃষ্ট বলিলেও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা নিন্দিত নহে।

মাধুর্যসার-সর্বস্ব সেই কংসারি এই মধুররস আস্বাদনের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণঃ

> "নেষ্টা যদ্ অঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
> তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
> আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
> কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥"

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১। উজ্জ্বলনীলমণি—অনুভাব প্রকরণ ৬৪
২। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—দ্বিতীয় প্রকাশ—১
৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—২ ১।১১-১৮
৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব—৭৬ অধ্যায়।১০৪
৫। ভাগবতপুরাণ—১০।১৬ ৬
৬। ঐ —১০।১৬।৩৪
৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—২।১।২০৪
৮। কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্লোক সংখ্যা ৭০
৯। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—২য় প্রকাশ ১ম উদ্ধৃতি
১০। হরিবংশ—২।২০।১১-১৩
১১। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২১
১২। প্রীতিসন্দর্ভ—৯৭ অনুচ্ছেদ
১৩। মাধুর্যকাদম্বিনী—সপ্তম বৃষ্টিতে উদ্ধৃত
১৪। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২১
১৫। ব্রহ্মসংহিতা—৫।৫১

পঞ্চম অধ্যায়

আশ্রয়তত্ত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সাধকের আরাধ্য পরম দেবতা ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের পরিপূর্ণ স্বরূপ। তিনি একাধারে ঐশ্বর্যঘন ও মাধুর্যঘন। তাঁহার ঐশ্বর্যলীলায় মাধুর্যের এবং মাধুর্যলীলায় ঐশ্বর্যের প্রকাশ। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তাঁহাতে ঐশ্বর্যের চেয়ে মাধুর্যের প্রভাবই বেশি—মাধুর্যই ভগবত্তার সার, তাহাই তাঁহার প্রাণ। মাধুর্যসর্বস্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগৎকে মোহিত করেন, আকর্ষণ করেন। ভক্ত এই দুর্নিবার আকর্ষণে 'দেহ-মন-আদি সব সমর্পিয়া' সেই মাধুর্যস্বরূপের চরণে ঐকান্তিক আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কারণ তাহার দৃষ্টিতে মাধুর্য-সর্বস্ব ভগবানই সকলের আশ্রয়, তিনিই পরম গতি; এই বিশ্বের সমস্ত কিছুই তাঁহার আশ্রিত। এই সর্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া জীবজীবনকে সার্থক করিবার জন্যই তাঁহার সর্বদা প্রার্থনা:

"মধু হইতে মধু তুমি প্রাণবঁধু
চরণের দাসী কর।
কিছু নাহি চাব চরণ সেবিব
দেহ নাথ, এই বর॥"

ভক্ত বৈষ্ণবের এই আকুলতা অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস নহে। উহা যে সর্বশাস্ত্র-স্বীকৃত সত্য, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে আশ্রয়তত্ত্ব

বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরম পুরুষ যে-নামেই অভিহিত হউন না কেন তিনি সমস্ত জগতের আশ্রয়, তাঁহা হইতেই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি ও

তাঁহাতেই লয়, তাঁহার সত্তার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সকল সৃষ্টবস্তু 'সৎ'-রূপে বর্তমান, তাঁহার সত্তার সহিত সম্বন্ধের অভাব যাহাতে ঘটে, তাহাই 'অসৎ'-রূপে প্রতীয়মান।

আর্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ ও উপনিষদে পরম পুরুষ ব্রহ্ম নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতেই জীবিত থাকে এবং তাঁহাতেই লীন হয়। তিনিই সকলের নিয়ন্তা, আশ্রয় ও পরম কারণ। ইহার প্রমাণস্বরূপ উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মই যে সকলের আশ্রয়, তাহা বুঝাইতে গিয়া উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন—সুতায়-বাঁধা পাখী যেমন ইতস্ততঃ উড়িয়া অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে বন্ধনস্থানকে আশ্রয় করে, ঠিক তেমনই জীব স্বপ্ন ও জাগরণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া আত্মাকেই আশ্রয় করে, কারণ পরমাত্মাই জীবের আশ্রয়।[১] মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে সমর্পিত; তিনি নিজের জ্যোতিতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত; আত্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকেই পরম আশ্রয় বলিয়া জানেন:

"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।"[২]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনায় বলা হইয়াছে, যাহা কিছু বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সেই সমস্তই পুরুষ। তিনি মুক্তিদাতা এবং যাহা কিছু অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে তাহারও বিধাতা। সকল প্রাণীর হস্ত, পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সেই ব্রহ্মেরই, তিনি প্রাণীর দেহে সর্বব্যাপী আত্মারূপে বিরাজমান। তিনি সকলেরই নিয়ন্তা, আশ্রয় ও পরম কারণ।[৩]

গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,

তাহা উপনিষদেরই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। অর্জুনের আগ্রহাতিশয্যে প্রধান প্রধান বিভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তিনিই সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা, সর্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তা :

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"[৪]

ভগবানের 'দিব্যবিভূতি' সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা শুনিবার পর অর্জুন তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন। অর্জুন দেখিলেন—প্রণয় বা অজ্ঞতাবশতঃ যাঁহাকে বন্ধু ভাবিয়া পরিহাসচ্ছলে অমর্যাদা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আদি দেব, অনাদি পুরুষ, বিশ্বের একমাত্র অবলম্বন, জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য। তিনিই পরম আশ্রয় ও বিশ্বব্যাপক :

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"[৫]

উপনিষদে যিনি সকলের আশ্রয় ও পরম কারণ—'সর্বস্য শরণং বৃহৎ' এবং গীতায় পরম ধাম ও বিশ্বব্যাপী—'পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ' বলিয়া বন্দিত, বিষ্ণুপুরাণে তাঁহাকেই কল্যাণের আশ্রয়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। খাণ্ডিক্য-কেশিধ্বজ সংবাদে দেখা যায়, যে-শুভ আশ্রয়কে অবলম্বন করিলে মুক্তি-পথের সমস্ত বাধা দূর হয়, তাঁহার স্বরূপ কি, খাণ্ডিক্যের এই প্রশ্নের উত্তরে কেশিধ্বজ বলিতেছেন—মনের আশ্রয় ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম প্রধানতঃ দুই প্রকার—মূর্ত ও অমূর্ত। এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম আবার পর ও অপর রূপে দুই প্রকার। অরূপ, অজ, অক্ষয় রূপই পরমাত্মা বিষ্ণুর পরম রূপ; ইহা বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন। প্রাকৃত ব্যক্তিরা

এই সূক্ষ্ম পরম রূপ চিন্তা করিতে পারেন না। এইজন্য তাঁহারা বিষ্ণুর স্থূল রূপই চিন্তা করেন। ভগবান হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি হইতে নিম্নতম প্রাণী, তাহাদের কারণস্বরূপ পদার্থসমূহ ও মূল প্রকৃতি পর্যন্ত চেতন পদার্থ—সমস্তই বিশ্বরূপ বিষ্ণুর রূপবিশেষ। এই সমুদয় বিশ্ব পরম ব্রহ্ম বিষ্ণুর শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। সমস্ত শক্তির আধারস্বরূপ এই বিষ্ণুতে মনোনিবেশ অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ মনোনিবেশের নাম শুভ ধারণা। এই বিষ্ণু সমস্ত মঙ্গলের আধার। তিনি যোগীদের চিত্তের এবং সর্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়।[৬]

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর ন্যায় ভাগবতপুরাণে শ্রীকৃষ্ণও আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।[৭] এই পুরাণে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি পদার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই দশটি পদার্থের মধ্যে প্রথম নয়টি আশ্রিততত্ত্ব—দশম পদার্থ আশ্রয়তত্ত্ব। এই দশম পদার্থের সম্যক্ জ্ঞানের জন্যই প্রথম নয়টি পদার্থের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম নয়টির স্বরূপ না জানিলে দশম পদার্থ আশ্রয়তত্ত্বের স্বরূপও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না। এই আশ্রয়তত্ত্বের লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে ভাগবতাকার বলিয়াছেন, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও যাঁহাতে লয়, যাঁহা হইতে জগৎ প্রকাশ পায়, যিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই প্রকৃত 'আশ্রয়'।[৮]

ভাগবতপুরাণে যে এই আশ্রয়স্বরূপের মহিমাই বর্ণিত, তাহা এই পুরাণের প্রথম শ্লোকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, যাঁহাতে স্থিতি ও প্রলয়, যিনি নিজের প্রয়োজনসাধনে সক্ষম, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের প্রকাশ যিনি ইচ্ছামাত্রে করিয়াছিলেন, যাঁহার সত্তায় বিশ্বের সত্তা এবং যিনি নিজের চিৎ-শক্তির প্রভাবে মায়ার কপটতা দূর করিয়াছেন, সেই

পরম সত্যের মহিমা ধ্যানধারণার গোচরে আনা এই পুরাণের উদ্দেশ্য :

> "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
> তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
> তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
> ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥"

ভাগবতপুরাণের 'আশ্রয়স্বরূপ' এই পরম সত্য যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীধরস্বামী তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকা' নামক টীকায় দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন :

> "দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
> শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥"

অর্থাৎ যিনি আশ্রিতদের আশ্রয়, যিনি সকলের মূল আশ্রয় এবং যিনি জগৎসমূহের আশ্রয়—ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থকে (আশ্রয়পদার্থকে) নমস্কার করি। ভাগবতপুরাণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত জগতেরই আশ্রয়, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রুতিগণের স্তবে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই স্তবে প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম, তিনিই সকলের উপাদান-কারণ, তাঁহা হইতেই সব কিছুর আবির্ভাব ও তিরোভাব। মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘট উৎপন্ন, তেমনই ব্রহ্ম হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উদ্ভূত। এই কারণেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁহাদের মন ও বাক্যকে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন।[১]

শ্রুতিগণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ব্রহ্মসংহিতাতে প্রতিফলিত

হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দই সমগ্র জগতের আশ্রয়, ব্রহ্মাদি দেবগণও যে তাঁহার অংশস্বরূপ, তাহা ব্রহ্মসংহিতাকার একটি শ্লোকে ঘোষণা করিয়াছেন।[১০] শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও অন্য দেবগণ এবং জগতের যাবতীয় বস্তুরই মূল আশ্রয় শ্রীগোবিন্দ। ইহা বর্ণনা করিয়া এখন প্রসঙ্গের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য ব্রহ্মার আশ্রয়ও যে শ্রীগোবিন্দ, তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে বর্ণিত হইতেছে। সূর্য যেমন নিজ নামে বিখ্যাত সূর্যকান্তমণিরূপ প্রস্তরে নিজেব তেজ প্রকাশিত করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করে—সূর্যকান্তমণির দাহ করিবার যে-শক্তি তাহা যেমন তাহার নিজস্ব নহে, সূর্যেরই শক্তি, তেমনই শ্রীগোবিন্দ উৎকৃষ্ট জীবিশেষে নিজ তেজ অর্থাৎ সৃজনশক্তি প্রকটিত করিয়া সেই জীবরূপ উপাধি অংশের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্তা। যদিও দুর্গা নামক দেবীমায়া কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর সপক্ষে এইরূপ সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম করিয়া থাকেন, যদিও বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব সকলেই গর্ভোদকশায়ীব অবতাররূপ বিলাস, তথাপি তিনিও শ্রীগোবিন্দের আশ্রিত ও কলা। ফলতঃ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হওযায় সকলেই শ্রীগোবিন্দের আশ্রিত এবং শ্রীগোবিন্দ হইতেই সকলের উৎপত্তি।

ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতার এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতকারও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যায বলিয়াছেন ঃ

> "কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম।
> কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥"[১১]

বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী গীতার ঃ

> "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—

শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, আমি তাঁহার, তিনি আমার, তিনিই আমি—এই তিন রকমের উপলব্ধিই শরণাগতের লক্ষণ।

অতএব দেখা যাইতেছে, পরমারাধ্য দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা অন্য যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, তিনিই-যে সর্বাশ্রয় এবং সমস্ত সৃষ্টিই-যে তাঁহার আশ্রিত, সে বিষয়ে বৈদান্তিক হইতে ভক্তিবাদী পর্যন্ত সকলেই একমত।

শুভাশ্রয়কে আশ্রয়ের উপায়

আশ্রয়ের স্বরূপ আলোচনার পর প্রশ্ন হইতেছে, তাঁহাকে আশ্রয়ের উপায় কি? শুভাশ্রয় ভগবানকে আশ্রয় করিতে হইলে সাধকের যোগ্য প্রস্তুতির প্রয়োজন, কারণ দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন তাঁহাকে আশ্রয় করা যায় না। এই কারণেই বিষ্ণুপুরাণ পাতঞ্জল যোগদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া এই শুভাশ্রয়কে আশ্রয়ের উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যোগীকে প্রথমে বিষয়বাসনা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে হইবে, পরে শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি বিষয়ভোগে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া চিত্তের বশে আনিতে হইবে। কারণ ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে সাধক কখনই যোগসাধনে সমর্থ হন না। 'প্রাণায়াম' এবং 'প্রত্যাহার'-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভাশ্রয়রূপ পরমেশ্বরে দৃঢ়ভাবে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইবে। যোগী তন্ময় হইয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশ করিয়া যে পর্যন্ত ধারণা সুদৃঢ় না হয়, সেই পর্যন্ত চিন্তা করিবেন। গমনকাল, স্থিতিকাল অথবা অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিবার সময় যদি বিষ্ণু হৃদয় হইতে অন্তর্হিত না হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যোগীর 'ধারণা'[১২] সিদ্ধ হইয়াছে।[১৩]

বিষ্ণুপুরাণের খাণ্ডিক্য-কেশিধ্বজ আখ্যানের ভিত্তিতে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক J. B. Von Buitenen

"The Subhasraya Prakarana and the Meaning of Bhavana" নামক প্রবন্ধে শুভাশ্রয়-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।[১৪] তিনি বলিয়াছেন, "......when the breath is brought under control with *pranayama*, and the senses with *pratyahara*, the *yogin* must put his mind on the auspicious substratum (*Subhasraya*); whereupon the question arises, what is *Subhasraya*? The next *yoganga* after *pratyahara* is, of course, *dharana* from the root dhr (with suffix) to have something held or supported by or on an adhara 'a hold', 'a support' or its synonym '*asraya*'. In other words, which object of the mental fixation called '*dharana*' is really pure? The reply is '*Brahman*'. ......The *yogin* concentrates on *amurta* and the *yogayuj* on *murta*. This *murta*, at last, is defined as '*Subhasraya*'. Finally the three *Saktis* are contained in an essentially personal Supreme Being in its *murta* aspect which constitutes the *Subhasraya*........The three *Saktis*, since they coincide with the two *rupas*, are, therefore, founded on Him, being their foundation, He is the *Subhasraya*."

অর্থাৎ তাঁহার মতে 'প্রাণায়াম' ও 'প্রত্যাহারের' পর যোগী যাঁহাকে 'ধারণা' করেন তিনি শুভাশ্রয। 'ধারণা' শব্দটি 'ধৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতএব 'ধারণা' অর্থ যাহা ধারণ বা অবলম্বন করা যায অথবা যিনি আধার, অবলম্বন বা আশ্রয। তাঁহার মতে ব্রহ্মের ধারণাই বিশুদ্ধ 'ধারণা'। এই ব্রহ্ম মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে দ্বিবিধ এবং মূর্ত ব্রহ্মই শুভাশ্রয়।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'স্থিতপ্রজ্ঞের' লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে-অনন্য ভক্ত ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া সমাহিত-চিত্ত

হন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।[১৫] আচার্য রামানুজ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, ভক্তকে সমস্ত দোষ পরিহারপূর্বক বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া চিত্তের 'শুভাশ্রয়'-স্বরূপে সমাহিত হইতে হয়। রামানুজ এখানে 'শুভাশ্রয়কে' আশ্রয়ের যে-পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণের প্রভাব তাহাতে সুস্পষ্ট।

এখন প্রশ্ন, এই শুভাশ্রয় বা মূর্ত ব্রহ্ম কোন্ রূপে বা কোন্ মূর্তিতে সাধকের চিত্তে প্রকাশিত? ভাগবতকার বলেন, সমস্ত দেহধারী মনুষ্যের আত্মা শ্রীকৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের জন্য মায়ার দ্বারা দেহধারীরূপে প্রকাশমান:

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"[১৬]

শুভাশ্রয়ের নররূপে আবির্ভাব

এই পুরাণেই অন্যত্র নারদ, পাণ্ডবদের গৃহে মনুষ্যদেহধারী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গোপনে বাস করিতেছেন বলিয়া, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে পরম ভাগ্যবান রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।[১৭] কেবল ভাগবতেই নহে, ভক্তিপথের অবলম্বনীয় শ্রুতিতে, গীতায় এবং একাধিক পুরাণেও পাওয়া যায় যে, মূর্ত পরব্রহ্ম নরদেহেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নরাকৃতিই প্রতিপন্ন হইতেছে। গীতাতেও পাওয়া যায়, অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত হইলে তাঁহারই প্রার্থনা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনুষ্যরূপ দেখান। তখন সেই মনোহর মনুষ্যরূপ দেখিয়া অর্জুন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হন:

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥"[১৮]

বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে—'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি'। অর্থাৎ যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ নামক নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণকারও বলিয়াছেন—বৃষ্ণিবংশে জাত, যাদব-শ্রেষ্ঠ, বীরের বংশধর, যদুকুলের ঈশ্বর, অর্জুনের বরদাতা নরাকৃতি পরব্রহ্ম।[১৯] এখানে স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণে জানা যায়, শুভাশ্রয় পরব্রহ্ম দ্বিভুজ নরাকৃতিতেই সাধকের চিত্তে প্রকাশিত হন। নরাকৃতিতেই তিনি কখনও ব্রজে, কখনও মথুরায়, কখনও বা দ্বারকায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া নানা ভাবে লীলা করেন।

এইরূপে দেশ, কাল প্রভৃতির দ্বারা সীমিত হইলে তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব ও নিত্যত্বের হানি ঘটে কিনা, তিনি সর্বকালের সাধক-গণের আশ্রয়রূপে গণ্য হইতে পারেন কি না এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পরব্রহ্মের নরাকারে প্রকাশ সীমারূপে প্রতীয়মান হইলেও ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্মের শরীরও স্বরূপতঃ অসীম, সর্বব্যাপী ও নিত্য, কারণ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের দেহ এক ও অভিন্ন। ভাগবতকার ব্রহ্ম ও ব্রহ্মমূর্তির অভিন্নতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

> "নাতঃ পরং পরম যদ্‌ভবতঃ স্বরূপ-
> মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
> পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
> ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥"[২০]

ইহার তাৎপর্য এই যে, তোমার যে-রূপ দেখিতেছি তাহা তোমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, তোমার এই রূপ তোমার স্বরূপেরই ন্যায় আনন্দময়, ভেদশূন্য, অনাবৃত, বিশ্বস্রষ্টা, সুতরাং বিশ্ব হইতে অভিন্ন, ভূতসমূহের এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ। শ্রীজীব গোস্বামীও

তাঁহার 'সর্বসংবাদিনী'তে ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্য[২১] উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্ম যে সীমিত হইয়াও সীমাহীন তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সেই শ্রীবিগ্রহ সীমিত হইলেও তাঁহার অসীমতার কথা শুনা যায়। তাঁহার শক্তি অচিন্তনীয় এবং সর্বব্যাপকতা প্রভৃতি গুণসমূহের তিনি একমাত্র আশ্রয় বলিয়া সীমার মধ্যেও তাঁহার সীমাহীনত্ব যুক্তিসঙ্গত। শ্রীজীবের এই উক্তির সমর্থনে কয়েকটি শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

গোপালতাপনী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে 'দ্বিভুজ' বলিয়া তাঁহার সীমার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। আবার উত্তরতাপনীতে এই দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা'। এখানে সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা ইত্যাদি পদে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপকতা বা সীমাহীনতাই প্রকাশিত হইয়াছে।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি মনুষ্যদেহধারী হইলেও সর্বভূতমহেশ্বর। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিরা ইহা না বুঝিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে :

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"[২২]

বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে, ভগবান বিষ্ণুর জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ প্রভৃতি ভগবৎ-শব্দবাচ্য বলিয়া তাঁহারই স্বরূপ-ভূত। এই সমস্তই দেহের ধর্ম। জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি বিষ্ণুর স্বরূপভূত হওয়ায় ইহাদের ধর্মী দেহও বিষ্ণুর স্বরূপভূত, বিষ্ণু হইতে অভিন্ন।[২৩]

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমপুরুষ জগতের মঙ্গলের জন্য মায়ার সাহায্যে দেহধারীর ন্যায় প্রকাশ পাইলেও তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব ও নিত্যত্বের হানি ঘটে না।

সৃষ্টি ত্যাগ করিয়া স্রষ্টাকে আশ্রয়ের কারণ

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নেরও মীমাংসা প্রয়োজন। ইতি-পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা সমগ্র জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি অগ্নি, জল, ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি সর্ববস্তুতে বিরাজমান।[২৪] অর্থাৎ এই বিশ্বের যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর, যাহা কিছু অনুভব-বেদ্য সেই সমস্তই তাঁহার সত্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া সৎ-রূপে বর্তমান। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বপ্ন নহে, মায়া নহে, ভ্রম নহে—ইহা ব্রহ্মময়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই প্রত্যক্ষগোচর বস্তুবিশ্বকে আশ্রয় না করিয়া বিশ্বস্রষ্টাকে আশ্রয় করার প্রয়োজন কি? ভাগবতে শ্রুতিস্তবের দুইটি শ্লোকের[২৫] টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —জ্ঞানবাদিগণ জগৎকে মিথ্যা এবং কর্মবাদিগণ জগৎকে সর্বদা সত্য বলিয়া জানেন; এই উভয় মতই ভ্রান্ত।

এই দুই শ্লোকের প্রথমটির টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী জগৎ মিথ্যা—জ্ঞানবাদীদের এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, এই শ্লোকের 'উভয়যুক্' পদের দ্বারা কার্য ও কারণ উভয়ই অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার ন্যায় বিশ্বও যে সত্য, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কারণের সত্তা নিত্য এবং কার্যের সত্তা অনিত্য। নারদ, দত্তা-ত্রেয় প্রভৃতি বিজ্ঞগণের মতেও এই জগৎ সত্য, যেহেতু ইহা অর্থ-ক্রিয়াকারী। যাহা অর্থক্রিয়াকারী নহে তাহা সৎ নহে, যেমন শুক্তিতে রজত। এই অনুমান-প্রমাণেও জগৎ সত্য, তবে ইহা নশ্বর বলিয়া অনিত্য।

জগতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী অতঃপর কর্মবাদীদের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বেদবাক্যে কর্মফলকে নিত্য বলা হইয়াছে, অতএব জগৎও নিত্য, ইহার কখনও ব্যতিক্রম হইবে না—এই মতবাদ খণ্ডন করিয়া জগতের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বেদ কর্মফলকে নিত্য বলেন নাই, বিধির সহিত একবাক্যতার জন্য লক্ষণার দ্বার কর্মফলের প্রশংসামাত্র করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কর্মফলকে নিত্য বলিলে 'এ জগতে যেরূপ কর্মার্জিত ভোগের ক্ষয় হয়, তেমনই পরলোকে পুণ্যার্জিত ভোগেরও ক্ষয় হইয়া থাকে'—এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রাগভাব এবং ধ্বংস আছে বলিয়াও এই বিশ্ব নিত্য হইতে পারে না।

এইরূপে বিশ্বসৃষ্টির সত্যতা ও অনিত্যতা প্রমাণপূর্বক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মুণ্ডকোপনিষদের[২৬] মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন —এই মন্ত্রে অক্ষর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া কারণ নিত্য ও কার্য সত্য, তাহা মিথ্যাও নহে, নিত্যও নহে, এই বৈষ্ণবমত শ্রুতিগণ এখানে প্রকাশ করিয়াছেন।[২৭]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, বৈষ্ণবমতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মকার্য জগৎ—উভয়ই সত্য হইলেও, ব্রহ্ম মুখ্যার্থে সত্য ও নিত্য আর জগৎ গৌণার্থে সত্য ও অনিত্য। এই কারণেই বৈষ্ণবগণ সত্য অথচ অনিত্য বিশ্ব অপেক্ষা সত্য ও নিত্য বিশ্বস্রষ্টাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥"[২৮]

ইহার তাৎপর্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল জগতেই সীমাবদ্ধ নন, তিনি জগতেরও অতীত। পুরুষসূক্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়, তিনি বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতিগ। তিনি ব্যাপক, জগৎ ব্যাপ্য। ব্যাপক ব্যাপ্যের মধ্যে থাকিতে পারে না। সমুদ্রে তরঙ্গ থাকে কিন্তু তরঙ্গে সমুদ্র আছে ইহা বলা যায় না। এই

কারণেই বৈষ্ণবগণ তরঙ্গরূপ বিশ্বকে আশ্রয় না করিয়া সমুদ্ররূপ বিশ্বস্রষ্টাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

পরিশেষে এই আশ্রয়স্বরূপের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ কিরূপ তাহা আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। ভাগবতকার বৃত্রের উক্তির মধ্য দিয়া আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের প্রতি ভক্তের আকর্ষণের তীব্রতা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃত্র বলিয়াছেন :

"অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥"[২১]

ইহার তাৎপর্য, মাতৃস্তন্যের জন্য ক্ষুধার্ত শিশুর যে ব্যাকুলতা অথবা প্রবাসী স্বামীর সান্নিধ্যলাভের জন্য প্রোষিতভর্তৃকার যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, ভগবানকে আশ্রয় করার জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকণ্ঠেও আবেগ-উদ্দীপ্ত ভাষায় অনুরূপ আকুতিই প্রতিধ্বনিত :

"তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃতপাথার॥
তুমিই তো আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক।
তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার॥"[৩০]

উল্লেখপঞ্জী :

১। ছান্দোগ্য উপনিষদ—৬।৮।২

২। মুণ্ডক উপনিষদ—৩।২।১

৩। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—৩।১৫-১৭

৪। গীতা—১০।২০

৫। ঐ—১১।৩৮; তুলনীয় : ঐ—৯।১৮

৬। বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৪৭, ৫৪-৬০, ৭৪-৭৫

৭। ভাগবতপুরাণ—২।১০।১-২

৮। ঐ—২।১০।৭

৯। ঐ—১০।৮৭।১৫

১০। ব্রহ্মসংহিতা—৫।৫৮

১১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি।২।৯৪

১২। পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগ-সাধনার আটটি অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া নিয়মের অধীন করাই প্রাণায়াম। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগের অভাব ঘটিলে ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক চিত্তের স্বরূপের অনুকরণের মত যে-ভাব হয় তাহাই প্রত্যাহার। প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের পর সাধকের ধারণায় সামর্থ্য জন্মে। অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন করাই ধারণা।

১৩। বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৪৪-৪৫, ৮৪-৮৫

১৪। The Adyar Library Bulletin—Vol-xix, May, 1955

১৫। গীতা—২।৬১

১৬। ভাগবতপুরাণ—১০।১৪।৫৫

১৭। ঐ—৭।১৫।৭৫

১৮। গীতা—১১।৫১

১৯। পাদ্মোত্তর খণ্ড—বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র

২০। ভাগবতপুরাণ—৩।৯।৩

২১। ছান্দোগ্য উপনিষদ—৮।১।১, ৩

২২। গীতা—৯।১১

২৩। বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৯

২৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—২।১৭

২৫। ভাগবতপুরাণ—১০।৮৭।৩৬-৩৭

২৬। মুণ্ডক উপনিষদ—১।১।৭

২৭। শ্রীমদ্‌ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সম্পাদিত—বেদস্তুতিঃ, পৃঃ ১৬৫-১৮৩

২৮। গীতা—৯।৪

২৯। ভাগবতপুরাণ—৬।১১।২৬

৩০। গীতাবিতান—পূজা, ৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবত্তত্ত্বই পূর্ণতত্ত্ব

("বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥")

পরমপুরুষ ব্রহ্ম, বিষ্ণু অথবা শ্রীকৃষ্ণ যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, তিনি যে ভক্তের একমাত্র আশ্রয় এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য ভক্তের আগ্রহ ও আকুলতার যে সীমা নাই—এই সিদ্ধান্তের পর আলোচ্য সেই পরমপুরুষের স্বরূপ কি? ভাগবতকার তাঁহার স্বরূপবর্ণনায় বলিয়াছেন—তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলেন, তাহাই প্রতীতিভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে অভিহিত। ভাগবতকারের এই সিদ্ধান্ত যে-চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিনটি উপাধির স্বরূপ ও সার্থকতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্রহ্মতত্ত্ব

বৃংহ ধাতু হইতে ব্রহ্মশব্দ নিষ্পন্ন—'ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি ইতি শ্রুতিশ্চ'; 'বৃংহতি' অর্থাৎ যিনি বড় আর বৃংহয়তি' অর্থ যিনি বড় করেন। সুতরাং ব্রহ্ম নিজে বড় এবং অন্যান্য পদার্থকেও বড় করেন। ইহাই ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধ অর্থ।

এই ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনা প্রসঙ্গে অদ্বয়বাদী শঙ্কর বলিয়াছেন—বৃংহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জানা যায়, ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। সকলের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ।[১] এখানে শ্রুতিতে উল্লিখিত ব্রহ্মের 'বৃংহতি' অংশকে গ্রহণ করিয়া আচার্য শঙ্কর 'বৃংহয়তি' অর্থাৎ শক্তি অংশকে উপেক্ষা করিয়াছেন। অথচ 'পরাস্য শক্তির্বি-

বিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি একাধিক শ্রুতি-প্রমাণে ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তির কথা স্বীকৃত। শঙ্করাচার্য সেই শ্রুতি-প্রমাণকে উপেক্ষা করায় ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি ঘটিয়াছে। এই কারণেই শ্রীদেবাচার্য তাঁহার 'সিদ্ধান্ত-জাহ্নবী' নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—যাঁহার মাহাত্ম্য সর্বপ্রকার দোষলেশশূন্য, যিনি অচিন্ত্য, অনন্ত, অপরিমিত এবং স্বাভাবিক শক্তি প্রভৃতি গুণযুক্ত, যিনি করুণাসাগর, তিনিই বেদান্তশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম।

বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন—'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্রূপং ব্রহ্ম-সংজ্ঞিতম্।' যিনি স্বয়ং বৃহৎ এবং অপরকে বৃহৎ করেন, তিনিই ব্রহ্ম। ভক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ এবং এইখানেই আচার্য শঙ্করের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন, যে-অবস্থায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত আকৃতি, গুণ ও বিভূতির মধ্যে কোন একটি অপরটির তুলনায় প্রাধান্য লাভ করে না, সেই অবস্থাবিশেষই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই শ্রুতিতে চিদ্রূপ (জ্ঞানরূপ) সত্তা বলা হইয়াছে এবং তিনিই উপনিষদে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানী, ভগবানের নিত্য বর্তমান স্বরূপভূত অনন্ত রূপ-গুণ-লীলা-বিভূতি ধারণা করিতে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই চিদ্রূপ সত্তা অনুভব করেন[২] কিন্তু এই ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্বের অসম্পূর্ণ প্রকাশ।[৩] কারণ তাঁহার মতে, সর্বত্র বৃহৎ গুণযোগেই ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার। স্বরূপে ও গুণসমূহে বৃহৎ—এ বিষয়ে তাঁহার সমান ও তাঁহার চেয়ে বড় কেহ নাই, ইহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবানই অভিহিত হন। মহাপ্রভুও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট ব্রহ্মের সর্বময় স্বরূপের

এই সিদ্ধান্তই কীর্তন করিয়াছেন :

"ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ—অনূর্ধ্ব সমান॥
তাঁহার বিভূতি-দেহ—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার॥"[৪]

পরমাত্ম-তত্ত্ব

নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও ভগবান নামক ব্রহ্মের মধ্যবর্তী যে-স্বরূপ তিনিই পরমাত্মা। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার পরমাত্ম-সন্দর্ভে এই পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণের জন্য ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক উল্লেখ করিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যিনি পুরাণ অর্থাৎ জগতের কারণ তিনিই পরমাত্মা। পরব্রহ্ম ভগবানের প্রথম প্রকাশ এই পরমাত্মা। তিনি সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, জীবের ন্যায় অন্যের অপেক্ষা করেন না, তিনি অজ অর্থাৎ জন্মাদি-শূন্য, পরম যে ব্রহ্মাদি তাঁহাদেরও ঈশ্বর। তিনি নারায়ণ। 'নার' শব্দের অর্থ জীবসমূহ; জীবগণ তাঁহার নিয়মাধীন, তাহাব আশ্রিত। তিনি ভগবান। ভগবান অর্থে ঐশ্বর্যাদি অংশবিশিষ্ট। কারণ সেই আদিপুরুষ ভগবানের অংশস্বরূপ।[৫] তিনি বাসুদেব। বাসুদেব অর্থ সকল ভূতের আশ্রয়। সেই আদি পুরুষ নিজ মায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তির দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি মায়াতে ও মায়িক বস্তুতে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও স্বরূপশক্তির দ্বারা স্বরূপেই আছেন, মায়িক বস্তুতে আসক্ত নহেন। তিনি বাসুদেব বলিয়া সকল ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ[৬] এবং আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। এইরূপে পরমাত্মাই মুখ্যক্ষেত্রজ্ঞ প্রতিপন্ন হইতেছেন।[৭]

এই পরমাত্মার আবির্ভাব আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীজীব নারদীয়-তন্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—পুরুষের আবির্ভাব তিন প্রকার। তাহার মধ্যে যিনি মহৎ-তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলে। আর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমষ্টির অন্তর্যামী তাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ এবং যিনি সর্বভূতের বা ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী তাঁহাকে তৃতীয় পুরুষ বলে।[৮] অন্তর্যামী তিন প্রকার হইলেও কেবলমাত্র ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামীই পরমাত্মা। ইনি যোগমার্গে উপাস্য। এই জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মার কথা মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।১) বলা হইয়াছে ঃ

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

অর্থাৎ (দেহরূপ) একটি বৃক্ষে (জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ) দুইটী পক্ষী বন্ধুর ন্যায় একত্রে থাকেন; তাঁহাদের মধ্যে (জীবাত্মারূপ) একটি পক্ষী স্বাদু কর্মফল ভোগ করেন আর (পরমাত্মারূপ) অপর পক্ষীটি ভোগ না করিয়া কেবল চাহিয়া দেখেন। জীবাত্মার অধিষ্ঠান হৃদয়ে, পরমাত্মারও সেইখানেই; এইজন্যই বলা হইয়াছে, তাঁহারা বন্ধুর ন্যায় একসঙ্গে থাকেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে দেব, মনুষ্য, পশু-পক্ষি-কীট ইত্যাদি অনন্ত কোটি জীব বর্তমান; তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই পরমাত্মা অবস্থিত। তাহা হইলে পরমাত্মাও কি সংখ্যায় বহু ও অনন্ত? তাহা নহে—পরমাত্মা এক, বহু নহে। ইনি সর্বব্যাপক। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি এক হইয়াও বহু রূপে জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। ভাগবতে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তবপ্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছেন ঃ

"তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।

প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥”[১]

একই সূর্য যেমন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই জন্মরহিত এক কৃষ্ণই জীবগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন।

ভগবৎ-তত্ত্ব

ভগবৎ-শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, জন্মাদিবিকারশূন্য, অক্ষয়, যিনি অনির্দেশ্য, ব্যাপক, নিত্য, সর্বগামী হইয়াও অসীম, সর্বভূতের কারণ হইয়াও স্বয়ং অকারণ, সর্বব্যাপী হইয়াও যিনি অন্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত নন, দেবগণ সর্বত্র যাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমধাম। শ্রুতিবাক্যে তিনিই সূক্ষ্ম শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, তিনিই বিষ্ণুর পরমপদ, তিনিই মুক্তিকামীদের ধ্যানের বিষয়। অতঃপর বিষ্ণুপুরাণকার ভগবৎ-শব্দ যে পরমেশ্বরত্ব-বাচক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন :

“সংভর্তেতি তথা ভর্তা ভ-কারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গ-কারার্থস্তথামুনে ॥”

ইহার মর্মার্থ—ভ-কারের দুইটি অর্থ, সংভর্তা এবং ভর্তা। গ-কারের তিনটি অর্থ নেতা, গময়িতা এবং স্রষ্টা। সংভর্তা শব্দের অর্থ পোষক। ভর্তা শব্দের অর্থ ভরণকর্তা, আধার। নেতা শব্দের অর্থ কর্মজ্ঞানফলপ্রাপক। নেতৃত্ব শব্দের অর্থ প্রযোজ্যের পরিচালন-শক্তিত্ব। গময়িতা অর্থ প্রলয়ে কার্যসমূহের কারণের অভিমুখে পরিচালক। স্রষ্টা অর্থ পুনরায় তাহাদের সৃষ্টিকর্তা। বিষ্ণুপুরাণ অতঃপর ‘ভ’ ও ‘গ’—এই দুইটি অক্ষরযুক্ত ‘ভগ’ শব্দের অর্থ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—ইহাদের সমষ্টির নামই ভগ।

ভগবান শব্দের অন্তর্গত 'ভগ' শব্দের এই অর্থ প্রকাশ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ অতঃপর তৃতীয় অক্ষর 'ব'-এর অর্থ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

"বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
সর্বভূতেষ্বশেষেষু ব-কারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥"

অর্থাৎ ভূতাত্মরূপ, অখিলাত্মরূপ সেই সর্বাধিষ্ঠান-ভূত ব্রহ্মে সমস্ত ভূত অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে এবং তিনিও সর্বভূতে বিরাজমান —ইহাঁই ব-কারের অর্থ। সুতরাং এই 'ব'-কারের প্রতিপাদ্য বস্তু অব্যয়।[১০] ইহার পর বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, ভগবান এই মহাশব্দটি পরব্রহ্মভূত বাসুদেবেরই নাম। এই শব্দটি অন্যকে বুঝাইতে পারে না। নিরতিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত পরমেশ্বরই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য অর্থ, অন্য দেবতা বুঝাইতে ইহা গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইরূপে পরব্রহ্মই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য অর্থ ইহা প্রতিপাদন করিয়া বিষ্ণুপুরাণ এই শব্দে যে-ছয়টি গুণ বুঝায় তাহার কথা বলিয়াছেন ঃ

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥"

জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ—এই ছয়টিই ভগবৎ-শব্দ-বাচ্য। জ্ঞানৈশ্বর্যাদি স্বরূপভূত গুণাদিসমন্বিত পরব্রহ্মই ভগবৎ-শব্দ-বাচ্য।[১১]

তিনটি তত্ত্ব সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত

মহাপ্রভুর লীলাবর্ণনা প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতকার অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের তিন রকম প্রকাশ সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্তের বিবরণ দিয়াছেন, এই আলোচনার উপসংহারে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা উপদিষ্ট বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গুরুজনের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার তাহারই অনুসরণে বলিয়াছেন, এক অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই প্রতীতিভেদে, প্রকাশবিশেষে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' নাম ধারণ করেন ঃ

"প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥"

ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপণে তিনি বলিয়াছেন ঃ

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে—ব্রহ্ম সুনির্মল॥
চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥"

ইহার মর্মার্থ, শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিকেই ব্রহ্ম বলেন, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিন্ময় ও মায়াতীত বলিয়া অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম চিন্ময় ও মায়াতীত। পৃথিবী হইতে সূর্যকে যেমন একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ ও নির্বিশেষ বস্তুমাত্র বলিয়া মনে হয়, জ্ঞানমার্গের উপাসকগণেরও তেমনই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নির্বিশেষ স্বরূপটিরই মাত্র অনুভব হইয়া থাকে।

পরমাত্মার তত্ত্ব-নিরূপণে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ

"আত্মা-অন্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥"

ইহার তাৎপর্য, গোবিন্দের অংশ পরমাত্মা একবস্তু, তিনি বহু নহেন, কিন্তু জীব অনন্ত। একই পরমাত্মা কিরূপে অনন্ত কোটি জীবে অবস্থান করেন, গ্রন্থকার তাহা সূর্যের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতেছেন। একইসূর্য যেমন অনন্ত স্ফটিকের প্রত্যেকটিতে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা অনন্ত কোটি জীবে ব্যষ্টি-অন্তর্যামিরূপে প্রকাশিত।

আর ভগবানের স্বরূপ-বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

"পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান॥
বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥"[১২]

অর্থাৎ পরব্যোমের অধিপতি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নারায়ণই বেদ, উপনিষদ ও ভাগবত প্রভৃতিতে পূর্ণতত্ত্বরূপে কীর্তিত। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।

পণ্ডিতপ্রবর ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ এই তিন তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি শব্দের অর্থ জল, বারি ও সলিলের ন্যায় অভিন্ন বস্তু নহে। পরন্তু বরফ, জল ও বাষ্পের ন্যায় একই বস্তুর তিনটি অবস্থা বা স্বরূপের নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি শব্দের অর্থ তিনটি বস্তুর সামান্য লক্ষণ (সচ্চিদানন্দময়ত্ব) অভিন্ন হইলেও, বিশেষ লক্ষণ অভিন্ন নহে। কিন্তু বস্তুর পরিচয় বিশেষ লক্ষণে। সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান শব্দে তিনটি বিভিন্ন বস্তু বুঝাইতেছে; সামান্য লক্ষণে এই তিনটি বস্তুর সহিত অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর ঐক্য থাকাতে এই তিনটি বস্তুকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বেরই

বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন আবির্ভাব বলা যায়। যে-আবির্ভাবে চিদেকরূপ জ্ঞানের কেবল সত্তা বিকশিত কিন্তু যাহাতে কোন শক্তির বিকাশ নাই তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। যে-আবির্ভাবে জ্ঞানের সত্তা বিকশিত, শক্তিও বিকশিত (পূর্ণরূপে নহে) কিন্তু যাহাতে সাক্ষাৎভাবে বিজাতীয় মায়াশক্তির সংশ্রব আছে (দ্রষ্টারূপে) তাঁহার নাম পরমাত্মা। আর যে-আবির্ভাবে সত্তা বিকশিত, শক্তিও বিকশিত এবং যাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে বিজাতীয় মায়াশক্তির কোনও সংশ্রব নাই, তাঁহার নাম ভগবান। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভে এই তিন তত্ত্বের মূলগত পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন।

তিন তত্ত্ব তিন শ্রেণীর সাধকের উপাস্য

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন স্বরূপের মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞানমার্গের, পরমাত্মা যোগমার্গের এবং ভগবান ভক্তিমার্গের সাধকদের উপাস্য। শ্রীধরস্বামী 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম্' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে ঔপনিষদগণ (জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ) বলেন ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভগণ (যোগমার্গের উপাসকগণ) বলেন পরমাত্মা এবং সাত্বতগণ (ভক্তিমার্গের উপাসকগণ) বলেন ভগবান।

চৈতন্যচরিতামৃতকারও বলিয়াছেন :

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—ত্রিবিধ প্রকাশে॥"[১৩]

একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের এইরূপ পৃথক পৃথক নামে চিহ্নিত হইবার কারণ সম্পর্কে ভাগবতাকার বলিয়াছেন—যেমন রূপ, রস প্রভৃতি বহুগুণান্বিত দ্রব্য বস্তুতঃ এক হইলেও পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়, তেমনই ভগবৎ-উপাসনার পথও বিভিন্ন।[১৪] সাধকের সাধনশক্তির তারতম্য অনুসারে পরতত্ত্ববস্তুর

আবির্ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। কারণ বস্তুর অস্তিত্বই বস্তুর উপলব্ধির কারণ নহে, ইন্দ্রিয়ের শক্তিই মূল কারণ। ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্য অনুসারে বস্তু-গ্রহণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। একই অদ্বয়তত্ত্বের উপলব্ধিতে এই তারতম্যের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত কবি মাঘের শিশুপালবধ কাব্যে পাওয়া যায়ঃ

> "চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা
> ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্ ;
> বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি
> ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ ॥"[১৫]

যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ আকাশপথে আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে দেখিলেন, একটি তেজঃপুঞ্জ আসিতেছেন, তারপর নিকটবর্তী হইলে আকৃতি দেখিয়া দেহধারী বলিয়া নির্ধারণ করিলেন, আরও নিকটবর্তী হইলে হস্তপদাদি দেখিয়া পুরুষ বলিয়া বুঝিলেন। অত্যন্ত নিকটে আসিলে নারদ বলিয়া চিনিলেন। এক্ষেত্রে নারদরূপে দেখাই মুখ্য আর জ্যোতিঃপুঞ্জ, দেহধারী ও পুরুষরূপে দেখা গৌণ; একই নারদ কখনো দূরে, কখনো নিকটে থাকায় তাঁহাকে দেখার যেমন তারতম্য ঘটিয়াছে, পরতত্ত্ব-দর্শনেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 'ভগবান'-রূপে পরতত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎই মুখ্য।

পরতত্ত্ববস্তুকে ভগবানরূপে সাক্ষাৎ করাই মুখ্য কেন এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপকেই পূর্ণতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তের কারণ কি—অতঃপর তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

ভগবৎ-তত্ত্বই যে পরমতত্ত্ব তাহা বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে

নির্দেশিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে পরমতত্ত্ব বিষ্ণুর স্বরূপবর্ণনায় বলা হইয়াছে :

"স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্বমিদং জগৎ।
জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি ॥
তদ্‌ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম সদসৎ পরমং পদম্‌।
যস্য সর্বমভেদেন যতশ্চৈতচ্চরাচরম্‌ ॥"১৬

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, যাঁহাতে এই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, যাঁহাতে ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইবে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পরমব্রহ্ম। নিখিল জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, সমগ্র বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই সৎ ও অসৎ উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু। বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় ভাগবতও পরমতত্ত্বের লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"স্থিত্যুদ্‌ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥"১৭

অর্থাৎ হে নরেন্দ্র, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং নিজে অকারণ যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তিকালে, সমাধিতে সৎ-রূপে বর্তমান আর দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন যাঁহার বলে সক্রিয়, তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব নারায়ণ বলিয়া জানিবেন।

এই পরমতত্ত্বই যে ভগবৎ-তত্ত্ব, তাহা শ্রীজীব গোস্বামী ভগবৎ-সন্দর্ভের এই শ্লোকের টীকায় নির্দেশ করিয়াছেন—ভগবানের স্বরূপ-শক্তির অদ্বয় বিলাস বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে স্বভাবতঃ উদাসীন হইলেও, বহিঃ-প্রকৃতি ও জীবের প্রেরণায় (সৃষ্টির আদিতে) ইনি নিজের অংশ বলিয়া লক্ষিত 'পুরুষের' মধ্যস্থতায়

সৃষ্টি, স্থিতি ইত্যাদির কারণ হইয়া পড়েন। এই 'পুরুষ'কে পারিভাষিকভাবে 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত করা হয়। ইনিই ভগবানের মূর্তরূপ (প্রকাশ)। ইহা হইতে বুঝা যায়, ভগবানের স্বরূপশক্তির স্ফুরণ হওয়ায় ইঁহাতেও ভগবত্তা অধিষ্ঠিত।[১৮]

শ্রীজীব গোস্বামী ভগবৎ-সন্দর্ভে ভাগবতের (৪।১১।৩০) শ্লোকের[১৯] বিবরণে বলিয়াছেন, ভগবানের আনন্দ হইতেছে বিশেষ্য, তাঁহার সমস্ত শক্তি বিশেষণ: এই বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্টই ভগবান। এইরূপে ভগবানের বৈশিষ্ট্য সিদ্ধ হওয়ায়, পূর্ণ আবির্ভাবের ফলে ভগবানই অখণ্ড তত্ত্বস্বরূপ। শ্রীজীবের এই টীকার তাৎপর্য এই যে, শক্তিবর্গরূপ বিশেষণরহিত আনন্দ কেবলমাত্র বিশেষ্য। এই আনন্দসত্তা জ্ঞানমার্গের উপাসকদের ব্রহ্ম। আর মায়াতীত, অশেষ জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট আনন্দই ভগবান। এইরূপে শ্রীজীব গোস্বামী অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের তিনটি স্বরূপের মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন

তিন তত্ত্ব মূলতঃ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান পৃথক পৃথক তত্ত্বরূপে বর্ণিত ও পর্যায়ক্রমে জ্ঞানমার্গী, যোগসাধক ও ভক্তিবাদী—এই তিন শ্রেণীর সাধকের উপাস্য হইলেও এই তিন তত্ত্ব মূলতঃ এক। সেই এক তত্ত্ব হইতেছেন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। অদ্বয় অর্থ স্বয়ংসিদ্ধ, সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদশূন্য; 'জ্ঞান'-স্বরূপ অর্থ যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ এবং যাঁহার সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনীরূপা চিৎ-শক্তিও আছে। তত্ত্ব অর্থ সারবস্তু। অতএব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইল সেই পরম সারবস্তু যিনি সজাতীয় ও স্বগত-ভেদশূন্য, স্বয়ংসিদ্ধ, সচ্চিদানন্দময় ও চিৎ-শক্তিবিশিষ্ট। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি যে মার্গেই

উপাসনা করা হউক না কেন, এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় জীবের পরম পুরুষার্থ।

গীতায় অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন। তদ্‌গতচিত্ত একান্তিভক্ত এবং অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে, অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ সাধক। আর যাঁহারা সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত এবং সর্বপ্রাণীর হিতপরায়ণ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সেই অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন।[২০] অর্থাৎ জ্ঞানের পথে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা এবং ভক্তির পথে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা—উভয় পথেই তিনি লভ্য, কারণ তিনিই পরম লক্ষ্য, তিনিই একতত্ত্ব। ভাগবতেও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনা যায়ঃ

> "জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
> দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ॥"[২১]

অর্থাৎ নির্গুণ জ্ঞানযোগ এবং আমাতে ভক্তি—এই উভয়ের ফলেই যদি আমাতে নিষ্ঠা জন্মে, তাহা হইলে এই উভয়ের দ্বারা একই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই দুইটি উপায়েই আমি-যে ভগবান, সেই আমাকেই লাভ করা যায়।

তাই চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, মহাপ্রভুও সনাতন গোস্বামীর অনুরোধে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাগবতের 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্' ইত্যাদি শ্লোকটি সুন্দর বিবৃতিরূপে নির্দেশ করিতেছেন ঃ

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
... ...
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥
ব্রহ্ম-অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস ॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥"[২২]

শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—সূর্য, সূর্যমণ্ডল ও তাহার তেজের পার্থক্যের ন্যায় সেই এক তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ জানিতে হইবে।

তিন তত্ত্ব মূলতঃ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইলেও পূর্বে সাধারণভাবে তাহার যে-স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বরেণ্য দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অদ্বয়তত্ত্ব সম্বন্ধে সেই সকল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, আচার্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ, আচার্য মধ্বের দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রসিদ্ধ।

অতঃপর এই সকল দার্শনিক মতবাদ আলোচিত হইতেছে। তাহার পূর্বে এই আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য 'ভেদ'-তত্ত্বের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। দুইটি বস্তুর প্রত্যেকেই যদি স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলে একটিকে অপরটি হইতে

ভিন্ন বলা যায়। যদি কোন একটি বস্তু কোন একটি বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ঐকান্তিক ভেদ আছে বলা যায় না। এই ভেদ তিন প্রকার—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। সমজাতীয় বস্তুসমূহের মধ্যে যে-ভেদ তাহার নাম সজাতীয় ভেদ, যেমন মানুষে মানুষে এবং বৃক্ষে বৃক্ষে ভেদ। ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে-ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ, যেমন মানুষে ও পশুপক্ষীতে ভেদ। একটি সমগ্র বস্তু বা অংশীর বিশেষ অংশগুলির মধ্যে পরস্পরের যে-ভেদ তাহা স্বগত ভেদ, যেমন একই মানুষের হস্তপদাদি।

অদ্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ

আচার্য শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা[**] এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। এই নামরূপাত্মক প্রত্যক্ষ জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও যাহার বলে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার নাম মায়া। এই মায়ার যোগেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মে পরিণত হন। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় কোন ভেদই স্বীকার করেন না। কিন্তু রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি দার্শনিকগণের নিজেদের মধ্যে জীব, জগৎ এবং ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ লইয়া মতভেদ থাকিলেও ইহারা সকলেই শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আচার্য রামানুজ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের অবতারণা করেন। তাঁহার মতে—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বটে কিন্তু তিনি নির্গুণ নহেন, সগুণ। তিনি সর্বেশ্বর, স্বভাবতঃই সর্বদোষশূন্য, ভেদরহিত, অনন্তকল্যাণগুণযুক্ত পুরুষোত্তম (শ্রীভাষ্য ১।১।১)। ব্রহ্ম একমাত্র তত্ত্ব নহেন। জীব ও জগৎ আরও

দুইটি তত্ত্ব। তবে এই তত্ত্ব দুইটি ব্রহ্মের অন্তর্গত ও আশ্রিতরূপেই সত্য, ব্রহ্ম-বহির্ভুত বা স্বাধীনভাবে সত্য নয়। আচার্য রামানুজ ব্রহ্মের সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহার মতে ব্রহ্মের স্বগত ভেদ আছে। চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জগৎ) তাঁহার স্বগত ভেদ। তাহারা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মের অন্তর্গত, অতএব ব্রহ্মের ন্যায় সত্য কিন্তু ব্রহ্মের দ্বিতীয় নহে। ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট অদ্বয়তত্ত্ব।

ভেদবাদী মধ্বাচার্য পরতত্ত্বকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান ও স্বগত-ভেদশূন্য বলিয়াছেন। জীবাত্মা বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। জীব স্বল্পজ্ঞানানন্দাত্মক এবং ভগবান পূর্ণজ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ। জীব শ্রীহরির নিত্য অনুচর। জগৎ' অনিত্য' কিন্তু 'অসত্য' নহে। জীব ও জগৎ ভগবানের অধীন। ভগবান জীব ও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

আচার্য নিম্বার্ক বলেন, অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক, স্বরূপ, গুণ শক্তি প্রভৃতির দ্বারা বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমই 'ব্রহ্ম' (বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ ১।১।১)। স্বভাবতঃ সর্বদোষশূন্য, অশেষকল্যাণ-গুণশালী শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম (বেদান্তকামধেনু ৪র্থ শ্লোক)। জীব পরমাত্মার অংশ, জীব ও পরমাত্মায় অংশ-অংশি-ভাব—ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব ও পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ (নিম্বার্কভাষ্য ২।৩।৪২)।

বল্লভাচার্যের মতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সাকার, প্রাকৃত গুণ ও আকারাদিরহিত; তিনি নানা বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের আশ্রয়, সর্বধর্মবিভূষিত। কিন্তু ধর্ম ও গুণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মে দ্বৈতের গন্ধ পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ পরব্রহ্মের গুণ অথবা ধর্ম কেবল স্বরূপাত্মক। ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিযোগে জীব-জগৎরূপে অবিকৃতভাবে পরিণত হন। জীব পরব্রহ্মের আনন্দাংশ।

ব্রহ্ম কারণ-অবস্থায় যেরূপ, কার্য-অবস্থায়ও সেইরূপ ; কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অন্যথা হয় না। কার্য ও কারণের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদত্ব শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে প্রতিষ্ঠিত। কার্যকারণরূপ শুদ্ধব্রহ্মের অভেদত্বই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে অদ্বয়বাদী শঙ্কর এবং রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের এই সকল মতবাদ খণ্ডন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিশালী[২৪] পরতত্ত্বের শক্তি ও সেই শক্তির পরিণাম বস্তুসমূহের সহিত পরতত্ত্বের যে-অচিন্ত্য (অর্থাৎ মানুষের সীমিত চিন্তাশক্তির অগম্য), যুগপৎ ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধ, তাহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। ভেদ ও অভেদের সহাবস্থান এবং উভয়ই সমভাবে নিত্য ও সত্য—ইহা অবোধ্য ও অচিন্ত্য বলিয়া মানবের যুক্তি ও ধারণায় প্রতীয়মান হইলেও, শাস্ত্রনির্দিষ্ট বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য। অপ্রাকৃত বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ ভাগবত, গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শব্দ-প্রমাণের মধ্যে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রথিত আছে। ইহাই চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ও গৌড়ীয় গোস্বামিগণের দ্বারা বিস্তারিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত। এই মতবাদে 'ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্', সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য। ব্রহ্ম স্বরূপ, জীব ও মায়া শক্তির আশ্রয় অদ্বয়তত্ত্ব। ইহারা ব্রহ্মেরই অবিচ্ছেদ্য শক্তি। ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান নহেন—তিনি জ্ঞাতা বা সর্বজ্ঞ। জীব পরব্রহ্মের চিৎকণ অংশ—জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন। জীব স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস। আর জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য তবে অনিত্য।

এই মতে শক্তিমানের সহিত শক্তির যে-সম্বন্ধ ব্রহ্মের সহিত জীব, জগৎ প্রভৃতিরও সেই সম্বন্ধ। কেননা, জীব ব্রহ্মের জীবশক্তির

বা তটস্থাশক্তির অংশ, সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি; আর জগৎ ব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদীর মতে কেবল জীব ও জগতের সহিতই যে পরব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধ তাহা নহে; ভগবদ্ধাম, সেখানকার বস্তুসমূহ এবং লীলাপরিকর প্রভৃতি সমস্তই পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপশক্তি। সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তাহাও শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ। আবার ভগবানের রূপ গুণ লীলা প্রভৃতিও তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বিলাস, সুতরাং ইহাদের সহিতও ভগবানের শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধের স্বরূপ কি? তাহা ভেদবাচক, অভেদবাচক না ভেদাভেদবাচক?

পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তির মধ্যে চিৎ-শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি —এই তিনটি শক্তি-যে প্রধান, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে এই তিন শক্তির কথা জানা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।'[২৫]—এই বাক্যে চিৎ-শক্তির কথা, গীতার "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" এবং 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'[২৬] ইত্যাদি বাক্যে মায়াশক্তির কথা, আর "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥"[২৭] ইত্যাদি বাক্যে জীবশক্তির কথা জানা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও এই তিনটি প্রধান শক্তিরই উল্লেখ দেখা যায়।[২৮]

এই তিনটি শক্তিই ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিক—ব্রহ্ম হইতে অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য, অগ্নিদগ্ধ লৌহের দাহিকাশক্তির ন্যায় আগন্তুক নয়, পরন্তু অগ্নির দাহিকাশক্তির মতই স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য। সম্বন্ধের অবিচ্ছেদ্যতাই শক্তিমানের শক্তির পরিচায়ক।

ইহা কেবল ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে নহে, যে কোনও বস্তুর সঙ্গেই তাহার শক্তির এইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের এই অবিচ্ছেদ্যতা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন:

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।"—(আদি/৪)

কস্তুরীর গন্ধকে যেমন কস্তুরীমৃগ হইতে পৃথক করা যায় না, দাহিকাশক্তি বা উত্তাপকে যেমন অগ্নি হইতে পৃথক করা যায়না, সেইরূপ শক্তিকেও শক্তিমান হইতে পৃথক করা সম্ভব নয়। কোন কোন স্থলে অগ্নিস্তম্ভনের কথা শুনা যায়। মহৌষধের প্রভাবে অগ্নির দাহিকাশক্তি লোপ পায়; তখন সেই আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, পৃথক ভাবেই বিলুপ্ত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত নয়। কারণ মহৌষধের প্রভাবে দাহিকাশক্তি স্তম্ভিত হওয়ায় প্রকাশ পাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। শক্তিমান হইতে শক্তিকে পৃথক করা যায় না বলিয়া শক্তি ও শক্তিমান উভয় মিলিয়াই একবস্তু। শক্তিমান বিশেষ্য আর শক্তি হইল বিশেষণ। তাই বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যই বস্তু।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিশেষ্য এবং বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু, বিশেষণকে যদি বিশেষ্য হইতে অর্থাৎ শক্তিকে যদি শক্তিমান হইতে পৃথকই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথক ভাবে শক্তি স্বীকার করারই বা প্রয়োজন কি? কেবল বস্তু বলিলেই তো চলে। ইহার উত্তরে শ্রীজীব বলেন, ইহা প্রকৃত বৈদান্তিক মত নহে। মন্ত্রাদির প্রভাবে কোনও বস্তুর শক্তিমাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়, বস্তুটি থাকে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি

স্তম্ভিত হইলেও অগ্নি থাকে। অর্থাৎ শক্তির অনুভবের অভাব হইলেও শক্তিমানের অনুভব হয়। সুতরাং শক্তির পৃথক নাম না থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এখন দেখা যাক, পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ না অভেদ বর্তমান। পূর্বে উল্লিখিত কস্তুরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে বলা যায়, কস্তুরীর গন্ধকে যখন কস্তুরী হইতে পৃথক করা যায় না, তখন উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু যেখানে কস্তুরী অদৃশ্য, হয়ত কস্তুরী সামান্য দূরে অলক্ষিত ভাবে আছে, সেখানেও তাহার গন্ধ অনুভূত হয়; কস্তুরীর অদৃশ্য অবস্থাতেও যখন তাহার গন্ধ অনুভূত হয়, তখন তাহাদের একেবারে অভিন্নও মনে করা চলে না। আবার কস্তুরী এবং তাহার গন্ধে ভেদ আছে মনে করিলে উভয়কেই দুইটি পৃথক বস্তু মনে করিতে হয়। পৃথক মনে করিলে কস্তুরী ও তাহার গন্ধকে সগন্ধ কস্তুরীর দুইটি উপাদান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। উপাদান বলিয়া গণ্য করিলে গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তুরীর ওজন হ্রাস পাইতে বাধ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতায় জানা যায়, ওজন কমেনা। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ঐকান্তিক ভেদ মনে করা সম্ভব নয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে কেবল অভেদ এইরূপ ধারণা যেমন ভুল, তেমনই কেবল ভেদ এইরূপ ধারণাও ঠিক নয়। অথচ ভেদ আছে বলিয়া যেমন মনে হয়, অভেদ আছে বলিয়াও তেমনই মনে হয়। শ্রীজীবও বলিয়াছেন, শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ অনুভূত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ অনুভূত হয়। তাই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদই স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ যে অচিন্ত্য, তাহাও স্বীকার্য।[২৯] যে জ্ঞান কোন যুক্তিতর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে

না অথচ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও পারা যায় না, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান**, যেমন মিছরি মিষ্ট কিন্তু কেন মিষ্ট—এই কেনর কোন উত্তর নাই। উত্তর নাই বলিয়া, কোনরূপ যুক্তিতর্কদ্বারা প্রমাণ করা যায় না বলিয়া, মিছরির মিষ্টত্ব অস্বীকারও করা যায় না। তাই মিছরির মিষ্টত্বের এই জ্ঞানকেই বলা হয় অচিন্ত্যজ্ঞ ন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, সমস্ত বস্তুর শক্তির জ্ঞানই অচিন্ত্য—অচিন্ত্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত—অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর—'শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ'। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে-ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহাও এইরূপ অচিন্ত্য ব্যাপার। ভেদ এবং অভেদ দুইয়েরই অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, সুতরাং স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, অথচ কোন যুক্তির দ্বারা তাহা প্রমাণও করা যায় না। তাই শক্তি ও শক্তিমানের এই ভেদাভেদ-সম্বন্ধকে শ্রীজীব অতি সঙ্গত কারণেই অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে অভিহিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ আছে মনে করিতে গেলেও অনেক দোষ দেখা যায়, আবার কেবল অভেদ মনে করিতে গেলেও অনেক ত্রুটি লক্ষিত হয়। তর্কের দ্বারা নির্দোষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। তাই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদসাধন যেমন দুষ্কর অভেদসাধনও তেমনই দুঃসাধ্য। এই ভেদাভেদ-নির্ণয় চিন্তাশক্তির অনধিগম্য বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার্য।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের শ্রেষ্ঠত্ব

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ অত্যন্ত ব্যাপক। পূর্বাচার্যগণ ব্রহ্মের সঙ্গে কেবল জীব ও জগতের সম্বন্ধই বিচার করিয়াছেন—জীব ও জগতের অতীত অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধাম, যাহার বিবরণ পুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, সেই ধামের বস্তুসমূহ ও ভগবানের লীলাপরিকর

প্রভৃতির সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন নাই। কিন্তু শ্রীজীব শাস্ত্রপ্রমাণবলে দেখাইয়াছেন, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত এই সমস্তই পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপশক্তির বিলাস, সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহারই শক্তি। জগৎ এবং জগতের বাহিরের সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকায় পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুর সঙ্গেই পরব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্তমান। সুতরাং শ্রীজীবের মতবাদ পূর্বাচার্যগণের মতবাদের তুলনায় ব্যাপক।

এই মতবাদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সকল প্রকার শ্রুতিবাক্যের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন করা হইয়াছে—ব্যবহারিক বলিয়া কোন শ্রুতিবাক্যই উপেক্ষিত হয় নাই, জীব ও জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় নাই, ব্রহ্মের শক্তিকেও অস্বীকার করা হয় নাই এবং মায়া সম্বন্ধেও সন্তোষজনক সমাধান লক্ষিত হয়। ইহাতে মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যায় লক্ষণার আশ্রয়ও লওয়া হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ও অভেদবাচক শ্রুতিবাক্য-গুলিরও অতি সুন্দর সমন্বয় এই মতবাদে পাওয়া যায়।

এই মতবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইহা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। আধুনিক বিজ্ঞান শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বস্তুগত ভেদ এবং অভেদ দুইই স্বীকার করিলেও, তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারে না; বিজ্ঞানের পক্ষেও এই কারণ অচিন্ত্য। কিন্তু কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলেও বিজ্ঞান ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। তাই বলা যায়, শ্রীজীব গোস্বামীর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিজ্ঞানসম্মত। অন্য কোন দার্শনিক মতবাদ এরূপ বিজ্ঞানসম্মত নয়।

এখন প্রশ্ন, শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব কিরূপে রক্ষিত

হইতে পারে ? কারণ, শক্তি স্বীকার করিলেই ভেদ স্বীকার করিতে হয় এবং ভেদ স্বীকার করিলেই অদ্বয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না; ফলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সম্প্রদায় অদ্বয়বাদী বলিয়া সাধারণের যে-ধারণা, তাহাও ভ্রান্ত মনে হইতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ ব্রহ্মের তিনটি শক্তি (স্বরূপ, জীব ও মায়া) স্বীকার করিলেও, ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত কোন প্রকার ভেদই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম চিদ্‌বস্তু, জীবও চিদ্‌বস্তু, ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকর এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপও চিদ্‌বস্তু; ইহাদের অস্তিত্বও স্বতন্ত্র। সুতরাং মনে হইতে পারে, ইহারা ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ। কিন্তু ইহারা কেহই স্বয়ংসিদ্ধ, ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে বলিয়া ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম সজাতীয়ভেদশূন্য। শ্রীজীব সর্বসংবাদিনীতে এই কথাই বলিয়াছেন।

দুঃখপূর্ণ জড় জগৎ চিদ্‌বিরোধী। আর ব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দ-স্বরূপ চিদ্‌বস্তু। সুতরাং মনে হইতে পারে, জড় জগৎ ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু তাহা নহে, কেননা জড়রূপা মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে। জগৎ এই মায়া-শক্তিরই পরিণাম। মায়া এবং মায়ার পরিণতি ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। অতএব শ্রীজীবের মতে ব্রহ্ম বিজাতীয়ভেদশূন্য।

ব্রহ্মের স্বগতভেদও নাই। স্বগত ভেদ বলিতে আভ্যন্তরীণ ভেদ বুঝায়। যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যেই স্বগত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম হইলেন চিদ্‌ঘন বা আনন্দঘন বস্তু। চিদ্ বা আনন্দ ছাড়া ব্রহ্মে অন্য কোন বস্তু নাই; বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া স্বগত ভেদও থাকিতে পারে না। তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন, তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই সকল

ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে। ইহা ব্রহ্মের স্বগতভেদহীনতার পরিচায়ক।

ব্রহ্মের উপাদান-ভেদ নাই, একথা স্বীকার করিয়া লইলেও, আর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, ব্রহ্মের অনেক রূপের কথা শ্রুতি ও পুরাণে পাওয়া যায়। তাঁহার যদি অনেক রূপই থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপভেদ স্বীকার্য কিনা। ইহার উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার সর্বসংবাদিনীতে বেদান্তের 'ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমেতদ্‌বচনাৎ' এবং 'অপি চৈবমেকে' সূত্র দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন।[৩১] এই সূত্র দুইটির মমার্থ—ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহার একরূপতা পরিত্যাগ করেন না। বহুরূপেও তিনি একরূপ। স্মৃতি বলেন, একই পরমেশ্বর বিষ্ণু যে সর্বত্র অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এক হইয়াও স্বীয় ঐশ্বর্যপ্রভাবে সূর্যের ন্যায় বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ভাগবতকারও বলিয়াছেন, 'বহুমূর্ত্যৈকমূর্তিকম্'। এই সব আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পরব্রহ্ম নিজ স্বরূপের একত্ব রক্ষা করিয়াই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সমস্ত রূপকেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ বলা হয়। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের যে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এক পরব্রহ্মই যে ভক্তের ধ্যান অনুসারে নানা রূপে নিজেকে প্রকটিত করেন, তাহা মহাপ্রভুও ঘোষণা করিয়াছেন:

"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ ॥"[৩২]

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের স্বরূপভেদ নাই। সুতরাং ভগবৎ-স্বরূপসমূহ ব্রহ্মের স্বগত ভেদ নহে।

অতঃপর প্রশ্ন, ভগবৎ-স্বরূপসমূহ পরব্রহ্মের স্বগত ভেদ না হইলেও, সজাতীয় ভেদ কি না। কারণ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে

বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন কিন্তু এই বিশ্বরূপকে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ মনে করেন নাই। তাই তাঁহার চিরপরিচিত রূপ দেখাইবার জন্য অর্জুন প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন রূপ মনে করিয়া তাঁহার সজাতীয় ভেদ বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। কিন্তু এই সব বিভিন্ন রূপ স্বয়ংসিদ্ধ, কৃষ্ণ-নিরপেক্ষ নহে বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ নহে। এই কারণেই 'বৃহৎ ভাগবতামৃত'-কার বলিয়াছেন—'একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতার-সমষ্টিরূপঃ।'

উপসংহারে তাই বলা যায়, শ্রীজীবের মতে ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদশূন্য। সেই কারণেই তাঁহার অদ্বয়ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে শ্রীজীব স্বগত ভেদের প্রশ্ন বিচার করিয়া ভাগবতের :

> "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

—শ্লোকের ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবান এই তিন তত্ত্বের আপাতবিরোধ খণ্ডন করিয়া শ্রীকৃষ্ণই-যে অদ্বয়তত্ত্ব তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া থাকেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই-যে সেই তত্ত্ব, শ্রীজীব গোস্বামী এই সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইলেন? শ্রীজীবের মতে ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। তিনি প্রধানতঃ ভাগবতেরই সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ-যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসদেব তো ভাগবতের কোথাও সুস্পষ্টভাবে এই তত্ত্ব ঘোষণা করেন নাই। তাই হইলে শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের সাহায্যে ইহা কি প্রকারে প্রতিপন্ন করিলেন? তিনি ক্রমসন্দর্ভে এই

প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঋষিরা পরোক্ষবাদী। তাঁহারা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের মত প্রচার করিয়া থাকেন এবং পরোক্ষবাদই যে দেবতাদের প্রিয়, তাহা উপনিষদে এবং ভাগবতেও স্বীকৃত [৩৩]; ব্যাসদেব ভাগবতে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব ঘোষণা না করিয়া তাঁহার নানাবিধ লীলা যে-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার সেই সকল বিস্ময়কর লীলা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ ও উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তসমূহ তাঁহার মহিমা যে-ভাবে কীর্তন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণই-যে পরম দেবতা, তিনিই-যে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১। ব্রহ্মসূত্র—১।১।১ শঙ্করভাষ্য

২। তত্ত্বসন্দর্ভের অবতরণিকায়—"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩। ভগবৎসন্দর্ভ—৩য় অনুচ্ছেদ

৪। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি।৭।১০৬-১০৭

৫। ভগবান বলিতে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকেই বুঝায়, কিন্তু ভাগবতের এই শ্লোক আদ্যপুরুষকেও ভগবান বিশেষণে বিশেষিত করায় সন্দর্ভকার অর্থ করিলেন, এই পুরুষ যখন ভগবানের অংশ, তখন ষড়ৈশ্বর্যাদি ইহাতে পূর্ণরূপে থাকিতে পারেনা। সুতরাং এখানে ভগবান বলিতে ঐশ্বর্যাদি অংশযুক্ত ইহাই বুঝিতে হইবে।

৬। ক্ষেত্র বলিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই শরীরকে বুঝায়। যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এক এক শরীরে জীবাত্মারূপ এক একটি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন কিন্তু পরমাত্মাই মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ। তুলনীয়—গীতা ১৩।১-২

৭। পরমাত্মসন্দর্ভ—প্রথম অনুচ্ছেদ

৮। ঐ—দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯। ভাগবতপুরাণ—১।৯।৪২

১০। 'ভ', 'গ' এবং 'ব'—এই তিনটি অক্ষরের যে অর্থ করা হইয়াছে সেই অর্থযুক্ত তিনটি অক্ষর দ্বন্দ্ব সমাসে মিলিত হইয়া 'ভগবা' হইয়াছে। এই 'ভগবা' যাঁহার নামরূপ, তিনিই ভগবান।

১১। বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৩-৭৯ ও শ্রীজীব গোস্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ভের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি।২য়।৭-৯, ১২-১৩, ১৫-১৬

১৩। ঐ—মধ্য ২০।১৩৪

১৪। ভাগবতপুরাণ—৩।৩২।৩৩

১৫। শিশুপালবধ—১।৩

১৬। বিষ্ণুপুরাণ—২।৭।৪০-৪১

১৭। ভাগবতপুরাণ—১১।৩।৩৫

১৮। ভগবৎসন্দর্ভ—৪র্থ অনুচ্ছেদ

১৯। ধ্রুবোপাখ্যান প্রসঙ্গে মায়াবী গুহ্যকগণের সহিত যুদ্ধরত ধ্রুবকে পিতামহ মনু যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্য যে-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে এই উক্তি।

২০। গীতা—১২।১-৪

২১। ভাগবতপুরাণ—৩।৩২।৩২

২২। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২০।১৩১, ১৩৪-১৩৭

২৩। শঙ্করাচার্যের 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ—যাহা প্রথমে সত্য বলিয়া মনে হয় অথচ পরে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্পই দেখে এবং যে পর্যন্ত ভ্রান্তি দূর না হয়, সে পর্যন্ত সর্প-জ্ঞান থাকে; রজ্জু বলিয়া জানিবার পর সর্প অসত্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ভ্রমকালীন সর্প আকাশ-

কুসুমের ন্যায় অলীক বা অসৎ নহে। অতএব শঙ্করের মতে জীব ও জগৎ মিথ্যা কিন্তু অলীক বা অসৎ নহে। —সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ (১৩৫৭) পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য।

২৪। ভাগবতপুরাণ—৩ ৩৩।৩—'অতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ'

২৫। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—৬।৮

২৬। গীতা—৭।৪, ১৪

২৭। ঐ—৭।৫

২৮। বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৬১

২৯। সর্বসংবাদিনী—পৃঃ ২২

৩০। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"—মহাভারতের এই বচন এই সত্যের প্রামাণ্যরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

৩১। সর্বসংবাদিনী—পৃঃ ৩১

৩২। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।৯।১৪১ .

৩৩। "পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ।"—ঐতরেয় উপনিষদ—১ ৩।১৪ . "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম।"—ভাগবত-পুরাণ—১১।২১।৩৫

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণই ভগবান

('কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্')

অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণই সেই তত্ত্ব—এই সিদ্ধান্তের পর আলোচ্য বিষয় পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শুধু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই নহেন, স্বয়ং ভগবান—ইহাই ভাগবতপুরাণের বক্তব্য।

এই আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও তাহার তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন। কৃষ্ণ নামের মহিমা বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—বিষ্ণুর পবিত্র সহস্রনাম তিনবার আবৃত্তিতে যে-ফল, কৃষ্ণ নামের একবার আবৃত্তিতে সেই ফল পাওয়া যায়।[১] ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, বিষ্ণুর সকল নাম অপেক্ষা কৃষ্ণাবতার-সম্পর্কিত নাম শ্রেষ্ঠ। আবার লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য নাম হইতে কৃষ্ণ নামই যে সর্বোত্তম, তাহা স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।[২]

পদ্মপুরাণেও দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিয়াছেন, তাঁহার কৃষ্ণ নামই অতি গোপনীয়—ইহা মৃতসঞ্জীবনী।[৩]

মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও কবিকর্ণপূরের গুরুদেব শ্রীনাথ চক্রবর্তীও তাঁহার 'চৈতন্যমতমঞ্জুষা'র অবতরণিকায় বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ নাম তাঁহার কৃষ্ণনামের তাৎপর্য বহন করে বলিয়াই প্রশংসনীয়।

কেবল এই সকল গ্রন্থেই নহে, বৈষ্ণবভক্তের নিকট বিশেষ প্রামাণিক ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ-নির্দেশক গোপালতাপনীশ্রুতি, ব্রহ্মসংহিতা, সাত্বতসংহিতার মধ্যমণি ভাগবতপুরাণ প্রভৃতিতেও একাধিক প্রসঙ্গে কৃষ্ণনামের গৌরব উল্লিখিত হইয়াছে। গোপাল-তাপনীশ্রুতি বলিয়াছেন—'কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্'। ব্রহ্ম-

সংহিতাকার ঘোষণা করিয়াছেন—'কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্'[৪] আর ভাবগতকার বলিয়াছেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।[৫] শ্রীসনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাসের ১১।২৫৭ শ্লোকের টীকায় ভাগবতের উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকাংশের ভিত্তিতে কৃষ্ণনামের মহিমা নির্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—শ্রীরাম,নৃসিংহ প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নাম হিসাবে সমান হইলেও 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই বচন অনুসারে ভগবানের সমস্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণনামের একটা বিশেষত্ব আছে; কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবানের নাম।

সমস্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণনাম কেন শ্রেষ্ঠ, তাহা কৃষ্ণ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিলেই প্রতীত হইবে। কৃষ্ণ শব্দটি 'কৃষ্' ধাতু 'ণ' প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এবং ব্রহ্মসংহিতার টীকায় কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—যিনি অন্য যুগাবতারগণকে কৃষ্ণ বর্ণ (নিজের অধীন) করিয়াছেন, স্বয়ং কৃষ্ণ বর্ণ, সকলের আকর্ষণকারী, যিনি সংসাররূপ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করেন, তিনিই পরমাত্মা সদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ। বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রের দুইটি শ্লোকের সাহায্যে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার এই মত স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।[৬] গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিখ্যাত শ্রীলক্ষ্মীধরও 'শ্রীভগবন্নামকৌমুদী' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—'কৃষ্' ধাতু সত্তাবাচক এবং 'ণ' প্রত্যয় আনন্দবাচক। এই ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে শ্রীকৃষ্ণ যে পরম ব্রহ্ম, তাহাই বলা হইয়াছে। আবার কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণও বুঝায়; সেক্ষেত্রে যিনি নিজের আনন্দের জন্য আকর্ষণ করেন, এই অর্থেও কৃষ্ণ শব্দের দ্বারা পরম ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

পাশ্চাত্ত্য মনীষী Rudolf Otto তাঁহার 'The Idea of the Holy' নামক গ্রন্থে 'Ultimate Reality' বা পরব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনায় তাঁহার সর্বব্যাপকতার ও আকর্ষণীশক্তির উল্লেখ

করিয়াছেন—"The qualitative content of the numinous experience, to which the mysterious stands as form, is, in one of its aspects the element of 'daunting awfulness' and 'majesty'......but it is clear that it has at the same time another aspect, in which it shows itself as something uniquely attractive and fascinating......At its highest point of stress the fascinating becomes overabounding."[৭]

শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

সর্বজনের আকর্ষণকারী, সকলের নিয়ন্তা এই শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে পরতত্ত্ব। পরতত্ত্বের স্বরূপ ইতিপূর্বে[৮] আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে, যিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, সর্বভূতের আশ্রয়, যিনি নিজের শক্তিতে সমস্ত লোককে নিয়ন্ত্রিত করেন, যাঁহার সমকক্ষ বা যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহ নাই, যাঁহার কীর্তি সর্বত্র প্রচারিত, অতুলনীয় অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ সেই ব্রহ্মই পরতত্ত্ব, তিনিই আশ্রয়তত্ত্ব।[৯] উপনিষদে পরতত্ত্ব ব্রহ্মের যে-স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবর্ণনায় তাহারই প্রতিধ্বনি।

বিদুরের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের চরিত্র বর্ণনা-প্রসঙ্গে উদ্ধব বলিয়াছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া সমস্ত ভোগের অধিকারী, তাঁহার সমান অথবা তাঁহার চেয়ে বড় আর কেহ নাই, লোকপালগণও তাঁহার স্তব করেন।[১০] ষষ্ঠ স্কন্ধে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিতে বলিয়াছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝা কঠিন, কারণ তিনি নিরাশ্রয় ও অশরীরী, স্বয়ং নির্গুণ। তিনি নিজে অবিকৃত থাকিয়া এই সগুণ

বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন।[১১] যমলার্জ্জুন-ভঙ্গের পর নলকূবর ও মণিগ্রীব তাঁহাদের স্তবে বলিয়াছেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়সমূহেব ঈশ্বর। তিনি কাল, ভগবান, অক্ষয়, তিনি মহান্, সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী সূক্ষ্ম প্রকৃতি। তিনিই পুরুষ, প্রভু এবং সর্বক্ষেত্রের বিকৃতি তিনিই জানেন।[১২]

উপনিষদের ব্রহ্ম যেরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ সর্বজীবেব অন্তর্যামী; ব্রহ্মের যেরূপ সমকক্ষ বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহ নাই, শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহ নাই· ব্রহ্ম যেমন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-বিচার

এখন দেখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণই-যে পরতত্ত্ব, তিনিই-যে স্বযং ভগবান, ভক্তিবাদিগণ এই সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইযাছেন। অবতারতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, ভগবান দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য রাম, নৃসিংহ, বামন, বরাহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই সকল অবতারে যে ঐশ্বর্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে তাঁহারা সচরাচর যদিও ভগবান নামেই পবিচিত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্তার কেবল আংশিক বিকাশ; তাহার পবিপূর্ণতম প্রকাশ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণই এই সকল অবতারের আবির্ভাব ঘটান. পঞ্চরাত্রের ভাষায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'পূর্ণষাড়্গুণ্যবিগ্রহ'। ভাগবতে তাই ব্রহ্মার স্তুতিতে বলা হইয়াছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসৎ, দুর্দমনীয় অসুর প্রভৃতির দমন এবং সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য দেব, ঋষি, মনুষ্য ও মৎস্য প্রভৃতির যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩]

ব্রহ্মার এই স্তব হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত লীলাবতার শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আবির্ভূত। কেবল লীলাবতার নহে, গুণাবতার এবং পুরুষাবতারসমূহের উপরও যে শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারা যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত, তাহাও ভাগবতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতকার এই রহস্যের সূচনাকল্পে বলিয়াছেন, জগৎ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়নক, তিনি নিজের শক্তি এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব ঘটান; তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর।[১৪] পুরুষাবতারসমূহের উপর শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্বপ্রসঙ্গে ভীষ্মের স্তবের উল্লেখ করা যাইতে পারে:

"ইতিমতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং প্রকৃতিমুপেযুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ।"[১৫]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান; তাঁহা অপেক্ষা বিরাট আর কেহ নাই; লীলাচ্ছলে তিনি কখনও কখনও প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলেও তিনি প্রকৃতির অধীন নন। এই জন্যই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের আদিপুরুষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন—'পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি।'[১৬]

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অবতারসমূহে ভগবত্তার বিকাশ থাকিলেও কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া তাঁহারা অনিত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রকার উপাধিশূন্য বলিয়া নিত্য। শুকদেবের স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যত্ব যে সিদ্ধ হইতেছে, তাহা শ্রীজীব গোস্বামী উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন—যিনি কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার অন্য মূর্তিগ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। লীলা অপ্রকট হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপেই বিহার করেন। শুকদেব যখন নমস্কার জানান, তখন লীলা অপ্রকট হইয়াছে। অপ্রকটলীলাকালেও শুকদেব শ্রীকৃষ্ণমূর্তিকে নমস্কার করায় উঁহার নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হইতেছে।[১৭]

অবতারসমূহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আর একটি পার্থক্য অবতারগণ মায়ার অধীন, শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সীতার বিরহে এবং লক্ষ্মণবর্জনে রামচন্দ্রের সাধারণ মানুষের মত শোক-কাতরতা, একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া পরশুরামের বীরদর্পে রামাবতারেব সম্মুখে উপস্থিতি, দুই অবতারের পরস্পরের প্রতি আস্ফালন এবং রামচন্দ্রের নিকট পরশুরামের পরাজয় স্বীকার প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবতারসমূহের এই সব মানবোচিত ক্রিয়াকলাপের কারণ এই যে তাঁহারা মায়াবদ্ধ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মায়ামুক্ত। তিনি স্বেচ্ছায় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অনন্ত লীলা সম্পাদন করিযা থাকেন। 'রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমাযামুপাশ্রিতঃ।'

এই সব কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারসমূহের মধ্যে গণনা করিয়াও পদ্মপুরাণের অনুসরণে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ কবিয়াছেন।[১৮]

এই আলোচনা হইতে জানা যায়, অনিত্য অবতারগণ অংশ আর শ্রীকৃষ্ণ অংশী। অবতারসমূহে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ আর শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণতম প্রকাশ। এই কারণেই ভাগবতকার বলিয়াছেন—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

শ্রীকৃষ্ণ-যে স্বয়ং ভগবান তাহার আর একটি প্রমাণ, তাঁহার আবির্ভাবে অন্য সমস্ত অবতার তাঁহাতে বিলীন হয়। গর্গসংহিতায় এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, অষ্টভুজ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের হরি, পূর্ণাবতার নৃসিংহ, শ্বেতদ্বীপের অধিপতি বিরাট্ পুরুষ, পূর্ণাবতার রামচন্দ্র, দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর নর-নারায়ণ সকলেই একে একে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে বিলীন হইলে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।[১৯]

কেবল গর্গসংহিতায় নহে, শ্রীজীবের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে, শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃতে এবং কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতেও এই সিদ্ধান্ত নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীজীব তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের একটি শ্লোকের[২০] ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম, পরম ব্যোম, মায়ার্ত ত সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি স্বেচ্ছায় নানা রূপে অবতীর্ণ হন।[২১]

শ্রীরূপ গোস্বামীও শাস্ত্রের নানা উক্তি সঙ্কলন করিয়া তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে বলিয়াছেন যে, পরমব্যোমের অধীশ্বর নারায়ণ, দ্বারকা চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম চতুর্ব্যূহ, পুরুষ প্রভৃতি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিত প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া নিজ নিজ মহিমা প্রকাশে সমর্থ হন। ইহাদের সকলকে নিজ সত্তায় প্রকাশিত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।[২২]

চৈতন্যচরিতামৃতকার পূর্বাচার্যদের এই সকল উক্তি অনুসরণে বলিয়াছেন:

"পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥"[২৩]

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের মধ্য দিয়াও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। নদনদী, খালবিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত জলরাশি যেরূপ মহাসমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ অনন্ত অংশে বিভক্ত মূর্তিগুলিও অংশী শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ-যে স্বয়ং ভগবান তাহার আর এক প্রমাণ তিনি অচিন্ত্য-তত্ত্ব অর্থাৎ অচিন্ত্য-অনন্তশক্তিবিশিষ্ট। তাঁহাতে নানা বিরুদ্ধগুণের সমন্বয় দেখা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে এই অচিন্ত্যতত্ত্বের স্বরূপ নির্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও পৃথক, পৃথক হইয়াও এক; অংশত্ব ও অংশিত্ব এবং নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ শ্রীকৃষ্ণে একই সময়ে দেখা যায়।[২৪] তিনি ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের সাহায্যে এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-যে এক হইয়াও পৃথক তাহার প্রমাণস্বরূপ একই সময় একই দেহে ষোল হাজার নারীকে বিবাহ ও তাঁহাদের গৃহে অবস্থানের দৃষ্টান্ত শ্রীরূপ গোস্বামী ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন[২৫] আর শ্রীকৃষ্ণ-যে পৃথক হইয়াও এক তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি পদ্মপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে, সেই নির্গুণ, নির্দোষ, আদিকর্তা পুরুষোত্তম দেব হরি বহুরূপ হইয়াও একরূপে শয়ন করেন।[২৬] একই সময়ে অংশত্ব ও অংশিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীরূপ ভাগবতের 'যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্'[২৭] এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি বহুমূর্তি কিন্তু নারায়ণস্বরূপে একমূর্তি। তারপর শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণে বিরুদ্ধশক্তির সমাবেশের দৃষ্টান্তরূপে কূর্মপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করেন। কূর্মপুরাণে বলা হইয়াছে, তিনি সূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল, বৃহৎ হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তচক্ষু। এই সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই বিরাজমান।[২৮]

এই বিরুদ্ধশক্তির ধারা যে প্রকৃতপক্ষে বিরোধমুক্ত, তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীরূপ ভাগবতে দেবতাদের কৃষ্ণস্তুতির উল্লেখ

করিয়াছেন : দেবগণ স্তুতিপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নানা বিরুদ্ধগুণের উল্লেখ করিয়া শেষে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, স্বাধীন; তাঁহাতে অপরিমিত গুণরাশি ও অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য বর্তমান। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন সন্দেহ ও বিবাদের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি মায়াতীত, তথাপি মায়ার প্রভাবে সকল কার্যই তাঁহার দ্বারা সম্ভব। তাঁহার যথার্থ স্বরূপ একই, তথাপি মায়াবশে সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম একাধারে তাঁহাতে বর্তমান। রজ্জুকে সর্প বলিয়া যাহার ধারণা, সে যেমন রজ্জুকে সর্পরূপেই জানে, তেমনই ভগবান সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা, তিনি সেইরূপ মূর্তিতে এবং বিরুদ্ধ ও অচিন্ত্যগুণযোগে ভক্তের কাছে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।[২৯]

পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের যে-অচিন্ত্যশক্তির কথা এখানে বলা হইল, উপনিষদেও ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনায় সেই লক্ষণই পরিস্ফুট। ব্রহ্মের অচিন্ত্যস্বরূপ নির্দেশপ্রসঙ্গে উপনিষদকার 'নেতি'র পথ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর ও অবাহ্য।[৩০]

পরব্রহ্ম বা Absolute Numen অচিন্ত্য। তাঁহার স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই জন্যই উপনিষদ পরব্রহ্মকে 'নেতি' বাচক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার গুণের অভাব বুঝায় না, অপরিমেয় প্রাচুর্যেরই ইঙ্গিত বহন করে। Rudolf Otto তাঁহার The Idea of the Holy নামক গ্রন্থে এই কথা স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"The feeling of the 'wholly other' gives rise in mysticism to the tendency to follow the 'via negationis'

by which every predicate that can be stated in words becomes excluded from the Absolute Numen i.e. from Deity—till finally the Godhead is designated as 'nothingness' and 'nullity', bearing in mind always that these terms denote in truth immeasurable plentitude of being."[৩১] বৈদান্তিকগণের মতেও পরব্রহ্ম 'সদসদ্‌ভ্যামনির্বাচ্যম্‌'। অতএব দেখা যাইতেছে, পরতত্ত্ব-যে অনির্বচনীয়, অচিন্তনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

অবতারগণের উপর কর্তৃত্ব এবং তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি সম্পর্কে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা আলোচনা করা হইল। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এখন তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

'কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌'—বাক্যের তাৎপর্য বিচার

ভাগবতের জন্মগুহ্যাধ্যায়ে (১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়) ভগবানের আবির্ভাবের রহস্য উন্মোচন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে ১৯ ও ২০ সংখ্যক অবতাররূপে গণনা করিয়া পরে[৩২] বলা হইয়াছে, এই সকল অবতার পুরুষের কলা ও অংশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এই দুইটি আপাতবিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে শেষেরটিই যে অধিকতর মূল্যবান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাই-যে ভগাবতকারের অভিপ্রেত, তাহা প্রতিপাদনে শ্রীজীব তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।[৩৩]

প্রথমতঃ, 'অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিবে না'—এই বচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাই সিদ্ধ হইতেছে; ভগবানের কৃষ্ণত্ব নহে। শ্রীজীবের এই যুক্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে 'অনুবাদ' ও

'বিধেয়' এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যে বস্তু জানা আছে, তাহা অনুবাদ (অনু—পশ্চাৎ, বাদ—কথন) আর যাহা অজানা, তাহা বিধেয় (বি—বিশেষভাবে, ধেয়—স্থাপন করার যোগ্য)। এই দুইটি ব্যাকরণশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। বাক্যরচনার নিয়ম এই যে, পূর্বে অনুবাদ এবং পরে বিধেয়ের উল্লেখ করিতে হয়। ভাগবতের এই অধ্যায়ে বিভিন্ন অবতারপ্রসঙ্গে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়া পরে বলা হইয়াছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। সুতরাং পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতবস্তু—অনুবাদ। কিন্তু তিনি যে স্বয়ং ভগবান, তাহা পূর্বে কোথাও বলা হয় নাই বলিয়া তাঁহার ভগবত্তা অজ্ঞাতবস্তু—বিধেয়। অতএব বাক্যরচনার ভঙ্গি হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, স্বয়ং ভগবান—ইহাই ভাগবতকারের অভিপ্রায়।

দ্বিতীয়তঃ, অবতার-প্রকরণে (ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়) অন্যান্য অবতারের সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মূল অবতারী নহেন, পুরুষের অবতার—এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ, সেই প্রকরণেই তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার কথা বলা হইয়াছে। এই দুইটি বাক্যের মধ্যে ভগবত্তা-প্রতিপাদক বাক্যই প্রবল। কারণ, পূর্বমীমাংসা দর্শনে (৬।৫।৪৮) বলা হইয়াছে, পরবর্তী নিয়মের তুলনায় পূর্ববর্তী নিয়ম দুর্বল অর্থাৎ পরবর্তী নিয়মের দ্বারা পূর্ববর্তী নিয়ম বাধিত হয়। সুতরাং পূর্ববিধির দুর্বলতার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বাধিত হইয়া পরবিধি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয়তঃ, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—উক্তিটি শ্রুতিবাক্যের অনুরূপ। শ্রুতি-যে বর্ণনীয় বিষয় অপেক্ষা প্রবল—শ্রুতিবাক্যে যে প্রসঙ্গের বাধা ঘটে, তাহা বেদান্তসূত্রের শঙ্করভাষ্যেও স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রীজীবের এই যুক্তির তাৎপর্য এই যে, মীমাংসা দর্শনে বাক্যগত বিরোধের সমাধানপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—শাস্ত্রের অর্থ বুঝিবার এই ছয়টি উপায়ের মধ্যে যথাক্রমে আগেরটির চেয়ে পরেরটি দুর্বল বলিয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য, বাক্য অপেক্ষা প্রকরণ, প্রকরণ অপেক্ষা স্থান এবং স্থান অপেক্ষা সমাখ্যা দুর্বল।[৩৪] অতএব অবতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বাধিত হইয়া শ্রুতিপ্রমাণে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হইল।

শ্রীজীব গোস্বামী এই যুক্তির বলেই দশম স্কন্ধের মহাকাল পুরাখ্যানে ভূমা পুরুষের উক্তির আক্ষরিক অর্থে শ্রীকৃষ্ণ ভূমা পুরুষের অংশ বলিয়া যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহা দূর করিয়াছেন। মহাকাল পুরাখ্যান 'সমাখ্যা' আর 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—শ্রুতিবাক্য। 'সমাখ্যা' যে শ্রুতিবাক্য অপেক্ষা দুর্বল, তাহা মীমাংসা দর্শনে স্বীকৃত।

শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ' ইত্যাদি শ্লোক অবলম্বনে অন্য অবতারগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু মধ্বাচার্য এই শ্লোকের 'চ' স্থানে 'স্ব' পাঠ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ 'এতে চাংশ' স্থানে 'এতে স্বাংশ' পাঠ অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই সকল অবতারই মূলরূপী স্বয়ং—তাঁহাদের স্বরূপ স্বাংশকলা, জীবের ন্যায় বিভিন্নাংশ নহে।[৩৫] মধ্বাচার্যের এই ব্যাখ্যায় কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে, মধ্বাচার্য যখন অংশ ও অংশীর অভেদ স্বীকার করেন, তখন তাঁহাদের পার্থক্য দেখাইবার সার্থকতা কি? এই আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শ্রীজীব বলিয়াছেন, মধ্বাচার্য অংশীর ও অংশের যে তুল্য শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের ঐক্য বুঝাইবার জন্য।

উভয়ই যদি একই প্রকার শক্তিসম্পন্ন হন, তাহা হইলে কে অংশ, কে অংশী তাহা বুঝা যায় না। সেক্ষেত্রে বাসুদেব ও অনিরুদ্ধ উভয়ই সমান হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। অবতার ও অবতারীর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। বিরুদ্ধ-বাদীদের আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শ্রীজীব আরও বলিয়াছেন, মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যা; পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে এই শ্লোকে 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক হইত—'স্বয়ং ভগবান্' বলিলেই রচয়িতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। কারণ, সকল ভগবৎ-স্বরূপই যদি সমান হয়, তাহা হইলে সকলেই স্বয়ং ভগবান, 'কৃষ্ণ' শব্দের স্বতন্ত্র ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। ইহা ছাড়া মধ্বাচার্য নিজেই 'প্রকাশাদিবন্নৈবপরঃ' (২।৩।৪৫)—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্পষ্ট ভাষায় অংশ ও অংশীর পার্থক্য দেখাইয়াছেন।[৩৬]

এইভাবে মধ্বাচার্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে শ্রীজীব বলিয়াছেন, 'চাংশ'স্থলে 'স্বাংশ' পাঠ গ্রহণ করিয়া বিভিন্নাংশ জীবকে স্বাংশ মৎস্য প্রভৃতি হইতে পৃথক করিয়া দেখানই মধ্বাচার্যের অভিপ্রায়। অতএব অংশ ও অংশীর পার্থক্য নির্দিষ্ট হইল বলিয়া কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

শ্রীজীব কেবল ভাগবতপুরাণের অবতার-প্রকরণ (১ম স্কন্ধের ৩য় 'অধ্যায়) এবং মহাকাল পুরাখ্যানের (১০ম স্কন্ধের ৮৯তম অধ্যায়) অংশত্বসূচক উক্তি খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ভাগবতের অন্যত্র এবং অন্যান্য পুরাণে অংশত্বসূচক যত বাক্য আছে, তাহা খণ্ডন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—জন্মগুহ্যাধ্যায়ের 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' পরিভাষা-বাক্য। ইহা অনিয়মিতভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহকে নিয়মিত করে। শাস্ত্রে পরিভাষা একবারই উল্লিখিত হয়। একবার উল্লিখিত হইলেও তাহার দ্বারা কোটি বাক্য

নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' বাক্যটি গুণবাদ নহে এবং যে বাক্যগুলি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, সেই সমস্ত বাক্যেরই এই বাক্যের আলোকে ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত। এই পরিভাষা-বাক্যে কেবল ভাগবতের পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তিগুলিই নয়, অন্য পুরাণেও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-সূচক বাক্যটি কার্যকরী হইবে, কারণ, ভাগবত পরমার্থনির্দেশক শাস্ত্র ; তাহা ছাড়া এই পরিভাষা-বাক্যটিই তাৎপর্য নির্ণয়ের একমাত্র সহায়ক। পরিভাষা-বাক্য মাত্রেরই যে অন্য বহু বাক্য খণ্ডনের শক্তি আছে, তাহা অন্য গ্রন্থেও দেখা যায়।

এই কারণেই শ্রীজীবের মতে শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি প্রামাণিক টীকাকারগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাবিরোধী এবং অংশ-প্রতিপাদক বাক্য যে অর্থহীন তাহা বুঝাইবার জন্য বারবার এই পরিভাষা-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া শ্রীজীব বলিয়াছেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই-যে সকল বেদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, তাহা বহুবিরোধ খণ্ডন করিয়া তিনি নিজেই ভাগবতপুরাণে বলিয়াছেন—বেদে যাহা বলা হইয়াছে, যাহা খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই সমস্তই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং ইহার দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ৩৭

এইভাবে শ্রীজীব তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে নানা যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে বিরুদ্ধ মতগুলি খণ্ডন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গীতা ও অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা

শ্রীকৃষ্ণই-যে স্বয়ং ভগবান, এই তত্ত্ব গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থেও স্বীকার করা হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" ৩৮

শ্রীঅরবিন্দ এই শ্লোকের 'ক্ষর', 'অক্ষর' ও 'পুরুষোত্তম' এই তিনটি তত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী—আত্মার বহুভূত বহুরূপে যে পরিণাম, তাঁহাকেই ক্ষর-পুরুষ বলা হইতেছে। এখানে পুরুষ বলিতে ভগবানের বহুরূপ (Multiplicity of the Divine Being) বুঝাইতেছে; এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা প্রকৃতিরই অন্তর্গত। অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী, নীরব, নিষ্ক্রিয় পুরুষ; ইহা ভগবানের একরূপ (the Unity of the Divine Being), প্রকৃতির সাক্ষী; কিন্তু প্রকৃতি ও তাহার কার্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমপুরুষই উত্তম, উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব ও অপরিণামী একত্ব এই দুই-ই উত্তমের।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ও সগুণ দুইই তাঁহার বিভাব। শ্রীঅরবিন্দ এই তত্ত্ব আলোচনার শেষে বলিয়াছেন—"যে সর্বোত্তম ভক্তিযোগ অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে চায়, ইহাই (অর্থাৎ এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক পুরাণসমূহের মূলে এই পুরুষোত্তমবাদ নিহিত রহিয়াছে।"[৩৯] আচার্য রামানুজও তাঁহার গীতার ভাষ্যে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, কারণ তাঁহাতেই সর্ববস্তুর লয় বা শেষ।

কেবল গীতাই নহে, গর্গসংহিতাও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদনে বলিয়াছেন, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা ও শ্বেতদ্বীপবাসিনী সখীবৃন্দ, ঊর্ধ্ব-বৈকুণ্ঠবাসিনী অজিতপদাশ্রিত সখীগণ, লোকাচল-বাসিনী সখীসমূহ এবং সমুদ্র হইতে উৎপন্না অখিল লক্ষ্মী সখী সকলেই ব্রজপুরে ব্রজপতির বরে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।[৪০] গর্গসংহিতার এই বিবরণ হইতে প্রতিপন্ন হয়, কেবল মর্ত্যবাসীই নহে, লক্ষ্মী ও বৈকুণ্ঠবাসীদের নিকটও শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বা ভগবত্তা স্বীকৃত। তাহা না হইলে ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণের বরে ইঁহাদের

পক্ষে ব্রজগোপীরূপে জন্মগ্রহণ সম্ভব হইত না। এই কারণে এই সংহিতায় নারদ বলিয়াছেন—'পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং বিদ্ধি মৈথিল।' [৪১]

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—এই সিদ্ধান্তের পর প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব ও নন্দনন্দন উভয় রূপেই পরিচিত; এই দুইটি রূপের মধ্যে কোনটিতে বিশেষ ভাবে তাঁহার ভগবত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ? গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহার ভগবত্তার চরম প্রকাশ। তবে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইযাছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন—বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এই দুই প্রকার রূপের কথা দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে। [৪২] প্রথম শ্লোকের অর্থ, নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে ইনি বাসুদেব নামেও খ্যাত আর দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ, ভগবান জনার্দন পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলে গোপ-গোপাগণের মধ্যে নন্দ-যশোদার অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দুইটি শ্লোকের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবেরই গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বসুদেবেরই পুত্র। তাঁহার জন্মের ঠিক পরেই বসুদেব নন্দ-যশোদা এবং আর সব গোপগোপীর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে ব্রজরাজ নন্দের পত্নী যশোদার নিকট রাখিয়া যশোদার নবজাত সন্তানকে লইয়া আসেন [৪৩] বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন নহেন। এইজন্যই ভাগবতকার দ্বিতীয় শ্লোকে (১০।৮।৫১) 'পুত্রীভূত' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন এই পদের অর্থ, শ্রীকৃষ্ণ নন্দের পুত্র না হইয়াও পুত্র।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ নন্দের পুত্র না হইলে গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের পুত্র বলিবেন কেন আর কেনই বা নন্দ শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্মাদি অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইবেন ? গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই যুক্তির উত্তরে প্রতিপক্ষ বলেন, 'আত্মজ' শব্দ (ভাগবত ১০।৮।১৪) অনৌরস পুত্র বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতাকেও পিতা বলা হইয়া থাকে। গর্গমুনি এই অর্থেই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের পুত্র বলিয়াছেন আর নন্দ যে সন্তান-বদলের কথা জানিতেন না, তাহা ভাগবতেই উল্লিখিত আছে (১০।৩।৫১)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র মনে করিয়া তাঁহার জাতকর্মাদির অনুষ্ঠানে নন্দের উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে কোনই অসামঞ্জস্য নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণ নন্দেরই পুত্র, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণতম প্রকাশ। তাই তাঁহারা বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানা যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব-প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ের স্তম্ভস্বরূপ দার্শনিকপ্রবর শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'গোপালচম্পূ' কাব্যে, ব্রহ্মসংহিতার টীকায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় শ্রীজীবের মূল বক্তব্য, দেবকী-বসুদেব এবং নন্দ-যশোদা উভয় দম্পতিই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিকর। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পরিকরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব থাকে। দেবকী-বসুদেব এবং নন্দ-যশোদার মনের ভাব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী। ইহা কেবল তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং অভিমান, আসলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা নহেন, হইতেও পারেন না। কারণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত,

নিত্য, অনাদি। তাঁহাদের এই অভিমানও অনাদি। শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সম্বন্ধে অনুরূপ ভাব। তাঁহারও এইরূপ অভিমান যে, তিনি দেবকী-বসুদেবের বা নন্দ-যশোদার পুত্র। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ কেবল অভিমানজাত—জন্মগত নহে।

শ্রীজীব তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ভাগবতের শ্লোকের (১০।৮।৫১) 'পুত্রীভূত' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পুত্র শব্দের উত্তর চ্বি প্রত্যয়যোগে 'পুত্রীভূত' শব্দটি গঠিত। ইহার প্রকৃত অর্থ, যিনি কখনও অন্যের পুত্র হইতে পারেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণে ব্রজরাজ নন্দ ও যশোদার পুত্রভাব জন্মিয়াছিল। কারণ ভক্তিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষরূপে আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে—এইরূপ নিয়ম আছে। বাৎসল্যের আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কাহারও দেহ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি পুত্র হন না। বাৎসল্যই তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভাবের কারণ। সেই বাৎসল্য বিশুদ্ধরূপে নন্দ-যশোদার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে উদিত হইয়াছিল। ইহাতে ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রভৃতি ছিল না। অতএব গর্ভজাত না হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে ভাগবতের উক্তি 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ'[৪৪] স্মরণীয়। এই বাক্যের 'আত্মজ' শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দনন্দন তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। নন্দনন্দনরূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যেমন অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদিকথন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'সকললোকমঙ্গলো নন্দনন্দন-দেবতা।'

আরও বলা যায়, বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেও মানুষ যেরূপে জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই

ভাগবতে (১০।২।১৮) বলা হইয়াছে—"অনন্তর বসুদেব কর্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ দেবকী ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব-দিক যেমন চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তেমনই মনের দ্বারা সর্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন।" বহিঃপ্রকাশের পূর্বে মনে ভগবানের আবেশ কেবল যে দেবকী-বসুদেবে ঘটিয়াছিল তা না নহে, সর্বত্রই এই নিয়ম। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ দেখা যায়—প্রথমে অন্তরে আবির্ভাব, পরে বহিঃপ্রকাশ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিষয়ে সর্বত্রই এক রীতি অর্থাৎ প্রীতিবিশেষই তাঁহার আবির্ভাবের কারণ, প্রেমভক্তিতে প্রথমে অন্তরে আবির্ভাব, পরে বাহিরে প্রকাশ।

বাৎসল্যহেতু বসুদেব-দেবকীর এবং নন্দ-যশোদার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল. কিন্তু যে বাৎসল্য ছাড়া শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব সম্ভব হয় না নন্দ-যশোদায় সেই বাৎসল্য সব চেয়ে বেশি। এই জন্যই ব্রজরাজ ও তাঁহার পত্নীতে—নন্দ-যশোদায় শুকদেব প্রভৃতি কৃষ্ণের পুত্রভাব মনে করিয়াছেন, ইহাই 'পুত্রীভূত' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য।[৪৫]

ইহা ছাড়া শ্রীজীব নন্দনন্দন ও বাসুদেব শব্দের যে অর্থনির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও নন্দনন্দনের প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশেষ আকর্ষণের কারণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নন্দনন্দন শব্দের অর্থ নির্দেশপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতার প্রথম শ্লোকের টীকায় তিনি গৌতমীয়তন্ত্রের যে দশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—'নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ' আর বাসুদেব শব্দের অর্থ নির্দেশপ্রসঙ্গে ভাগবতের 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য' ইত্যাদি শ্লোকের (১০।৮।১৪) উল্লেখ করিয়া ঐ টীকায় যে-মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাদের তাৎপর্য এই যে, নন্দনন্দনের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন আনন্দস্বরূপকে আর বাসুদেবের মধ্যে দেখিয়াছেন তাঁহার প্রকাশশক্তি অর্থাৎ

ঐশ্বর্যস্বরূপকে। বাসুদেবের মধ্যে ঐশ্বর্যস্বরূপের উপলব্ধি শ্রীজীবের নিজের কল্পনা নহে, ইহার উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়।[৪৬] পঞ্চরাত্রেও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ ভগবান বলা হইয়াছে। সেখানে তিনি গোপীজনবল্লভ নহেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্বে শ্রীসনাতন গোস্বামীও অন্য প্রকার যুক্তিপ্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দের পুত্র তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোন কোন বৈষ্ণবের মতে মথুরায় এক কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনে অন্য কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দের গৃহে আনিলে বাসুদেব-কৃষ্ণ নন্দনন্দন-কৃষ্ণের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যান। দুই কৃষ্ণের অস্তিত্ব-সমর্থনে তিনি রুদ্রযামলের বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন :

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য যঃ কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

শ্রীলক্ষ্মীধরও তাঁহার 'শ্রীনামকৌমুদী'তে আর এক দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দের পুত্র তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার স্তন্য পান করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কারণ যশোদাব পুত্র অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ শব্দ শুনিবামাত্র প্রথমেই যশোদার পুত্র বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে।

চৈতন্যচরিতামৃতকারও পূর্বসূরীদের এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিকশেখর॥"[৪৭]

তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একান্ত নিজস্ব নহে। গোপালতাপনী, কৃষ্ণোপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রুতি ও উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের এই রূপের

পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কৃষ্ণোপনিষদে—"স্তুবন্তিসততং যস্তু সোঽবতীর্ণো মহীতলে। বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপগোপীসুরৈঃ সহ॥" শ্রীধর স্বামীও ভাগবতের একটি[৪৮] শ্লোকের টীকায় নন্দের পুত্র বলিয়া পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণেরই বন্দনা করিয়াছেন—'তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনরূপিণম্।'

অতএব দেখা যাইতেছে, ভাগবতে যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলা হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবমতে নন্দের পুত্র এবং সেই কারণেই পরব্রহ্ম হইয়াও নরদেহধারী—চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় 'নরবপু তাঁহার স্বরূপ'।[৪৯] শ্রীকৃষ্ণ কেবল নরদেহধারীই নহেন, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি মানবীয় কোমলবৃত্তিতে তিনি পরিপূর্ণতম জীবনেরও প্রতীক। তাঁহার ব্রজলীলা আলোচনা করিলে দেখা যায়, যশোদার প্রতি মনোভাবে, শ্রীদামসুদামের প্রতি বন্ধুত্বে, গোপীগণের প্রতি প্রেমে যথাক্রমে তাঁহার বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর-রসের চরম বিকাশ। পূতনাবধ, কালিয়দমন প্রভৃতি লীলায় তাঁহার চরিত্রের কঠোরতার পরিচয় পাওয়া গেলেও সেখানেও যে করুণার অভাব নাই, তাহা পূর্বেই[৫০] আলোচনা করা হইয়াছে। প্রীতির নিদর্শন রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারে দেখা গেলেও শ্রীকৃষ্ণে ইহার চরম বিকাশ। নিজেকে নিঃশেষে ভক্তের নিকট বিলাইয়া দেওয়া, ভক্তের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করা, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোনও অবতারে দেখা যায় না। রাম প্রভৃতি অবতারের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির চরম উৎকর্ষের কারণ ব্রহ্মসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে :

"রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥[৫১]

অর্থাৎ রামাদি অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে শক্তির আংশিক বিকাশ আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহার মধ্যে শক্তির পরিপূর্ণতম প্রকাশ।

শ্রীজীব গোস্বামী তাই ব্রজলীলার আলোচনাপ্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন—গোকুলেই তাঁহার ঐশ্বর্য, করুণা ও মাধুর্যের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ঐশ্বর্যের প্রকাশ ব্রহ্মমোহনলীলায়, করুণার প্রকাশ পূতনাবধলীলায় আর মাধুর্যের প্রকাশ গোপগোপী-লীলায়।[৫২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদের মতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল নরদেহ ধারণ ও মানুষের মত লীলাই করেন নাই এবং তিনি কেবল মানবীয় কোমলবৃত্তির পরিপূর্ণতম প্রতীকই নহেন, তিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ তাঁহাতে সৎ, চিৎ ও আনন্দেরও পরিপূর্ণতম প্রকাশ। গৌতমীয়তন্ত্রে কৃষ্ণ শব্দের তাৎপর্যব্যাখ্যা হইতে জানা যায়, কৃষ্ণ শব্দে সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মকে বুঝায় আর চিৎ-এর সহিত সৎ ও আনন্দের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এই সচ্চিদানন্দময়ত্বই যে দিব্যজীবন, তাহা এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও সাধক শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থের The Divine Life অধ্যায়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিযাছেন—"Lastly, to be fully is to have the full delight of being. Being without delight of being, without an entire delight of itself and all things is something neutral or diminished; it is existence, but it is not fullness of being. This delight too must be intrinsic, self-existent, automatic; it cannot be dependent on things outside itself: whatever it delights in, it makes part of itself, has the joy of it as part of its universality. All undelight,

all pain and suffering are a sign of imperfection, of incompleteness; they arise from a division of being, an incompleteness of consciouness of being, an incompleteness of the force of being. To become complete in being, in consciousness of being, in force of being, in delight of being and to live in this integrated completeness is the divine living".[৫৬]

বেদান্তে ব্রহ্মের আনন্দাংশ অপরিস্ফুট, বস্তুগত বিচারে তিনি সৎ হইলেও সচ্চিদানন্দ নহেন। এইখানেই বৈদান্তিকের সহিত বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাই ভক্ত বৈষ্ণবের অভিপ্রেত নয়।

জীবে ও শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি নরদেহ ধারণ এবং মানুষের ন্যায় লীলা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জীবের সহিত তাঁহার পার্থক্য কোথায়? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ সুতরাং জীব ক্ষুদ্র, শ্রীকৃষ্ণ বিরাট—জীব সংখ্যায় বহু। শ্রীজীবের ভাষায়—'জীবানাং প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নত্বম্।' কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়। জীবের লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলার সাদৃশ্য থাকিলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জীবের লীলা নিয়ন্ত্রিত করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবতের শ্লোকের (১০।৮৭।৩০) টীকায় বলিয়াছেন, অসংখ্য জীব যদি নিত্য অর্থাৎ আপনার সৃষ্টি না হয় এবং সর্বব্যাপী হয়, তবে তাহারা আপনার সমানই; অতএব 'জীব আপনার শাসনযোগ্য'—সমস্ত শাস্ত্রের এই নির্দেশ মিথ্যা হইয়া যায়। জীবগণ আপনার কার্য বলিয়াই সর্বব্যাপক ও বিরাট

হইতে পারে না। অতএব তাহারা আপনার শাসনাধীন এবং আপনি শাসক এই নিয়মটি সম্ভব হয়। কিরূপে সম্ভব হয়? যাঁহার কার্যে জীব নামক বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম কারণ-রূপে সেই জীবকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহার শাসক হন। Ralph Waldo Trine-ও তাঁহার "In Tune with the Infinite" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"Although the life of God and the life of man in essence are identically the same, the life of God, so far transcends the life of the individual man in that it includes all else beside."

অতএব অনুভূতি ও যুক্তির ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কেবল অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান; নরদেহে নরলীলাতেই সেই ভগবত্তার পরিপূর্ণতম প্রকাশ। কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবই, বা বলি কেন, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী মনীষী শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও গীতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আবেগে আত্মহারা হইয়া মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সমস্ত সৌন্দর্যের সার, পীতবসন, বংশীধারী নরাকৃতি নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম জ্ঞানে স্তুতি করিয়াছেন:

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

* * *

"পরাকৃতমনোদ্বন্দ্বং নরাকৃতিপরব্রহ্ম।
সৌন্দর্যসারসর্বস্বং নন্দাত্মজমহং ভজে॥"

উল্লেখপঞ্জী

১। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র
২। হরিভক্তিবিলাস—১১।২৬৪ দ্রষ্টব্য
৩। ঐ ১১।২৬৭ দ্রষ্টব্য
৪। ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৮
৫। ভাগবতপুরাণ—১।৩।২৮
৬। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—৯২ অনুচ্ছেদ এবং ব্রহ্মসংহিতা—৫।১ শ্লোকের টীকা
৭। Tenth Impression (1946) Pages 31-37
৮। 'আশ্রয়তত্ত্ব' অধ্যায় দ্রষ্টব্য
৯। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—৩।২ ; ৪।১৯ ; ৬।৮, ১১
১০। ভাগবতপুরাণ—৩।২।২১
১১। ঐ —৬।৯।৩৪
১২। ঐ —১০।১০।৩০-৩১
১৩। ঐ —১০।১৪।২০
১৪। ঐ —১১।২৯।৭
১৫। ঐ —১।৯।৩২
১৬। ঐ —১১।২৯।৪৯
১৭। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—৩৮ অনুচ্ছেদ
১৮। লঘুভাগবতামৃত—১।২৮১ ও ৩০৪
১৯। গর্গসংহিতা—গোলোকখণ্ড ৩।২।১-১৪
২০। ভাগবতপুরাণ—১১।১১।২৮
২১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—৯০ অনুচ্ছেদ
২২। লঘুভাগবতামৃত—১।৬৪৫-৪৮
২৩। চৈতন্যচরিতামৃত—১।৪।৯-১১
২৪। লঘুভাগবতামৃত—১।৩৬৫

২৫। ভাগবতপুরাণ—১০।৬৯।২

২৬। "স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ।
একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ॥"

২৭। ভাগবতপুরাণ—১০।৪০।৭

২৮। "অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।
ঐশ্বর্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে॥"

বিষ্ণুপুরাণেও পরতত্ত্ব বিষ্ণুর এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ গুণের উল্লেখ দেখা যায়ঃ 'ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপস্ত্বং সমষ্টিব্যষ্টিরূপবান্।'

২৯। ভাগবতপুরাণ—৬।৯।৩৬-৩৭

৩০। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৩।৮।৮

৩১। Tenth Impression (1946) Pages—201-202

৩২। ভাগবতপুরাণ—১।৩।২৮

৩৩। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২৮ অনুচ্ছেদ

৩৪। মীমাংসাদর্শন—৩।৩।১৪

৩৫। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত মধ্ববচন—২৮ অনুচ্ছেদ

৩৬। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—২৮ অনুচ্ছেদ

৩৭। ভাগবতপুরাণ—১১।২১।৪২-৪৩

৩৮। গীতা—১৫।১৮

৩৯। শ্রীঅরবিন্দের গীতা দ্রষ্টব্য

৪০। গর্গসংহিতা - গোলোকখণ্ড ৫।১-২

৪১। ঐ ঐ ৫।৩৭

৪২। ভাগবতপুরাণ—১০।৮।১৪, ৫১

৪৩। ঐ —১০।৩।৫১

৪৪। ঐ —১০।৫।১

৪৫। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১৪৯ অনুচ্ছেদ এবং ব্রহ্মসংহিতার ৫।১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য

৪৬। বিষ্ণুপুরাণ—১।২।১২

৪৭। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি ৭।৫

৪৮। ভাগবতপুরাণ—১১।২৯।৪৯

৪৯। পরব্রহ্মের নরাকৃতিতে প্রকাশের প্রসঙ্গ 'লীলা' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

৫০। '‘শ্রীকৃষ্ণ' এবং 'ঐশ্বর্য ও মাধুর্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৫১। ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৮

৫২। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১৮৩ অনুচ্ছেদ

৫৩। Sri Aurobindo—The Life Divine, Canada, 1951. Pages 908-909

অষ্টম অধ্যায়

ব্রজভূমি

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি মানুষের দেহ ধারণ ও মানুষের ন্যায় লীলা করেন। লীলারস-আস্বাদনের জন্য রসিকশেখর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই লীলারত। শরণাগতের আনন্দের জন্য নিজে মায়ামুক্ত হইয়াও তিনি মায়া বিস্তার করেন।[১]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি সর্বদাই লীলাময়, তাহা হইলে তাঁহার এই লীলা কোথায় সংঘটিত হইতেছে এবং সেই স্থানের স্বরূপই বা কি, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হইতে পারে। বর্তমান অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে

মহাভারতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলাক্ষেত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> "এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্।
> ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥"

অর্থাৎ তিনি বহুরূপে এই পৃথিবীতে, ব্রহ্মলোকে ও সনাতন গোলোকে বিচরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাক্ষেত্র

কৃষ্ণোপনিষদ বলিয়াছেন—'বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপগোপী-সুরৈঃ সহ'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপী ও দেবতাদের সহিত বৃন্দাবনে ক্রীড়া রত। এই উপনিষদে কৃষ্ণের গোকুল নামক ধামের উল্লেখও দেখা যায় :

> "বংশস্তু ভগবান্ রুদ্রঃ শৃঙ্গমিন্দ্রঃ সখা সুরঃ।
> গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে দ্রুমাঃ॥

গোপালোত্তরতাপনীতে পরব্রহ্ম গোপালের পুরী মধুরা (মথুরা) ও

তাহার আবরণরূপ বৃহৎ বন মধুবন প্রভৃতি বারটি বনের উল্লেখ আছে।

মহাভারত ও এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায়, গোকুল, গোলোক, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি বারটি বনে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে বিরাজিত। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণী, বসুদেব প্রভৃতি নামের উল্লেখ হইতে দ্বারকায় অবস্থানেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরাণ প্রভৃতিতেও দ্বারকা ও মথুরার বহু উল্লেখ দেখা যায়।

এই সকল ধামে শ্রীকৃষ্ণ লীলারত বলিয়া মিলিতভাবে ইহাদের কৃষ্ণলোক বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ধাম বর্ণনাপ্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন ঃ

> "ইহার (পরব্যোমের) উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
> দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
> সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
> শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥"[২]

কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি হইতে দুইটি বিষয় জানা যায়—প্রথমতঃ, কৃষ্ণলোকের তিনটি বৈচিত্রী—গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা; তাহাদের মধ্যে গোকুল সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন ও ব্রজ গোকুলেরই নামান্তর। এই সিদ্ধান্ত কবিরাজ গোস্বামীর নিজের নহে—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত।

গোলোক ও গোকুলের অভিন্নত্ব

এখন দেখা যাক, গোলোক যে গোকুলেরই নামান্তর, এই সিদ্ধান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কিরূপে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ধামনির্ণয়-প্রসঙ্গে হরিবংশ ও মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া গোলোক ও গোকুলের অভিন্নতা প্রমাণ করিয়াছেন।

হরিবংশের একটি শ্লোকে গোলোকের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ উৎপীড়িত গরুগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সেই লোক ধারণ করিয়াছিলেন।[৩] শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে হরিবংশের এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, পৃথিবীতে প্রকাশমান বৃন্দাবনেই ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোবর্ধন ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই অত্যাচার হইতে ব্রজভূমিকে রক্ষা করেন। বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত গোলোকে কখনও এইরূপ অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই তবে যে সেই লোক রক্ষার কথা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য, বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত গোলোক এবং পৃথিবীতে প্রকাশমান গোকুল অভিন্ন। সুতরাং গোকুলের অত্যাচার গোলোকের অত্যাচাররূপে বর্ণিত হইলে কোন দোষ হয় না। ইহা ছাড়া শ্রীজীব গোলোক ও গোকুলের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে উল্লিখিত আছে, একদিন যোগমায়া স্বেচ্ছায় আকাশ হইতে বৈকুণ্ঠকে পৃথিবীমণ্ডলে গোকুলরূপে স্থাপন করিলে সাধুগণের হৃদয়ে অতিশয় ভক্তি জন্মে।[৪]

ঋগ্বেদের মন্ত্রেও ভগবানের বাসস্থানের বর্ণনা আছে।[৫] শ্রীসনাতন গোস্বামী এই ঋকের ব্যাখ্যায় ভগবানের বাসস্থান ও গোকুলের অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন[৬] তাহার তাৎপর্য, তোমাদের (রামকৃষ্ণের) সেই বাস্তু-(লীলাস্থান) সমূহ পাইবার জন্য কামনা করিতেছি। সেই লীলাস্থানগুলি কিরূপ, ইহার পর তিনি তাহা বলিয়াছেন—সেখানে বিচরণশীল গাভীবৃন্দ সর্বপ্রকার আনন্দ দান

করে। এই লীলার স্থান অনির্বচনীয় নন্দগৃহ; ভগবান নিজে সেখানে সর্বদা বিরাজ করেন ও সব রকমের ইচ্ছা পূরণ করেন।

গোলোক ও গোকুলের অভিন্নতা-প্রতিষ্ঠায় শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর যুক্তিধারা আলোচনার পর গর্গসংহিতার উক্তিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি লোকপালগণ কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়া গোলোক দেখিলেন। তাঁহারা যে গোলোক দেখিলেন, তাহাতে গিরিরাজ গোবর্ধন, বসন্তকালের উপযুক্ত আচরণে নিপুণা গোপীগণ ও গাভীবৃন্দ আছে; কল্পবৃক্ষের লতাজালে সেখানে রাসমণ্ডল মণ্ডিত।[৭] গোলোক ও গোকুল যে অভিন্ন, তাহা এই উক্তি হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায়।

গোলোক ও গোকুলের অভিন্নতা প্রতিপাদনের পর শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার[৮] একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন যে গোকুলেরই নামান্তর, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই শ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন—গোকুলের বাহিরে চতুষ্কোণ পরিমিত স্থানের নাম শ্বেতদ্বীপ। ইহার স্বতন্ত্র কোন নাম নাই। কিন্তু চতুষ্কোণের ভিতরের দিক বৃন্দাবন নামে খ্যাত আর বাহিরের দিক শ্বেতদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্বেতদ্বীপেরই পর্যায়শব্দ গোকুল। বাহিরের অংশ শ্বেতদ্বীপ এবং ভিতরের অংশ বৃন্দাবন, উভয়ের মিলিত নাম গোলোক। এইরূপে শ্রীজীব গোলোক ও গোকুলের অভিন্নতা এবং শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন যে গোকুলেরই নামান্তর তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এই গোকুলেরই অন্য নাম যে ব্রজ, তাহা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত চৈতন্যচরিতামৃতকারের 'সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম'

শ্লোকাংশে নির্দেশ করা হইয়াছে। গোকুল ও ব্রজ শব্দ দুইটির যৌগিক ও রূঢ়ি অর্থেও উভয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়। গোকুল শব্দের যৌগিক অর্থ গরুগুলি আর রূঢ়ি অর্থ গরু ও গোপগোপীর বাসস্থান বিশেষ। রূঢ়ি যৌগিক বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে, এই নিয়ম অনুসারে গোকুলের রূঢ়ি অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।[৯]

ব্রজ শব্দেরও যৌগিক ও রূঢ়ি অর্থ আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্রজ্ ধাতুর অর্থ গমন আর ব্রজ শব্দের অর্থ সমূহ। সুতরাং যৌগিক অর্থে 'ব্রজ' বলিতে যে স্থলে অনেকে গমন করে বা অনেকের সমাগম হয় সেই স্থলকে বুঝায়[১০] আর রূঢ়ি অর্থে গো ও গোপগণ যে স্থলে গমন করে। এক্ষেত্রেও রূঢ়ি অর্থের প্রাধান্য বলিয়া 'ব্রজ' অর্থ গরু ও গোপীদের বাসস্থানবিশেষ। অতএব এই আলোচনার শেষে বলা যাইতে পারে, গোলোক, গোকুল, ব্রজ ও বৃন্দাবন ভিন্ন ভিন্ন ধাম নহে, একই ধামের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

ব্রজের ভৌগোলিক পরিচয়

ইহার পর প্রশ্ন হইতেছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র এই গোকুল, ব্রজ বা বৃন্দাবন কোথায় অবস্থিত? গর্গসংহিতার বৃন্দাবন-খণ্ডে সন্নন্দ নন্দের নিকট ইহার ভৌগোলিক সংস্থানের বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, মথুরা বর্হিষদ নগরের পূর্বোত্তরে, যদুপুরের দক্ষিণে এবং শোণপুরের পশ্চিমে অবস্থিত; দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাড়ে একুশ যোজন-পরিমিত মথুরা ব্রজপুর নামে খ্যাত। সেখানে বৃন্দাবন নামে একটি সর্বোত্তম বন আছে; ঐ মনোহর বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। বৃন্দাবনে আছে গিরি গোবর্ধন; সেখানকার যমুনাতীর মঙ্গলময় স্থান; সেখানে নন্দীশ্বর ও বৃহৎসানু নামে আরও দুইটি পর্বত আছে। সেইস্থান বিস্তৃত

বনে পরিবেষ্টিত; ঐ মনোহর বন পশুগণের হিতকারী এবং গোপগোপী ও গরুগুলির আশ্রয়, বহু লতা ও কুঞ্জে বেষ্টিত এবং উহাই বৃন্দাবন নামে পরিচিত।[১১] এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বৃন্দাবন ব্রজের একটি বন হইলেও বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে বৃন্দাবনকেই ব্রজ এবং বৃন্দাবনলীলাকেই ব্রজলীলা বলা হইয়াছে।

হরিবংশেও শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবনের ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে, বৃন্দাবন যমুনার তীরে অবস্থিত। এখানে গোবর্ধনগিরি ও ভাণ্ডীরবন আছে।

বাংলার বৈষ্ণব সাধক-কবিদের মধ্যে বিখ্যাত নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার 'ব্রজপরিক্রমা'য় আদি, বরাহ, পদ্ম, ভাগবত, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বৃন্দাবনের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সাধক-কবির প্রসিদ্ধ কাব্য ভক্তিরত্নাকরের মুদ্রিত সংস্করণের পঞ্চম তরঙ্গরূপে প্রকাশিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ।[১২] এই কারণেই বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু দুইখানি পুঁথি অবলম্বনে স্বতন্ত্র কাব্যরূপে সম্পাদনা করিয়া ইহা প্রকাশ করেন। এই কাব্যে কবি কুড়ি যোজন-বিস্তৃত মথুরামণ্ডল বা ব্রজধামের এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যাহা সচরাচর অন্যত্র দেখা যায় না। ব্রজমণ্ডলের যেখানে যাহা কিছু ভক্তের দ্রষ্টব্য, কবি নরহরি অতি সুললিত ও সরল ভাষায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ লেখনী প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিকে যেন আরও প্রেমময় ও ভক্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। কবি এই কাব্যে আদি বরাহপুরাণের ১৫৩।২৯ শ্লোক অবলম্বনে বারটি বনবিশিষ্ট মথুরার ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছেন:

"দ্বাদশ বিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী।
পুণ্যা পাপহরা শুভা অপূর্ব মাধুরী॥

দ্বাদশ বিপিন সর্ব পুরাণে প্রমাণ।
শুনিতে সে সভ নাম জুড়ায পরাণ॥
মধু তাল কুমুদ বহুলা কাম্য আর।
খদির শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এপার॥
শ্রীভদ্র ভাণ্ডীর বিল্ব লৌহ মহাবন।
যমুনার পরপারে মনোজ্ঞ কানন॥"

সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু 'ব্রজপরিক্রমা'র পরিশিষ্টে বৃন্দাবন-ধ্যান ও বৃন্দাবন-পরিক্রমা নামে আরও দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। ভণিতায কৃষ্ণদাসের উল্লেখ দেখিযা তিনি এই দুইখানি কাব্য কবিরাজ গোস্বামীর রচিত বলিযা সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বলেন, এই দুইখানি কাব্য কৃষ্ণদাসের নামে প্রচারিত হইলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা নহে।[১৩]

দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচযে' বৃন্দাবন-পরিক্রমা নামক একখানি বাংলা পুঁথি (১২১৮ সাল) সংকলন করিযাছেন। ইহাতে বৃন্দাবনের বিভিন্ন বন ও কুঞ্জের উল্লেখ দেখা যায। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার সহিত এই সকল স্থান কি ভাবে যুক্ত, তাহার আনুপূর্বিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও ইহাতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবন, ইহাই পুঁথিখানির মর্মকথা।

ভৌগোলিক বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের বর্ণনাও পাওয়া যায়। হরিবংশে বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে, সর্বপ্রকার গুণযুক্ত বৃন্দাবন প্রচুর পরিমাণ তৃণে আচ্ছন্ন; ইহার বৃক্ষগুলি সুমিষ্ট ফল দান করে। ইহা ঝিল্লিরবশূন্য ও কণ্টকহীন।[১৪] বৃহদ্‌বামন-পুরাণে বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে, বৃন্দাবন কল্পবৃক্ষপূর্ণ, লতাগৃহশোভিত, সমস্ত ঋতুতে সুখকর। এখানে গিরি গোবর্ধন উত্তম নির্ঝরযুক্ত ও সুকণ্ঠ পক্ষিগণের আবাসস্থল, যমুনা

নদী নির্মল-সলিলা ; এখানে রাসলীলার আনন্দে সর্বদা উচ্ছ্বসিত গোপীগণ ও কিশোর কৃষ্ণ বিরাজ করেন। মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রেও বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক বর্ণনায় কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং বিচিত্র পুষ্পের বর্ণবৈভব ও সুগন্ধ বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'বৃন্দাবনশতকে'ও পক্ষিকূজিত, নানা ফুলের বর্ণবিলাস ও গন্ধে আমোদিত, মনোহর বৃন্দাবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, বৈষ্ণব সাধক-কবিদের নিকট প্রাকৃত বৃন্দাবন অপেক্ষা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের মহিমা বেশী বলিয়া প্রাকৃত বৃন্দাবনের বর্ণনা তাঁহাদের রচনায় তেমন পাওয়া যায় না।

ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলাক্ষেত্র

এই ব্রজ বা বৃন্দাবনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লীলাক্ষেত্র। এইখানেই তাঁহার পার্থিব লীলার পরিপূর্ণ প্রকাশ। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে তাই বলা হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিকরগণের সহিত দ্বাপরের শেষ ভাগে এই ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আপন লীলার মাধুর্য আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করান। এইখানেই তিনি কালিয়দমন, পূতনাবধ, যমলার্জুনভঙ্গ, গোবর্ধন-ধারণ, বস্ত্রহরণ, রাস প্রভৃতি লীলা অনুষ্ঠানের দ্বারা শরণাগত ব্রজবাসীদের নানা বিপদ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রা আনন্দময় করিয়া তোলেন। এই সকল লীলার আলোচনা ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে।

দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজ—শ্রীকৃষ্ণের তিনটি লীলাক্ষেত্র হইলেও ব্রজই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ, ব্রজ বা বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজিত আর মথুরা ও দ্বারকায় তাঁহার প্রকাশবিশেষ

বাসুদেব প্রভৃতি রূপে লীলারত। এই কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন :

"মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলাসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥"[১৫]

ব্রজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লীলারত বলিয়া ব্রজলীলার মাধুর্যই সবচেয়ে বেশি। এই লীলা দেখিবার জন্যই গন্ধর্ব ও দেবগণ অত্যন্ত উৎসুক;[১৬] নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী ব্রজলীলার মাধুর্য আস্বাদনের জন্য বৈকুণ্ঠের সুখভোগ তুচ্ছ করিয়া কঠোর তপস্যারত;[১৭] মথুরাবাসিগণ ব্রজগোপীদের ভাগ্যের প্রশংসায় মুখর।[১৮] এমনকি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকায় অবস্থানকালে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ব্রজলীলার কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল।[১৯] এই কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন :

"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥"[২০] এবং ইহার অনুসরণে চৈতন্যচরিতামৃতকারের উক্তি :

"ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥"[২১]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপর ধাম হইতে গোকুলই যে (নামান্তরে ব্রজ বা বৃন্দাবন) সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে :

"সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥"[২২]

অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মের ন্যায় গোকুল নামক মহৎ স্থান শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ঐ ধাম কর্ণিকারতুল্য এবং অনন্তদেবের অংশভূত অথবা অনন্ত যাঁহার অংশ, ঐ ধাম সেই বলরামেরই আবাসস্থল। অতএব

গোকুল মহৎ বা সর্বোৎকৃষ্ট। গর্গসংহিতাতেও বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠ হইতে অন্য কোন উত্তম লোক হয়ও নাই, হইবেও না। কিন্তু একমাত্র বৃন্দাবন সেই বৈকুণ্ঠ হইতেও উৎকৃষ্ট :

"বৈকুণ্ঠাদপরো লোকো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
একং বৃন্দাবনং নাম বৈকুণ্ঠাচ্চ পরাৎ পরম্॥"[২৩]

ভাগবতেও ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদের সৌভাগ্য বর্ণনার দ্বারা পরোক্ষভাবে ব্রজের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে ঃ

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"[২৪]

ইহার তাৎপর্য, ব্রজলীলাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাধুর্যসর্বস্ব স্বরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশের দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দ দান করেন বলিয়াই তাঁহাদের জীবন ধন্য। তাই এই জীবনের জন্য ব্রহ্মারও ঐকান্তিক কামনা।

তবে বৃন্দাবন কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ লীলাস্থলই নয়, পদ্মপুরাণের মতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক হইয়াও বহু ভগবৎ-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ঐ সকল ভগবৎ-স্বরূপ যেমন তাঁহার অংশ, তেমনই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনও স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধাম বৃন্দাবনেরই অংশ। এই পুরাণের পাতালখণ্ডে মহাদেব পার্বতীর নিকট এই কথাই বলিয়াছেন—বৃন্দাবন নিত্য, ব্রহ্মাণ্ডেরও উপরে অবস্থিত। ইহা পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে ঐশ্বর্যময়, নিত্য আনন্দস্বরূপ এবং অক্ষয়। বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বৃন্দাবনের অংশের অংশ।[২৫]

এই সব কারণেই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের কেবল লীলাক্ষেত্র নহে, তিনি ইহার প্রাণস্বরূপ। বিভিন্ন বৈষ্ণব পুরাণ ও কাব্যে তাই

তাঁহাকে 'ব্রজবিধু', 'বৃন্দাবনচন্দ্র' প্রভৃতি বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। চন্দ্রের ষোল কলার ন্যায় বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরও আছে ষোড়শকলা বা শক্তি। তাঁহাদের মধ্যে রাধিকা প্রভৃতি প্রধান এবং রূপমঞ্জরী প্রভৃতি অপ্রধান অষ্ট শক্তি। এই ষোড়শ শক্তির উপরে তাঁহার আরও একটি শক্তি আছে, তাহা বৃন্দাবন; বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের সপ্তদশী কলা বা শক্তি। বরাহতন্ত্রের পঞ্চম পটলে বৃন্দাবনকে এই বিশেষণেই চিহ্নিত করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে. শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরসের আস্বাদনে রাধিকা প্রভৃতি ষোড়শ শক্তি আলম্বন বিভাব আর সপ্তদশী কলা ব্রজ উদ্দীপন বিভাব। এই কারণেই ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের চিরবাঞ্ছিত লীলাক্ষেত্র।

উল্লেখপঞ্জী

১। ভাগবতপুরাণ ১০।১৪।৩৭

২। চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫।১৩-১৪

৩। হরিবংশ ২।১৯।৩৫

৪। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১০৬ অনুচ্ছেদ

৫। ঋগ্বেদসংহিতা ১।১৫৪।৬

৬। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই ঋকের ব্যাখ্যায় মূলতঃ নীলকণ্ঠকেই অনুসরণ করিয়াছেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ কৃষ্ণের আবাসস্থলের বর্ণনামূলক হরিবংশের (২।১৯।৩৫) শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঋগ্বেদসংহিতার এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও ইহার অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১১৭ অনুচ্ছেদ।

৭। গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড—২।৩২-৩৩

৮। ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬

৯। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১০৫ অনুচ্ছেদ

১০। তুলনীয়ঃ "ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা।
প্রশস্তা বৈ ব্রজা লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ॥"
—হরিবংশ ২।৮।১৯

১১। গর্গসংহিতা, বৃন্দাবনখণ্ড—১।১১-১৪, ১৬-১৮

১২। 'ব্রজপরিক্রমা'র ভূমিকা এবং সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, অপরার্ধ পৃষ্ঠা—৩৯১।

১৩। সুকুমার সেন—ঐ—ঐ পৃঃ ৪৭

১৪। হরিবংশ—২।৮।২২-২৩

১৫। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি ২।১৯-২০

১৬। ভাগবতপুরাণ—১০।৩৩,৩-৪

১৭। ঐ—১০।১৬।৩৬

১৮। ঐ—১০।৪৪।১৩-১৬

১৯। বৃহদ্ভাগবতামৃত—১।৬।৩৯-৪১, ৪৩

২০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—দক্ষিণবিভাগ, বিভাবলহরী ১।১২০

২১। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য ২০।৩৩২

২২। ব্রহ্মসংহিতা—৫।২

২৩। গর্গসংহিতা—বৃন্দাবন খণ্ড—১।১৫

২৪। ভাগবতপুরাণ—১০।১৪।৩২

২৫। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড—৩৮।৮-৯

অবতরণিকা

দিগন্তবিস্তৃত সুনীল সমুদ্র যাঁর আলোড়ন, যার গভীর, মনুষ্যের সীমিত শক্তি তাহার বিশালতা পরিমাপ করিতে পারে না, তবু তাহার অন্তঃস্থলে নিহিত রত্নের বিস্ময় নাই। ভারত-ইতিহাসের অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সহিত, সেই সমুদ্রের পরিপূর্ণ উপলব্ধি মানব-মনের অতীত, তবু তাঁহার প্রতি ভারতীয় মানবের আকর্ষণ অপ্রতি-রোধ্য। এই দুর্নিবার আকর্ষণে মহাভারতের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কত প্রেমী ভক্ত, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্রনীতি-বিদ ও ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছেন।

এই চরিত্র সর্বতোমুখী — অত্যাশ্চর্য বহুধা, সেই কারণেই বিচিত্র ও জটিল। তিনি একাধারে গোপবালক ও ব্রজগোপীদের প্রেমিক, বীর যোদ্ধা ও অন্যায়ের অপ্রতিরোধী, রাজনীতিজ্ঞ ও কূটনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও ধর্মসংস্থাপক, শুধু তাই নয়, ভক্তিযোগের ও নবধর্ম প্রবর্তক ও সমন্বয়কারী। তাঁহার চরিত্রে সন্ন্যাসীর ত্যাগ ও গার্হস্থ্যধর্মের অপূর্ব মিলন, রজঃ ও সত্ত্ব গুণের সুন্দর সামঞ্জস্য, প্রচণ্ড কর্মোদ্যম ও মানসিক স্থৈর্যের নির্বিরোধ সমাবেশ। এমন পরিপূর্ণতম জীবনের প্রতি সকল যুগের সকল লোকের আকর্ষণ অনিবার্য। তার আকর্ষণের ফলই হইয়াছে

[পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

বৃন্দাবনেই নিত্যস্থিতি

('বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি')

পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে যে, বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে ব্রজ বা বৃন্দাবনই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সকল ধামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ নহে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ংরূপ, ব্রজভূমিও তেমনই ধামসমূহের স্বয়ংরূপ ; অন্যান্য ধাম ব্রজভূমিরই অংশবিশেষ।

কিন্তু বৈষ্ণবদের মতে বৃন্দাবন কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ধামই নহে, এই ধাম পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামও বটে অর্থাৎ এই ধামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই ধাম ত্যাগ করিয়া তিনি কখনই অন্যত্র যান না। যামলবচনে তাই বলা হইয়াছে— 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি'। মহাপ্রভুও শ্রীরূপ গোস্বামীকে উপদেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

> "কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।
> ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না পারে থাকিতে ॥"[১]

বৈষ্ণবদের এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমে ভগবদ্ধামের স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বৃত্তি

ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে জানা যায়, নারদ সনৎকুমারের নিকট হইতে ভূমাপুরুষ পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার পর প্রশ্ন করেন, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তরে সনৎকুমার বলেন, তিনি স্বমহিমায় বা স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত জানিবে—'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি……।'[২] এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা

যায়, পরব্রহ্মের ধাম তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। গোপাল-তাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরী।' ইহার অর্থ, পরব্রহ্ম গোপালের পুরী (ধাম) সাক্ষাৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। ভাগবতেও বলা হইয়াছে, 'বসুদেবং হরেঃ স্থানম্'*—বসুদেব হরির স্থান। বসুদেব শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ সত্ত্ব—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্'।* বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। সুতরাং ভাগবত হইতেও জানা যায়, ভগবানের ধাম তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

এখানে স্বরূপশক্তির বৃত্তি কথাটির তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন। যে-শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত, তাহাকে বলে স্বরূপশক্তি। ইহাকে চিৎ-শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি এবং পরা শক্তিও বলে। স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। তন্মধ্যে সন্ধিনী পরব্রহ্মের সৎ অংশের শক্তি। ইহাদ্বারা পরব্রহ্ম নিজের ও অপরের সত্তা ধারণ করেন বা অপরকে সত্তা দান করেন। ইহার অপর নাম আধারশক্তি। এই আধারশক্তির দ্বারাই ভগবদ্ধাম প্রকাশিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে ঃ

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় তাহাতে বিশ্রাম॥"*

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম যেমন স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ, তাঁহার পরিকরগণও তেমনই তাঁহার স্বরূপশক্তির আবির্ভাববিশেষ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যখনই যেখানে লীলা করেন, সেই লীলা প্রকাশের পূর্বে তিনি নিজ পরিকর ও ধামের সেখানে আবির্ভাব ঘটান। গর্গসংহিতায় বলা হইয়াছে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভূভার-হরণের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিয়া পরিকরগণকেও যদুবংশে জন্মগ্রহণের নির্দেশ দেন। শ্রীরাধিকা যখন বলেন, যেখানে বৃন্দাবন, যমুনা নদী ও গোবর্ধন গিরি নাই, সেখানে তাঁহার মনের

শান্তি হইবে না, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধাম হইতে চুরাশি ক্রোশ-পরিমিত ভূমি স্বধাম, গোবর্ধন গিরি ও যমুনা নদী ভূতলে প্রেরণ করেন।[৬]

ভগবদ্ধামের বিশেষত্ব

এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন তাঁহার স্বরূপশক্তিরই অংশ এবং উহা তাঁহার নিত্যধাম গোলোক হইতে অভিন্ন।[৭] স্বরূপশক্তির অংশ বলিয়া ভগবদ্ধামে বহিরঙ্গ মায়াশক্তির প্রবেশ নাই তাই ভগবদ্ধাম ভূতলে অবতীর্ণ হইলেও তাহা ভৌম নহে, জড় নহে, চিন্ময়, অবিনশ্বর, অপ্রাকৃত এবং ভগবানের নিত্য লীলাভূমি।

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ভগবদ্ধাম নির্ণয়-প্রকরণে ভগবদ্ধামের এই সকল বিশেষত্ব নানা যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে-সকল যুক্তিতে মথুরা প্রভৃতি ধামের তত্ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিতে বৃন্দাবনের স্বরূপও সিদ্ধ হইবে। তাই মথুরা প্রভৃতি ভগবদ্ধামের স্বরূপ আলোচনায় শ্রীজীব যে-সকল যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, পরে আমরা সেই সমস্ত যুক্তিধারা অনুসরণে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

ব্রজভূমি অধ্যায়ে পুরাণ প্রভৃতি অবলম্বনে বৃন্দাবনের যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বৃন্দাবনকে প্রাকৃত বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে বৃন্দাবন পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিলেও উহা যে প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত, তাহা শ্রীজীব ভাগবতের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভাগবতের একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণলোককে ‘স্বর্গ’ বলা হইয়াছে। যেমন পূতনার মুক্তি-

প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সেই রাক্ষসী জননীদের গম্য স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।[৮] এই স্বর্গ যে দেবতাগণের বাসস্থানরূপ স্বর্গ নহে, তাহা এই শ্লোকের স্বর্গ শব্দের 'জননীগতি' বিশেষণেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ, পূতনার মুক্তিপ্রসঙ্গে জননীদের কৃষ্ণলোক ভিন্ন অন্যত্র গতি বহুবার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন, পূতনা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইয়াছে।[৯] ইহাতে পূতনার সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিই নির্ধারিত হইল। সুতরাং স্বর্গ শব্দে শ্রীকৃষ্ণলোকই বুঝায়—দেবপুরী নহে। এই কৃষ্ণলোক শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মহিমায় পৃথিবী স্পর্শ করিলেও উহা 'ভূতলের স্বর্গখণ্ড'—প্রাকৃত জগৎ হইতে ভিন্ন। শ্রীজীব মথুরার অপ্রাকৃতত্ব প্রতিষ্ঠায় বরাহপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন কিন্তু মথুরা ব্রহ্মার সৃষ্টি নয়; মথুরার সৃষ্টি অন্যরূপ। মথুরার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে বরাহপুরাণের এই উক্তি বৃন্দাবনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রে নারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের যে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেও বৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত স্বরূপই প্রকাশ পাইয়াছে।

বৃন্দাবন কেবল অপ্রাকৃত নহে, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব-বর্জিত বলিয়া জড়বিরোধী, চিন্ময় ও অবিনশ্বর। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কাশীর চিন্ময়তার যে বিবরণ আছে, শ্রীজীব গোস্বামী তাহারই দৃষ্টান্তে বৃন্দাবনের চিন্ময়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা হইয়াছে, প্রলয়কালে সমগ্র সৃষ্টি জলমগ্ন হইলেও কাশী ছত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহা দেখিয়া বিস্মিত মুনিগণ প্রশ্ন করিলে বিষ্ণু বলেন, ঐ ছত্রাকার জ্যোতি হইতেছে কাশী। কাশী কখনই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত নহে অর্থাৎ জড়ধর্মে লিপ্ত নহে বলিয়া উহা কখনও জলমগ্ন হয় না।

এই পুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে, এক দেহের মধ্যে জড় ও চেতনের অবস্থিতি হইলেও যেমন চেতন জড়ধর্মে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মরূপা কাশী এবং জড়রূপা পৃথিবী মিলিত থাকিলেও পার্থিব জড়ধর্ম কাশীকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন জড়ের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, পরমাত্মার নাই, তেমনই পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিলেও কাশীর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই।[১০] এই বিবরণে কাশীর চিন্ময়স্বরূপ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল বৃন্দাবনের নহে, অন্যান্য ভগবদ্ধাম সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। গর্গসংহিতাতেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মথুরা-মণ্ডল আমার সাক্ষাৎ সর্বোত্তম মন্দির। ইহা লোকত্রয়ের অতীত, এই দিব্য মথুরা প্রলয়েও ধ্বংস হয় না।[১১]

বৃন্দাবন অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম বলিয়াই এখানকার স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতন সব কিছুই অলৌকিক, সচ্চিদানন্দময়। বৃন্দাবনের এই অলৌকিক রূপের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতাকার বলিয়াছেন—গোলোকাখ্য শ্বেতদ্বীপে[১২] শ্রীগণ কান্তা, কান্ত পরমপুরুষ, বৃক্ষগণ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, কথা গান, গমন নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দই জ্যোতি এবং তাহাই পরম আস্বাদনীয়, সেই স্থানে কামধেনু হইতে সুমহান ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে, নিমেষার্ধও সেখানে বৃথা অতিবাহিত হয় না।[১৩]

বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি

এই অপ্রাকৃত নিত্য সচ্চিদানন্দময় অলৌকিক বৃন্দাবনই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলাভূমি। এই বিষয়ে লীলা অধ্যায়ে আলোচনা করা হইলেও বর্তমান প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়োজনে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করা হইতেছে। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতির কথা বৈষ্ণব শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতিতে নানা প্রসঙ্গে

নানা রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহাদের কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে আছে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতির প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিতেছেন—বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ-মূর্তি গোবিন্দকে ব্রহ্মা মরুদ্‌গণের সহিত সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিতেছেন। এখানে ক্রিয়াপদের বর্তমান কালে প্রয়োগ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি বুঝাইতেছে। গোপালতাপনী শ্রুতি ছাড়াও বৈষ্ণবদের বেদস্বরূপ ভাগবতে নানা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতির কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই পুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুব-উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবাই একমাত্র গতি, ধ্রুবকে এই উপদেশ দিয়া নারদ তাঁহাকে যমুনাতীরে অবস্থিত মধুবনে গমনের উপদেশ দিয়াছেন, কারণ মধুবনেই শ্রীহরির নিত্যস্থিতি।[১৪] দশমস্কন্ধের কংসবধ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে চানূর ও মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে দেখিয়া মথুরাবাসিগণ যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি বুঝা যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন—ব্রজভূমি পরম পুণ্যবতী। কারণ মনুষ্যরূপে আত্মগোপন করিয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বনমালায় শোভিত হইয়া বলরামের সহিত গোচারণপূর্বক সেখানে নানা রূপ লীলা করেন। গিরিশ ও রমা তাঁহার চরণ সেবা করেন।[১৫] শ্রীজীব বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি আলোচনাপ্রসঙ্গে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—এখানে 'অঞ্চতি' ক্রিয়ার বর্তমান কালে প্রয়োগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ব্রজবিহারের কথাই বলা হইয়াছে।

আদি বরাহপুরাণে নিত্যস্থিতির কথা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

"কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনম্।
বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ॥

গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে।
তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া সেতুবন্ধ মহাপাপ-নাশকারী। সেখানে বলভী অর্থাৎ তৃণদ্বারা গৃহনির্মাণ করিয়া গোপগণের সহিত বিহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা গমন করেন। এই শ্লোকের 'নিত্যকালং স গচ্ছতি' বাক্যের 'নিত্যকালং' এবং বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ 'গচ্ছতি' প্রয়োগের দ্বারা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতির কথা বলা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও আছে, 'যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।' যমুনার জলকল্লোলসমন্বিত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা ক্রীড়া করেন। এইখানে 'সদা' পদের ব্যবহারে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি সিদ্ধ হইতেছে।

বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রেও দেখা যায়, নারদ বৃন্দাবনের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন :

"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।
.. ..
সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ ॥"

অর্থাৎ এই সুন্দর বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ধাম। তিনি এই বন কখনও ত্যাগ করেন না।

অতএব, এই আলোচনা-শেষে অবশ্যই বলা যাইতে পারে, যামলবচন মিথ্যা নহে, শ্রীকৃষ্ণ সত্যই 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।'

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন কাহিনী

তবে বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রুতিপুরাণের উক্তি আলোচনার দ্বারা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি প্রতিপন্ন করিলেও পুরাণের কাহিনী

হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বাল্য-কৈশোরলীলার শেষে কংসবধের জন্য মথুরায় গমন করেন। ভাগবতের কাহিনীতে বলা হইয়াছে, দেবকীর সপ্তম ও অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ রোহিণী ও যশোদার পুত্ররূপে ব্রজে পালিত হইতেছেন—নারদের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কংস তাঁহাদের মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠান। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মথুরাপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণবিরহের আশঙ্কায় গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া নানা রূপে বিলাপ করিতে থাকেন। দশম স্কন্ধের উনচল্লিশ সংখ্যক অধ্যায় আসন্ন বিরহে কাতর গোপীদের বিলাপে পূর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের এই বিলাপ অগ্রাহ্য করিয়াই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া মথুরায় গমন করেন। যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের অসহ্য দুঃখ দেখিয়া 'আমি আবার আসিব' এই সান্ত্বনাবাক্য দূতমুখে তাঁহাদের জানাইয়া মথুরায় যাত্রা করেন।[১৬]

ভক্ত বৈষ্ণবের বিশ্বাস এবং পুরাণের এই কাহিনী পরস্পর-বিরুদ্ধ। ইহার একটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অপরটিকে মিথ্যা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। বস্তুতঃপক্ষে পুরাণের কাহিনীও যেমন সত্য, ভক্ত বৈষ্ণবের ধারণাও তেমনই সত্য। সুতরাং উভয়ের সামঞ্জস্য ভক্ত বৈষ্ণবগণ কিরূপে করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই বিরোধের সামঞ্জস্যবিধানে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না, এই সিদ্ধান্ত তাঁহার অপ্রকট লীলা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, প্রকট লীলা সম্বন্ধে নহে। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগ প্রকরণের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ব্রজলীলায় মথুরাগমন-

লীলা নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে অপ্রকট মথুরায় নিত্যই বিরাজ করেন। প্রকট লীলায় ব্রজ হইতে মথুরায় গমন, মথুরা হইতে দ্বারকায় প্রস্থান এবং দন্তবক্রবধের পর দ্বারকা হইতে ব্রজে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ আছে। এই গমনাগমন অপ্রকট প্রকাশে নাই। লঘুভাগবতামৃতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়—প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যদুপুরে (মথুরায়) গিয়া, তিনি যে ব্রজেন্দ্রনন্দন সে কথা গোপন করিয়া, নিজেকে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকাশ করিলেন এবং মথুরালীলা শেষ করিয়া দ্বারকায় গেলেন।[১৭] তারপর দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-যে পুনরায় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা লঘুভাগবতামৃতে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের উক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই উক্তির মর্মার্থ—শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রবধের পর বৃন্দাবনে আসিয়া উৎকণ্ঠিত মাতাপিতা ও গোপবৃদ্ধগণকে অভিবাদন এবং বস্ত্র, অলংকার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিবিধান করেন।[১৮]

এই সকল প্রমাণে স্পষ্টই মনে হয়, প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। যদি প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন না-ই থাকিবে, তাহা হইলে ভাগবতে বর্ণিত অক্রূর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্রজপরিকরদের দুঃসহ বেদনা, ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনাদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ, সেই উপলক্ষে ভ্রমরগীতে বর্ণিত দিব্যোন্মাদ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে ব্রজবাসীদের কুরুক্ষেত্রে গমন প্রভৃতি সমস্ত কাহিনীই মিথ্যা হইয়া যায়। মথুরা ও দ্বারকার অধিপতি যদি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই না হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণের এমন মর্মস্পর্শী বিরহই বা কেন? কৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবের নিকট তাঁহাদের মনোভাবের এইরূপ প্রকাশই বা কেন আর কেনই বা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রজগোপীদের কুরুক্ষেত্রে

গমন? ব্রজেন্দ্রনন্দন ভিন্ন অন্যের জন্য ব্রজদেবীগণের এইরূপ আচরণ কল্পনা করিলেও তাঁহাদের প্রেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং যামলবচনে প্রকট ও অপ্রকট সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকিলেও এই বচনে নিঃসন্দেহে অপ্রকট লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে নিত্যস্থিতির কথা বলা হইয়াছে।

হৃদি-বৃন্দাবনে অপ্রকট লীলা

যে-বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অপ্রকট লীলা করেন, তাহা বাস্তব জগতে নাই, তাহা ভক্তের অন্তর-রাজ্য—হৃদি-বৃন্দাবন। ভক্ত তাঁহার অন্তর-রাজ্যেই সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কোন্ যুগে বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন, আজ সেখানে তাহার চিহ্ন এবং স্মৃতিমাত্রও নাই; কালপ্রবাহে সেই বিস্মৃত অতীতের লীলা দূর-শ্রুত রাগিণীর মতই অস্পষ্ট হইয়া পৌরাণিক কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে—ইহা ভক্তিলেশহীন অবিশ্বাসী মানুষের কথা; ভক্তের প্রাণ একথা কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না। কারণ তিনি-যে সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করেন, ধ্যানস্থ হইলেই প্রত্যক্ষ করেন—'অদ্যাপিহ সেথা লীলা করে শ্যামরায়।' তাই ভক্তের অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অম্লান মহিমায় চিরজাগরূক, তাহা শাশ্বত, চিরভাস্বর। ভক্ত ভাবসমাধিতে এই লীলা কিরূপে অনুভব করেন, ভাগবতকার ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের জীবনের একটি ঘটনার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, বিদুর ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণচরিত জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন এবং উদ্ধব বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তিনি

সর্বাঙ্গে পুলক-শিহরণ অনুভব করিলেন এবং বিদুরের প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর তিনি দিব্যলোক হইতে পরিপূর্ণ হৃদয়ে পরমানন্দে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিলেন এবং অশ্রু মুছিয়া সানন্দে প্রীতিপূর্ণ অন্তরে বিদুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিতে লাগিলেন।[১১] শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বৃন্দাবন ও গোলোকের অভিন্নতা-প্রতিষ্ঠায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, মৌন থাকিয়া উদ্ধব-যে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয়। কারণ, কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রফুল্ল হইতে পারেন না। অথচ তখন মথুরা প্রভৃতি স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রকট হইয়াছিল; সুতরাং উদ্ধব উক্ত ধামসমূহের অন্য প্রকাশ-বিশেষ কৃষ্ণলোকেই শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।[২০] ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইহা বাহ্যদর্শন নহে, অন্তর্দর্শন এই অন্তর্দর্শনের কথাই যে, উদ্ধবের মাধ্যমে প্রেরিত বিরহকাতর গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্যে নিহিত, তাহা শ্রীকৃষ্ণের বার্তা আলোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে।

গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা-বাক্য

কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ও ব্রজবাসিগণকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন কিন্তু নিজে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। তবে উদ্ধবের মাধ্যমে বিরহবিধুরা ব্রজগোপীদের নিকট যে-সান্ত্বনাবাক্য প্রেরণ করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমি সকলের আত্মা, অতএব আমার সহিত তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। পঞ্চ মহাভূতসমূহ যেমন সমস্ত বিশ্বের নানা বস্তুতে বর্তমান, তেমনই আমি মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহের আশ্রয়রূপে অবস্থান

করিতেছি। তোমরা আমার প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি যে তোমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, সে কেবল তোমরা আমাকে সর্বদা ধ্যান করিবে এই অভিলাষে। ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মন আমার নিকটবর্তী হয়। মন নিকটবর্তী হইলে আমাকে লাভ করা যায়। দূরবর্তী প্রিয়জনের প্রতি মন যেমন আকৃষ্ট হয়, নিকটবর্তীর প্রতি তেমন হয় না। অতএব তোমরা বিষয় হইতে মনকে মুক্ত করিয়া আমাতে নিবিষ্ট কর ও সর্বদা আমাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে অচিরেই আমাকে লাভ করিবে। হে কল্যাণীগণ, বৃন্দাবনে রাসক্রীড়ার সময় যে সকল ব্রজাঙ্গনা পতিগণের বিরোধিতায় আমার সহিত যোগদান করিতে পারে নাই, তাহারা আমার গুণাবলী চিন্তা করিতে করিতে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে।[২১]

বিরহবিধুরা কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজগোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই সান্ত্বনাবাক্যে যে-বিচ্ছেদহীন নিত্যমিলনের সুনিশ্চিত আশ্বাস ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা মানস-মিলন। প্রিয়জন আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলেও, মননের দ্বারাই তিনি সর্বদা আমাদের অন্তরে বিরাজ করেন—মানসিক অনুধ্যানেই আমরা দূরস্থিত প্রিয়জনের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকি। এই মানস-মিলনের তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন:

"..............মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"

এখানে বিরহ-বেদনার মধ্যেও মানস-মিলনের যে পরম আশ্বাসে কবিপ্রাণ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বিচ্ছেদকাতর গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

এই জন্যই ভাগবতের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, উদ্ধবমুখে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণে ব্রজাঙ্গনাগণ অতিশয় প্রীতিলাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হন।[২২] শ্রীরূপ গোস্বামীও তাঁহার 'উদ্ধবসন্দেশ' নামক কাব্যে এই মানস-মিলনের কথাই বলিয়াছেন। এই কাব্যেও উদ্ধবের মাধ্যমে গোপীদের নিকট প্রেরিত বার্তায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ব্রজলীলাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ লীলা এবং গোপীরাই তাঁহার সর্বোত্তম ভক্ত, তাঁহাদের সহিত এখনও প্রতি রজনীতে তাঁহার মিলন সংঘটিত হয়।[২৩]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একান্ত ভক্ত বৃন্দাবনে যে-লীলা নিত্য প্রত্যক্ষ করেন. তাহা বাহ্যদর্শন নহে, অন্তর্দর্শন, যে-লীলারসে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি মিলনানন্দ অনুভব করেন, তাহা মানস-মিলন। এই মিলনে দেশকালের কোন বাধা নাই, কোন বিচ্ছেদ বা অবসান নাই, বাস্তবের সহিত কোন বিরোধ নাই। তাই পৌরাণিক কাহিনী ও ভক্ত বৈষ্ণবের বিশ্বাসের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যও নাই। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি' ভক্ত বৈষ্ণবের এই সুদৃঢ় প্রত্যয় অতিশয় প্রত্যক্ষ, বাস্তব সত্যের মতই প্রশ্নের অতীত। কারণ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়েই নিত্য বিরাজিত :

"Oh Lord, I thought you hidden
Most secret and apart,
But I found your dwelling
Is here within my heart."

উল্লেখপঞ্জী

১। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য ১।৬১
২। ছান্দোগ্য উপনিষদ—৭।২৪।১
৩। ভাগবতপুরাণ—৯।২৪।৩০
৪। ঐ —৪।৩।২৩
৫। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি ৪।৫৬
৬। গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড—৩।৩২-৩৩
৭। বিশদ আলোচনা 'ব্রজভূমি' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য
৮। ভাগবতপুরাণ—১০।৬।৩৮
৯। ঐ —১০।১৪।৩৫
১০। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১০৬ অনুচ্ছেদ
১১। গর্গসংহিতা, বৃন্দাবনখণ্ড—১।৪২
১২। গোলোক, গোকুল, ব্রজ, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপের অভিন্নত্বের প্রসঙ্গ 'ব্রজভূমি' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য
১৩। ব্রহ্মসংহিতা—৫।৬৫-৬৬
১৪। ভাগবতপুরাণ—৪।৮।৪২
১৫। ঐ —১০।৪৪।১৩
১৬। ঐ —১০।৩৯।১৩, ৩২, ৩৭
১৭। লঘুভাগবতামৃত— ১।৭৪২-৪৩
১৮। ঐ —১।৭৬১
১৯। ভাগবতপুরাণ—৩।২।১-৬
২০। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১০৬ অনুচ্ছেদ
২১। ভাগবতপুরাণ —১০।৪৭।২৯, ৩৪-৩৭
২২। ঐ —১০।৪৭।৩৮
২৩। উদ্ধবসন্দেশ—শ্লোক সংখ্যা ৮, ১২৪

দশম অধ্যায়

উদ্ধব ও বৃন্দাবনতত্ত্ব

যে-নিরন্তর ধ্যানে ভক্ত আপন অন্তরে ভগবানের নিত্যস্থিতি অনুভব করিয়া বিচ্ছেদহীন মিলনের আনন্দে বিভোর হন, সেই ধ্যান-তন্ময়তা কর্ম বা জ্ঞানের পথে নহে, একমাত্র ভক্তির পথেই লাভ করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে এই সত্য উপলব্ধি করাইবার জন্যই বার্তাসহ ব্রজগোপীদের নিকট প্রেরণ করেন। উদ্ধব ভগবানের 'নিসৃষ্টার্থ'[১] দূতরূপে ব্রজে গিয়া বিরহ-বিধুরা গোপীদের সর্ববিস্মৃত তন্ময়তা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের চরণরেণুস্পর্শে ধন্য ব্রজের তৃণগুল্মলতার জীবন লাভের নিমিত্ত আকুল হইয়া উঠেন :

> "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
> বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
> যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
> ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"[২]

পতিপুত্র গৃহসংসারের দুর্জয় বন্ধন, লোকধর্ম, সংসারধর্মের শত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা ব্রজাঙ্গনাগণ যেরূপ তন্ময় হইয়া থাকিতেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবেরও অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একথা তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণের অপর ভক্ত নারদের নিকট অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।[৩] কৃষ্ণনিষ্ঠ এই আকুলতা, এই ঐকান্তিক আত্মনিবেদনই ব্রজের সাধনার মূল কথা। ইহাই বৃন্দাবনতত্ত্ব। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে এই ভক্তিতত্ত্বের অপার রহস্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে প্রকাশ করেন। বর্তমান অধ্যায়ের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

তবে তাহার পূর্বে আর একটি বিষয়ের কিছু আলোচনা

প্রয়োজন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এত ভক্ত, বন্ধু ও সহচর থাকিতে তিনি তাঁহার বৃন্দাবনলীলার গূঢ়তম রহস্য কেবল উদ্ধবের নিকট কেন প্রকাশ করিলেন আর কেনই বা তাহা প্রচারের জন্য যদুকুল-ধ্বংসের পরেও তাঁহাকে মর্ত্যে রাখিয়া গেলেন? ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে উদ্ধব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য জানা আবশ্যক।

উদ্ধবের চরিত্র

পরীক্ষিতের নিকট উদ্ধবের পরিচয়-দান প্রসঙ্গে ভাগবতে শুকদেব বলিয়াছেন, উদ্ধব বৃষ্ণিগণের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য এবং অতিশয় বুদ্ধিমান।[৪] উদ্ধব-যে তাঁহার অতি প্রিয় ভৃত্য ও সুহৃদ্ তাহা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।[৫] তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রতি যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রদ্ধা ছিল, তিনি-যে প্রয়োজনে তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেন, তাহার প্রমাণও[৬] ভাগবতে আছে। হরিবংশে এমন উক্তিও আছে যে, উদ্ধবের পরামর্শ অনুসারেই বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) সর্বদা পৃথিবী শাসন করেন।[৭] এই কারণেই শ্রীজীব গোস্বামী উদ্ধবের মহিমা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহার জ্ঞানের প্রশংসায় তাঁহাকে 'সর্ববুদ্ধঃ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৮]

ইহাই উদ্ধবের একমাত্র পরিচয় নহে আর এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মর্ত্যলীলার গূঢ়তম তত্ত্বটি উদ্ধবের নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার যথার্থ পরিচয়, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবক এবং প্রেমবিহ্বল ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির প্রকারভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের দারুক, জৈত্র প্রভৃতি পার্ষদ আছেন, তাঁহারা মন্ত্রণাদানে ও সারথির কাজে নিযুক্ত, কেহ কেহ অবসর সময়ে সেবাও করেন, কিন্তু শ্রীমান উদ্ধব

ইঁহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রেমব্যাকুল। 'উদ্ধব' শব্দটির মধ্যেই তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য নিহিত। তিনি সার্থকনামা।[৯]

উদ্ধবের এই সেবাপরায়ণ ও প্রেমবিহ্বল চরিত্রের পরিচয় যাদবগণ দেবর্ষি নারদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া নারদ যখন যাদবগণকে দীনতা ও বিনয়ের সহিত বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন, তখন যাদবগণ বলিলেন, আমাদের সুদুর্লভ সৌভাগ্য সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সকলই সত্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে আবার উদ্ধবই যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক অনুগ্রহের পাত্র। তিনি তাঁহার মন্ত্রী, শিষ্য ও পরম প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ কবে কোথায় যান, আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি না; উদ্ধবই কেবল উহা জানেন এবং নিত্য প্রভুর সমীপে অবস্থানপূর্বক তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। উদ্ধব সানন্দে প্রভুর চরণ ক্রোড়ে করিয়া সংবাহন করিতে করিতে সুখে ঘুমাইয়া পড়েন। কুব্জা প্রভৃতির ঘরে নির্জনে বিহারের সময়ও কখনও কখনও উদ্ধব প্রভুর অনুগমন করেন। মন্ত্রণাদানেও তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অমাত্য। উদ্ধবের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তিনি শিশুকাল হইতে প্রভুর পাদপদ্ম সেবায় এমনই তন্ময় যে অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার সেই ভাবাবেগকে বাতুলতা মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবার মহিমা একমাত্র উদ্ধবেই প্রকাশ পাইয়াছে। উদ্ধব প্রদ্যুম্ন হইতেও শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়।[১০] স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ভাগবতে বলিয়াছেন, ব্রহ্মা পুত্র, শঙ্কর স্বরূপভূত, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা এবং লক্ষ্মী ভার্যা হইলেও উদ্ধবের ন্যায় প্রিয় নহে। কেবল তাহাই নহে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিজ মূর্তি অপেক্ষাও প্রিয়।[১১] এই ভাগবতেই উদ্ধবের নিকট আপন বিভূতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ভগবদ্‌গণের মধ্যে আমি বাসুদেব, ভাগবতগণের মধ্যে আমি উদ্ধব।"

নারদ প্রভৃতি একান্ত ভক্ত থাকিতেও উদ্ধবকে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ঘোষণার কারণ উদ্ধবের প্রার্থনার মধ্যেই নিহিত আছে। মর্ত্যলোক হইতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পূর্বে উদ্ধব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যাহারা তোমার পাদপদ্ম সেবা করে, তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটাই দুর্লভ নহে, আমি সে সকল প্রার্থনা করি না, আমি কেবল তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেই উৎসুক।[১২]

এই প্রার্থনা, এই সাধনা ত ব্রজগোপীদেরও। তাঁহারাও ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহে নাই—চাহিয়াছে কেবল নিজেদের অঙ্গ দিয়া একান্তবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে। তাই উদ্ধব ভিন্ন আর কাহার নিকট ব্রজলীলার এই পরম রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে? এই সাধনা-প্রচারে তাঁহার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেই বা আছে? সেইজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলীলা সমাপ্তির পূর্বে উদ্ধবের নিকট ব্রজলীলার সুগোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার মাধ্যমে তাহা জগতে প্রচার করিতে চাহিলেন।[১৩]

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নহে কেবল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবার অধিকার লাভের যে-আকাঙ্ক্ষা উদ্ধবের প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অন্য অভিলাষ-শূন্য; যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণের সুখ, ইহা সেই উত্তমা ভক্তিরই লক্ষণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই ভক্তিরই সাধক। তাই তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের কীর্তিকথায় মুখর। এই রচনাগুলিতে কোথাও উদ্ধবের দৌত্য সবিস্তারে বর্ণিত (যেমন পদ্মপুরাণ ও গর্গসংহিতা), আবার কোথাও উদ্ধবের দৌত্য অবলম্বনে স্বতন্ত্র কাব্য রচিত (যেমন শ্রীরূপ গোস্বামীর উদ্ধব-সন্দেশ এবং মাধব কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্ধবদূত)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ উদ্ধবকে কি অপরিসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এই কাব্যগুলি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভক্তিযোগের প্রাধান্য ও তাহার বিশেষত্ব

উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য, বদ্ধ ও মুক্ত জীবের স্বরূপ, সকাম ও নিষ্কাম কর্ম, ভক্তিযোগ, বাসনাত্যাগের উপায়, অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি তাঁহাকে শিক্ষা দেন। উদ্ধব তখন আবার প্রশ্ন করেন, ঋষিগণ বহুবিধ শ্রেয়ঃসাধনের উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে কি সকলেরই প্রাধান্য অথবা আপনি যে ভক্তিযোগের কথা বলিলেন, তাঁহাই সকলের প্রধান।[১৪] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলেন, ভক্তিযোগই সর্বপ্রধান। এই কথা আমি সর্বপ্রথম ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম এবং তিনি ইহা নিজ পুত্রদের বলিয়াছিলেন। কালক্রমে এই উপদেশ বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় মানবগণ নিজ নিজ গুণ ও কর্ম অনুসারে ভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তির বশে এই শ্রেয়ঃসাধন বহুরূপে কীর্তন করিতেছেন। কিন্তু অন্য সকল সাধনই ভক্তি-মুখাপেক্ষী। ভক্তিই প্রধান সাধন। ভক্তি কাহারও অপেক্ষা করে না। ভক্তিযোগ মানুষকে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, আমার প্রতি অনুরক্ত ও একাগ্রচিত্ত করে। সে আমাকে ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করে না। ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, পৃথিবী বা রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ কিছুই সে কামনা করে না।[১৫] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন, আমি নিজেই ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি। যোগসাধনা, বেদপাঠ, তপস্যা, দান প্রভৃতি কোন উপায়েই আমাকে পাওয়া যায় না। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তিতেই আমি লভ্য ঃ

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥"[১৬]

আমাতে ভক্তিভাবের উদয় না হইলে নিঃশেষে বাসনার ক্ষয় হয় না এবং বাসনার ক্ষয় ভিন্ন আমাকে লাভ করাও যায় না। স্বাভাবিক অশ্রু, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুভাবসমূহই ভাবের পরিচায়ক। আমাকে স্মরণ কবিতে করিতেই ভাবের উদয় হয়। ঐ ভাবের পরিণামেই দর্শনের পর আমাকে লাভ করা যায়'। এই ভক্তি শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের দ্বারা লভ্য—'সাধুসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা…।' সাধুসঙ্গজনিত ভক্তিযোগ ভিন্ন সংসার হইতে মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। কারণ, ভগবান সাধুগণেরই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। অতএব সৎসঙ্গই অন্তরঙ্গ সাধন।[১৭] যে সাধুসঙ্গে ভগবানে অচলা ভক্তিলাভ হয়, সেই সাধুর লক্ষণ কি এবং সাধুসঙ্গের দ্বারা যে ভক্তিলাভ হয়, তাহাই বা কিরূপ—উদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান ভক্ত (সাধু) ও ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করেন।

ভক্তের লক্ষণ

ভগবান বলেন, ভক্ত দুই প্রকার—মিশ্র ও শুদ্ধ জ্ঞান-কর্মমিশ্রা ভক্তিযুক্ত সাধুর নাম মিশ্রভক্ত এবং কেবল শ্রবণাদি শুদ্ধভক্তি-যুক্ত সাধুর নাম শুদ্ধভক্ত। যে পুরুষ দয়ালু, সহিষ্ণু সত্যপরায়ণ, ঈর্ষাদি দোষশূন্য, সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, কোমলস্বভাব, সদাচারী, অকৃতদার, ব্যবহারিক ক্রিয়াশূন্য, মিতভোজী, স্বধর্মনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, নির্বিকার, নিরহঙ্কার ও অবঞ্চক, যিনি পরের অনিষ্ট করেন না, অপরকে সম্মান করেন, পার্থিব বিষয়ের সংস্পর্শেও যিনি অচঞ্চল, ক্ষুৎ-পিপাসায় অকাতর, কেবল কৃপাবশে প্রবৃত্তি-পরায়ণ, যিনি বন্ধনমুক্তির কথা জানেন

এবং আমিই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনি মিশ্রভক্ত। পক্ষান্তরে, যিনি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট স্বধর্ম ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার নাম শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি শুদ্ধভক্ত। এই শুদ্ধভক্ত যদি মিশ্রভক্তের ন্যায় গুণী হন, উত্তম; যদি না হন, তাহাতেও ক্ষতি নাই, কারণ ঐ সকল গুণের উৎকর্ষ ও তদ্বিপরীত ধর্মসমূহের নিকৃষ্টতা জানিয়াও তিনি স্বধর্ম ও সেই বিষয়ের জ্ঞানকে আমার অনন্যভক্তির অন্তরায় বুঝিয়া উহাদের পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিপরায়ণ হন। আবার এই শুদ্ধভক্ত যদি আমার স্বরূপ জানিয়া বা না জানিয়াও আমাতে ঐকান্তিক মমতা স্থাপনপূর্বক ভজনা করেন, তবে তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভক্তোত্তম।[১৮]

• অতঃপর উদ্ধবের দ্বিতীয় প্রশ্নের, সাধুসঙ্গে যে ভক্তি লাভ করা যায়, সেই ভক্তির লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আমার প্রতিমা ও ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শ, পূজা, পরিচর্যা, স্তুতি, নমস্কার, গুণকীর্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুষ্ঠানলব্ধ বস্তুসমূহ আমাতে সমর্পণ, দাস্যভাবে আমাতে আত্মনিবেদন, আমার জন্মকর্ম বর্ণনা, পর্বদিনের অনুমোদন, গীত, নৃত্য ও বাদ্যের সহিত সপরিবারে আমার গৃহে উৎসব, সমস্ত বাৎসরিক পর্বে যাত্রা ও পুষ্প, উপহার প্রভৃতি সমর্পণ, আমার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, ব্রতধারণ, প্রতিমা স্থাপনে শ্রদ্ধা, সংমার্জন, জলসেক প্রভৃতি কার্যের দ্বারা ভৃত্যের ন্যায় অকপটে আমার গৃহপরিচর্যা, নিরভিমান, নিরহঙ্কার, কৃতকর্ম সম্বন্ধে নীরবতা, যে বস্তু ইহলোকে ইষ্টতম এবং যাহা নিজের অত্যন্ত প্রিয়, তাহা নিবেদনই ভক্তির লক্ষণ।[১৯] ইহার নাম সাধনভক্তি। ইহার চৌষট্টি অঙ্গ। এই সাধনভক্তির পরিণামে ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তির পরিণামে প্রেম ভক্তির উদয় হয়।[২০]

এই প্রেমভক্তির পরিপূর্ণতম প্রকাশ ব্রজগোপীদের সাধনায়। যোগ, সাংখ্য ও বেদে অনভিজ্ঞ মূঢ়মতি গোপীগণ কেবল প্রেমভক্তির পথে সাধনা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন, সমাধিস্থ মুনিগণের যেরূপ বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, তেমনই আমাতে বদ্ধচিত্ত গোপীগণও নিজ দেহ, পতিপুত্রাদি মমতার পাত্র, ইহলোক, পরলোক সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, নদী যেমন সমুদ্রে লীন হয়, তেমনই আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আমাকে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব হে উদ্ধব, তুমি শ্রৌত-স্মার্ত বিধি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব প্রযত্নে সর্বদেহীর আত্মা আমার শরণাপন্ন হও॥[২১]

উদ্ধবকে ভক্তিধর্ম উপদেশ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মীমাংসার অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের ধর্ম, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক স্মৃতির ধর্ম এবং জ্ঞানসর্বস্ব শ্রুতির ধর্মের পরিবর্তে ভক্তির পথে একমাত্র তাঁহাকেই শরণ লইবার যে-নির্দেশ উদ্ধবকে দিয়াছেন, তাহাই ব্রজের সাধনার মূল কথা। এই ভক্তি ও শরণাগতির উপদেশ একান্তিগণের পরম আদরণীয় গ্রন্থ গীতাতেও প্রচারিত হইয়াছে। গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥
*　　*　　*　　*
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
*　　*　　*　　*
সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"[২২]

ইহার তাৎপর্য, কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, সাক্ষাৎ করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। অতএব আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজন ও পূজা কর; আমাকে নমস্কার কর এবং সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্য ভক্তিতে আমার শরণ লও।

উদ্ধবের নিকট ব্রজের সাধনার স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি ও শরণাগতির যে স্তর-পরম্পরা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে সাধনার পদ্ধতিরূপে নির্দিষ্ট অভ্যারোহতত্ত্বের সহিত গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে, "অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যা-রোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুযাৎ তদেতানি জপেৎ। অসতো মা সদ্‌গময, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽ-মৃতং গময়েতি"।[২৩]

স্তরে স্তরে কোন লক্ষ্যে (অভি) উপনীত (আরোহ) হওযাই অভ্যারোহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। অর্থাৎ সাধনার ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর স্তরে আরোহণের দ্বারা অভীষ্টলাভের সামর্থ্য অর্জনই অভ্যারোহ। এই তিনটি মন্ত্রে সেই অভ্যারোহই নির্দিষ্ট হইযাছে। প্রথম মন্ত্রে বলা হইযাছে 'যাহা সাধনার পথ নহে, তাহাতে আমার প্রবৃত্তি বিনষ্ট করিয়া আমাকে সাধনার পথে চলিবার প্রেরণা দিন।' দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ, আমাকে সাধকভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করিয়া সাধ্যভাবে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। তৃতীয় মন্ত্রে প্রথম দুই মন্ত্রের অর্থ যুক্তভাবে বলা হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ভক্তি-সাধনার যে স্তর-পরম্পরা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই ঊর্ধ্বতর স্তরে আরোহণের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। তবে কেবল ভক্তের অভ্যারোহই নহে, উপরন্তু ভক্তের সহিত মিলনের আনন্দ-অনুভবের

জন্য ভগবানেরও মর্ত্যভূমিতে অবতরণের কথা ভাগবতধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ব্রজের সাধনার এই সকল গূঢ়তত্ত্ব ও বিশেষত্বই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে শিক্ষা দেন এবং তিনি ভগবানের লীলা-শেষে উহা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। St. Paul যেমন যীশুখৃষ্টের ধর্মকে অথবা গত শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন পরমহংস-দেবের ধর্মমতকে ব্যাখ্যা ও প্রচারের দ্বারা বিশ্বনন্দিত করেন, উদ্ধবও তেমনই নিরলস প্রচারের দ্বারা ভাগবতধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টধর্মপ্রচারে St. Paul অথবা পরমহংসদেবের ধর্মমত-প্রচারে স্বামীজীর যে অবদান, ভাগবতধর্ম প্রচারে উদ্ধবের অবদানও সেইরূপ। উদ্ধব ভাগবতধর্মের St. Paul, পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ।

উল্লেখপঞ্জী

১। "উভয়োর্ভাবমুন্নীয় স্বয়ং বদতি চোত্তরম্।
সুশ্লিষ্টং কুরুতে কার্যং নিসৃষ্টার্থস্তু স স্মৃতঃ॥'
—সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৫৯

২। ভাগবতপুরাণ—১০।৪৭।৬১

৩। বৃহদ্ভাগবতামৃত—১।৬।২৪-২৫

৪। ভাগবতপুরাণ—১০।৪৬।১

৫। ঐ —১১।১১।৪৯

৬। ঐ —১০।৭০।৪৬

৭। হরিবংশ—৩।৭৪।৬

৮। উত্তরগোপালচম্পূ—২৫।৩৫

৯। আর্যশূরের বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'জাতকমালা' ও 'দিব্যাবদান'-এ উদ্ধব শব্দটি বিক্লবতা বা বিহ্বলতা অর্থেই গৃহীত হইয়াছে।—Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Ed. by Franklin Edgerton পৃঃ ১৩১ দ্রষ্টব্য

১০। বৃহদ্ভাগবতামৃত—১।৫।১১৬, ১১৮, ১২১-২৫

১১। ভাগবতপুরাণ—১১।১৪।১৫

১২। ঐ —৩ ৪।১৫

১৩। ঐ —৩।৪ ৩০-৩১

১৪। ঐ —১১ ১৪।১

১৫। ঐ —১১ ১৪ ১৪

১৬। ঐ —১১।১৪ ২০

১৭। ঐ —১১ ১১ ৪৮

১৮। ঐ —১১।১১।২৯-৩৩

১৯। ঐ —১১।১১।৩৪-৪১

২০। বিস্তৃত আলোচনা 'সাধনার ধারা' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

২১। ভাগবতপুরাণ—১১ ১২।১২, ১৪-১৫

২২। গীতা—১১।৫৪ ; ১৮।৬৫-৬৬

২৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—১।৩।২৮

একাদশ অধ্যায়

কান্তাভাব—রাসলীলা

ভক্তিপথে সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই পথের সাধক ব্রজের পরিকরগণ, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজের গোপীগণ। গোপীগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা—একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি-সাধনার তাৎপর্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উদ্ধবের নিকট স্বীকার করিয়াছেন। উদ্ধব নিজেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে ব্রজে গিয়া এই সকল গোপীর অপূর্ব প্রেম-তন্ময়তা প্রত্যক্ষ করিয়া যে অভিভূত হন, তাহাও ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। ব্রজগোপীদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহাদের সাধনার পদ্ধতি এবং যে-লীলায় এই সাধনার চরম প্রকাশ, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

কান্তাভাবে সাধনা

ব্রজপরিকরদের সাধনা ভক্তিমার্গে। এই সাধনা পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।[১] গোপীগণ মধুরা রতির সাধিকা। তাঁহাদের সাধনা কান্তাভাবে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কান্ত, তাঁহারা কান্তা; পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন ও বিরহের বহু বিচিত্র পথে এই সাধনার চরম পরিণতি। ইহার বিশেষত্ব বর্ণনায় Mrs. Underhill বলিয়াছেন:

"It is a passive and joyous yielding up of the virgin soul to its Bridegroom—a silent marriage vow. It is ready for all that may happen to it, all that may be asked of it—to give itself and lose itself—to wait upon the pleasures of its Love."[২]

ভগবানকে কান্তরূপে ভজনার রীতি ভারতে ও পাশ্চাত্য

দেশগুলিতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। কেহ কেহ প্রাচীন উপনিষদগুলির অন্যতম বৃহদারণ্যকে[৩] কান্তাভাবে সাধনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছেন।[৪] ইহা ছাড়া দ্বিতীয় হইতে অষ্টম খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত দক্ষিণ ভারতীয় সাধকসম্প্রদায় আলোয়ারদের মধ্যেও যে এই কান্তাভাবে ভজনা প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচনা অবতরণিকায় করা হইয়াছে। আরাধ্যের সহিত আরাধিকার এই যুগলমিলনকে পাশ্চাত্য দেশে 'Spiritual Marriage' বলা হইয়াছে। Mrs Underhill-এর মতে পাশ্চাত্য দেশে এই প্রতীক-প্রয়োগের উৎস প্রাচীন গ্রীসের Orphic Mysteries; তাঁহার মতে এই সাধনার রীতি Orphic Mysteries হইতে Neoplatonists-দের গুরু Plotinus-এর মধ্য দিয়া খ্রীষ্টীয় সাধনার ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় মরমীয়া সাধকদের দৃষ্টিতে এই প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায় Old Testament-এর Song of Solomon-এ। এই Mystic Marriage-এর ঝংকারে ইউরোপের মধ্যযুগের মিষ্টিক সাহিত্য মুখরিত।[৫]

এই কান্তাভাবে ভজন স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দুই রকমের হইতে পারে—'স্বকীয়া-পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ সংস্থান।' (চৈ, চ, আদি-৪।৪৬)। ভগবান স্বকীয়ার পতি, পরকীয়ার উপপতি। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে স্বকীয়া নায়িকার লক্ষণবর্ণনায় বলিয়াছেন, যে-নায়িকাগণ বিবাহবিধি-অনুসারে পতি লাভ করিয়াছে, যাহারা পতির আদেশ পালনে উৎসুক ও পাতিব্রত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তাহারাই স্বকীয়া নায়িকা, আর যে-সকল নায়িকা অনুরাগবশে ইহলোক-পরলোক উপেক্ষা করিয়া পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, যাহারা বিবাহ প্রভৃতি লৌকিক ধর্মের অপেক্ষা রাখে না, তাহারাই পরকীয়া নায়িকা। পরকীয়া নায়িকা আবার দুই প্রকার—কুমারী ও পরোঢ়া।[৬]

ভাগবতে পরকীয়াত্বের দৃষ্টান্ত

এখন প্রশ্ন, ব্রজগোপীগণ স্বকীয়া না পরকীয়া? ভাগবত-পুরাণে রাসলীলার প্রস্তাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু স্থলে পরদার-প্রসঙ্গ যেরূপ সমর্থন লাভ করিয়াছে, তাহাতে ব্রজগোপীরা যে পরকীয়া, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের বহু উক্তি ব্রজগোপীদের পরকীয়াত্ব প্রতিপন্ন করে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(ক) "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥"[৭]

ইহার অর্থ, সকল গোপীই পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোহরণ করিয়াছিলেন।

(খ) "পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥"[৮]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের আগমনের কারণ জান। তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধবগণকে অনাদর করিয়া তোমার নিকট আমরা আসিয়াছি। হে শঠ, রাত্রিকালে কোন্ ব্যক্তি সেই নারীকে পরিত্যাগ করে, যে নিজেই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

(গ) "এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাঽসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥"[৯]

হে অবলাগণ, তোমরা এই প্রকারে আমার জন্য বেদধর্ম, লোকধর্ম এবং আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের উৎকণ্ঠা বর্ধনের জন্যই অদৃশ্য

হইয়াছিলাম। অদৃশ্য থাকিয়া তোমাদের প্রেমালাপ প্রভৃতি শ্রবণ করিতে করিতে তোমাদেরই ভজনা করিতেছিলাম। হে প্রেয়সীগণ, আমি তোমাদের প্রিয় সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করা উচিত নহে।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজগোপীগণ এবং শুকদেবের এই সকল উক্তি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি মনে করিয়াই ব্রজগোপীগণ রাসলীলায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই পরীক্ষিৎ রাসলীলার বিবরণ শ্রবণ করিয়া শুকদেবকে প্রশ্ন করেন, সমস্ত জগতের নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান নিশ্চয়ই ধর্মরক্ষা এবং অধর্মনাশের জন্য অংশের সহিত আবির্ভুত হইয়াছেন। তিনি নিজে ধর্মের প্রবক্তা ও রক্ষাকর্তা হইয়া এইরূপ ধর্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রীসংসর্গ কেন করিলেন, যিনি ইচ্ছামাত্রেই সব কিছু পাইতে পারেন, সেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এইরূপ নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন, আমাদের এই সন্দেহ দূর করুন।[১০]

শুকদেব কর্তৃক পরকীয়া দোষ খণ্ডন

শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, এই অভিযোগ মানিয়া লইয়াই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের তেজস্বিতা, পরমাত্মতা ও ভগবত্তা প্রভৃতি কারণ নির্দেশ করিয়া তাঁহার পরস্ত্রীসংসর্গদোষ খণ্ডন করিয়াছেন।

পরীক্ষিতের সন্দেহাকুল প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব প্রথমে বলেন, ঈশ্বরগণের মধ্যে সময় সময় ধর্মের নিয়মলঙ্ঘন ও দুঃসাহসিকতা দেখা যায় বটে কিন্তু অপবিত্র বস্তু দগ্ধ করিয়াও অগ্নি যেমন অপবিত্র হন না, সেইরূপ তেজস্বিগণের ধর্মের নিয়মলঙ্ঘন দোষাবহ নহে ঃ

> "ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌।
> তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥"[১১]

ইহার তাৎপর্য, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যে-সকল বিধিনিষেধ বা ধর্মাধর্ম, তাহা প্রাকৃতজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; গুণকর্মের অতীত, পরম স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক ধর্মাধর্মের গণ্ডীর বহু উর্দ্ধে। কাজেই পরদারগমনরূপ ধর্মবিরুদ্ধ নিন্দিত কর্ম তাঁহার পক্ষে দূষণীয় হইতে পারে না।

ধর্ম-ব্যতিক্রম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ নহে—এই যুক্তির পর পরস্ত্রীসংসর্গের দোষখণ্ডনের জন্য শুকদেব বলেন, রাসলীলারত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণ, তাঁহাদের পতিবৃন্দ এবং নিখিল দেহধারী জীবমাত্রেরই অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান।[১২] এই যুক্তির তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণ দেহধারী জীবমাত্রেরই যখন অন্তর্যামী, তিনি যখন পরমাত্মা-রূপে গোপীদের অন্তরে নিত্য বিরাজিত, তখন গোপীরা পরস্ত্রী—এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, সেই দেবতা অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে, নিখিল ভুবনে পরিব্যাপ্ত।[১৩] গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, আমাকে সকল শরীরে পরমাত্মা বলিয়া জানিও—'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'।[১৪] ভাগবতেও শুকদেব ইতিপূর্বে পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল জীবের আত্মা বলিয়া জানিবে, 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্'।[১৫] শ্রুতি, গীতা এবং ভাগবতের যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা-রূপে নিখিল জীবের দেহে অবস্থিত, তাঁহার আত্মপর নাই, তিনি গোপীগণের যেরূপ অন্তর্যামী, তাঁহাদের পতিদেরও সেইরূপ অন্তর্যামী, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবই তাঁহাতে অবস্থিত, তাহা হইলে রাস-লীলাকে বাহ্যদৃষ্টিতে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার বলিয়া মনে হইলেও অন্তর্দৃষ্টিতে উহা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। শুকদেবের এই উক্তিতে গোপীদের পরপুরুষ-সম্পর্কজনিত দোষ যে খণ্ডিত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, যাঁহার সমস্ত ইচ্ছাই

অনায়াসে পূর্ণ হয়, সেই ভগবানের এইরূপ লোকনিন্দিত লীলায় প্রবৃত্তি কেন? এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শুকদেব বলেন, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস ঃ

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"[১৬]

পদ্মপুরাণেও ভগবান এই কথাই বলিয়াছেন—'মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের আনন্দবিধানের জন্য নিজেকে দীনরূপে প্রতিপন্ন করিতে, আপাত-দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হইতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। চৈতন্য-চরিতামৃতে কাবরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন ঃ

"তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে জানে তোমার মর্ম॥" (মধ্য—৮।৩৭)

পরস্ত্রীসঙ্গজনিত দোষ আশঙ্কা করিয়া পরীক্ষিৎ যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, শুকদেব তাহাদের প্রায় সবগুলিরই উত্তর দিয়াছেন; তথাপি আরও একটি প্রশ্নের অবকাশ থাকিয়া যায়। ব্রজাঙ্গনা-দিগকে মোহন বংশীরবে আকৃষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের কাছে আনেন এবং তাঁহাদের সহিত লীলা করেন। ইহাতে গোপবধূ-গণের পতি, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলেন, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাবে সেই সময় ব্রজগোপগণ নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত বলিয়া মনে করিয়াছিল।[১৭]

এই যোগমায়া ঐশ্বর্য, বীর্য প্রভৃতি ছয় প্রকার মহাশক্তির আধার শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অচিন্ত্য চিৎ-শক্তি। এই শক্তির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে এইরূপ মায়ামোহিত করিয়াছিলেন যে, মায়াকল্পিত পত্নীগণকে নিজ নিজ শয্যাপার্শ্বে দেখিয়া তাহারা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে নাই। রাসলীলার সূচনাতেই ভাগবতকার এই যোগমায়ার উল্লেখ করিয়াছেন।[১৮]

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, ভাগবতে রাসের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ব্রজগোপীরা যে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত। শুকদেবের মনে এ বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ-ই থাকিত, তাহা হইলে তিনি পরস্ত্রীসংসর্গরূপ-দোষ খণ্ডনের চেষ্টা করিতেন না।

ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামীও যে ব্রজগোপীদের পরদারত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়, তাহা 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ' (ভা. পু, ১০।৩৩।৩৫) এবং 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' (ভা. পু ১০।৩৩।৩৭) শ্লোক দুইটির টীকা হইতে বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার প্রভাবে অনন্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া পরস্ত্রীগণের সহিত যে লীলা করিয়াছেন, তাহাতে পাপের আশংকা নাই।[১৯]

ব্রজগোপীদের পরকীয়াত্ব সম্বন্ধে ভাগবতের বিবরণে কোন সংশয়ের অবকাশ না থাকিলেও, বৈষ্ণব মনীষীদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়, যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে পরকীয়াত্বই সমর্থিত হইয়াছে। কাহারও মতে ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বকীয় কান্তা, আবার কাহারও মতে তাঁহারা নিত্য পরকীয়া।[২০]

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া না পরকীয়া কান্তা, এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এক কালে বিতর্কের সৃষ্টি হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের রাসলীলা যে সমস্ত লীলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সেকালেও কোন মতভেদ ছিল না, এ কালেও নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, তাঁহার বহু মনোহর লীলা থাকিলেও রাসলীলার কথা স্মরণে তাঁহার হৃদয় যে কেন এত উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা তিনি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

এই লীলা কোন্ অর্থে সমস্ত লীলার সার, তাহা বুঝিবার পূর্বে রাসলীলার বৈশিষ্ট্য ও আখ্যানবস্তু আলোচনা প্রয়োজন।

রাসের বৈশিষ্ট্য

সনাতন গোস্বামী রাস শব্দের ব্যাখ্যায় তাঁহার বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণীতে বলিয়াছেন, 'রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ'। অর্থাৎ পরম রসময়ী লীলাই রাস শব্দের যৌগিক অর্থ। 'রসস্যায়ং রাসঃ বা রসানাং সমূহো রাসঃ'—এই অর্থেও রাস শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রাস শব্দটি সঙ্গীতশাস্ত্রেও অতি প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতরত্নাকরে রাসের লক্ষণবর্ণনায় বলা হইয়াছে, মণ্ডলাকারে নৃত্যরত অসংখ্য নর্তকীর মধ্যে একক নট যে নৃত্য করে, তাহাকে 'হল্লীশক নৃত্য' বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্গণ নির্দেশ করিয়াছেন। হল্লীশক নৃত্য যদি বিবিধ তালবদ্ধ ও বিচিত্র গতিবেগসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাস বলে। এই রাসনৃত্য স্বর্গের দেবতাগণও অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, পৃথিবীর লোকের কথা আর কি বলিব।

সাহিত্যদর্পণকারও বিভিন্ন প্রকার উপরূপকের মধ্যে হল্লীশকের উল্লেখ করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন।[১১] টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠও প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে রাসের পদ্ধতি নির্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, একজন পুরুষকে বহু রমণীর মণ্ডলাকারে আবেষ্টনপূর্বক যে হল্লীশক ক্রীড়া, তাহাই রাস নামে পরিচিত। কোষেও হল্লীশককে গোপীদের মণ্ডলীবদ্ধ নৃত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, হল্লীশ ও রাস একই পদ্ধতির নৃত্য, তবে রাস অপেক্ষাকৃত কলাকৌশলপূর্ণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মহাকবি কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে ছলিক নামে, হল্লীশকের ন্যায় একপ্রকার নৃত্যগীতময় নাট্যকলার উল্লেখ করিয়াছেন। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে (৮৯।৬৭)

ছালিক্য নামক যে-নৃত্যগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়, 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর ছলিক সম্ভবতঃ তাহার সমগোত্রীয়।

হরিবংশে হল্লীশক ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। সেখানে এই ক্রীড়ার বিশেষত্ব সম্পর্কে বলা হইয়াছে, গোপীগণ মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও মধ্যে, কখনও বা পাশে রাখিয়া গান আরম্ভ করিলেন। সকলেই তাঁহার অনুকরণ, তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কোন গোপী আবার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া বাসুদেবের চরিত গান করিতে করিতে বনের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নৃত্য-গীত ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপীগণের দ্বারা বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া রাত্রি পরম সুখে যাপন করিলেন।[২২]

বিষ্ণুপুরাণে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় বলা হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত সান্নিধ্যলাভের অভিলাষে গোপীদের সকলেই একসঙ্গে তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী হওয়ায় রাসমণ্ডলী রচনা ব্যাহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের হাত ধরিয়া তাহাদিগকে মণ্ডলবদ্ধ করেন। ইহার পর গোপীদের করতালিতে চঞ্চল বলয়-নিক্বণের সহিত শরৎকালের উপযোগী সঙ্গীতে রাসনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।[২৩] ভাগবতেও রাসলীলার সূচনায় ইহার পদ্ধতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, গোপীমণ্ডলমণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হইল। অচিন্ত্যশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দুই দুইজনের মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের কণ্ঠদেশ ধারণ করিলেন।[২৪]

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের রাসলীলা-পদ্ধতির বর্ণনা হইতে স্পষ্টই মনে হয়, এই লীলাকে রাসলীলা নামে অভিহিত করা হইলেও ইহার পদ্ধতি হল্লীশকেরই অনুরূপ। তবে হরিবংশে হল্লীশক যেমন নিছক নৃত্যগীতাদিমূলক প্রাকৃত লীলা, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের রাসলীলা তেমন নহে। ইহা পরম আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত। রাস-

লীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ইহার আখ্যানভাগের আলোচনা প্রয়োজন।

বেণুগীত ও বস্ত্রহরণের তাৎপর্য

ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধে রাসপঞ্চাধ্যায়ের (২৯—৩৩) পূর্বে দুইটি অধ্যায়ে (২১—২২) ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণের চিত্তচাঞ্চল্য এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপীদের বস্ত্রহরণ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি অধ্যায়কে রাসলীলার পটভূমিকারূপে গণ্য করা যায়। ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁহার The Philosophy of the Srimad Bhagavata-এ যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন:

"The lute of Krishna played a vital part in establishing the relationship of the gopis with Krishna, which eventually culminated in the most profound unity between the cowherd women on the one hand and Krishna on the other......the lute stands for attractive power of Krishna,......It is a part of his divine sport that he unfolds himself into diversity involving the plurality of individual souls. But it is a part of the same sport that he calls the soul back to his own self. From time immemorial the entire creation has been saturated with the resonance of divine music. It is said that the lute calls by the name of Sri Radha...... The concept of Sri Radha stands for the individual soul."[২৫]

গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদের যে

চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও সুমধুর বংশীধ্বনির অপরিমেয় প্রভাব সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা করেন, তাহাই দশম স্কন্ধের একুশ সংখ্যক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ভাগবতকার বলেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া কোন কোন গোপী তাহার কথা নিজ নিজ সখীর নিকট বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী স্মরণে অনুরাগ প্রবল হওয়ায় তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। বৃন্দাবনবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াসমূহ বর্ণনা করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হন।[২৬] এই বংশীধ্বনির প্রভাব যে কি দুর্নিবার, ইহাতে ব্রজগোপীগণ যে কিরূপ তন্ময়তা প্রাপ্ত হন, তাহা ভাগবতকার রাসপঞ্চাধ্যায়ের সূচনায় একটি শ্লোকে বলিয়াছেন—এই বেণুগীত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণে ব্রজরমণীগণ দ্রুতবেগে কর্ণের কুণ্ডল দুলাইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বাঁশী বাজাইতেছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দলে দলে ঘর হইতে বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় একই পথ দিয়া যমুনাতীরে ধাবিত হইলেও একে অপরের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের উদ্যম লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।[২৭]

ইহা সেই বাঁশীর গান, যাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া ভক্তের মন হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদপঙ্কজে মিশাইয়া দেয়; সাংসারিক বস্তুসমূহের মধ্যে এইটি ভাল, এইটি মন্দ, এইরূপ ভেদবুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট করে: তাহার ফলে অনাদি কাল হইতে জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অহমিকার মোহাবরণ নয়ন হইতে অপসারিত হয়। এই বংশীধ্বনি সর্বজীবের অন্তর্যামী ও সকল প্রাণীর আকর্ষণকারী বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিঘন আহ্বান; ইহা যাহার কর্ণে একবার প্রবেশ করে তাহার পক্ষে কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ অনিবার্য—ইহাই ভাগবতে বর্ণিত বেণুগীতের তাৎপর্য।

বেণুগীত বর্ণনার পর ভাগবতকার কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপকুমারীদের বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার কামনায় ব্রজের গোপ-কুমারীগণ হেমন্তের পূর্বে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কাত্যায়নী-ব্রত আরম্ভ করেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠানকালে একদিন তাঁহারা অন্যান্য দিনের ন্যায় যমুনার তীরে বস্ত্র রাখিয়া স্নান করিতে নামিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্র হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গোপীগণ নগ্ন অবস্থায় জল হইতে উঠিয়া বস্ত্র ফিরাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাহা পূর্ণ করেন। বস্ত্র ফিরিয়া পাইয়াও গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ ত্যাগ না করায় তিনি তাঁহাদের বলেন, আমাকে পতিরূপে সেবা করার তোমাদের যে ইচ্ছা, তাহা আমি জানি এবং অনুমোদনও করি। তোমাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার যোগ্য। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাত্যায়নী-ব্রত পালন করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এখন ব্রজে ফিরিয়া যাও। আমার সহিত আগামী রজনীসমূহে তোমরা ক্রীড়া করিতে পারিবে।[২৮] শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাসবাক্যে বাসনা পূর্ণ হওয়ায় গোপীগণ অতঃপর তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে ব্রজে ফিরিয়া যান।

এই বস্ত্রহরণ-লীলা লৌকিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কিন্তু কামোদ্দীপনা যেমন বেণুগীতের উদ্দেশ্য নহে, তেমনই নগ্নতা-সৃষ্টিও বস্ত্রহরণ-লীলার লক্ষ্য নহে। এই লীলাও গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত। সেই তাৎপর্য কি? ভগবৎ-সাধনায় ভক্তের সর্বস্ব সমর্পণের নির্দেশই ভাগবতকার এই বস্ত্রহরণ-লীলার রূপকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ সতীর তিনটি ভূষণ—হ্রী, শ্রী, ও ধী-র মধ্যে হ্রী-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ সাধিকা গোপীগণ কৃষ্ণ-প্রেমে নারীর সেই শ্রেষ্ঠ ভূষণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। লৌকিক ন্যায়-নীতি, শ্লীলতা-অশ্লীলতার মানদণ্ডে

ইহার বিচার চলে না। ইহা অশ্লীল নহে, অশোভন নহে, নিন্দনীয় তো নহেই। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীতে অবদানশতকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ‘শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা’ কবিতায়ও বস্ত্রহরণের অনুরূপ নগ্নতা ও তাহার গভীর তাৎপর্য লক্ষিত হয়। সেখানে আছে—অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীপুরীর রাজা ও বণিকদের মহামূল্য উপহার উপেক্ষা করিয়া ভিক্ষুক রমণীর একমাত্র জীর্ণ গাত্রবাস শ্রেষ্ঠ ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিতেছেন :

> “অরণ্য-আড়ালে রহি কোনো মতে
> একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
> বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
> ভূতলে।
> ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ,
> কহে, ‘ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
> মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
> পলকে’।”

কবির মতে ইহাই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, ইহা নগ্নতা নহে, অশ্লীলতাও নহে।

লৌকিক নগ্নতার রূপকে সর্বস্ব-সমর্পণের এইরূপ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কেবল বৈষ্ণব ও বৌদ্ধদের রচনাতেই নহে, খৃষ্টান মিষ্টিকদের রচনাতেও পাওযা যায়। Meister Eckhart বলিয়াছেন, “Naked follow the Naked Christ. If the soul were stripped of all her sheaths, God would be discovered all naked to her view and would give Himself to her withholding nothing. As long as the soul has not thrown off all her veils, however thin, she is unable to see God.”বস্ত্রহরণলীলার এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সাধু ভাস্বানি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

"Blessed, thrice blessed were Gokul and
Brindaban
And the simple guileless Gopis
whose garments he stole in love ;
steal thou in Thine mercy,
My garments tinted, tainted, soiled,
My gaudy garments of power and pride
steal them, O Lord of Love :
And ne'er give them back to me,
But tear them to the shreds,
Or burn them in the sacred flame
of Thy all-consuming love ;
And I shall at Thy lotus-feet
stripped, self-emptied, naked sit
to see the naked truth of love,
The Love that steals and sanctifies."[২১]

মান, লজ্জা ও ভয় সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়াই প্রেমিক ভক্ত প্রিয়তম ভগবানের সহিত নিবিড় মিলনে আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা অর্জন করেন। ইহাই সংক্ষেপে বস্ত্রহরণ-লীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

ভগবানের আহ্বান ভক্তের জীবনে যখন আসিয়া পৌঁছায়, তখন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনন্যচিত্তে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সে ছুটিয়া চলে—এই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে সর্বলীলার সার রাসলীলার চমৎকারিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই তাঁহার পূর্বে এই দুই লীলার অবতারণা করা হইয়াছে।

বস্ত্রহরণ লীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা ব্রজগোপী-

দের সঙ্গে মিলিত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মল্লিকা প্রভৃতি নানা প্রকার শরৎকালীন পুষ্পে শোভিত রজনীতে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যোগমায়া অবলম্বনে গোপরমণীদের সহিত রমণের ইচ্ছায় শ্রুতি-সুখকর বংশীধ্বনি করেন। সেই কামোদ্দীপক গান শুনিয়া ব্রজগোপীগণ পতিপুত্র, গৃহকর্ম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসিয়া মিলিত হন। পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের বাধাদানে যাঁহারা আসিতে পারিলেন না, তাঁহারা নিমীলিত লোচনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমবেত গোপীগণের ঐকান্তিকতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ঘরে ফিরিয়া পতিপুত্রের সেবা এবং গৃহধর্ম পালনের পরামর্শ দিয়া বলেন, কুলবতী রমণীগণের পক্ষে উপপতির সহিত সম্বন্ধ স্বর্গপ্রাপ্তির অন্তরায়, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দনীয়।[৩০]

ভাগবতে রাসলীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই নিষ্ঠুর উপদেশ শুনিয়া গোপীগণ কাতর-কণ্ঠে বলেন, হে প্রাণবল্লভ, হে স্বচ্ছন্দবিহারী, তুমি প্রেমময় ও কোমল হৃদয় হইয়াও আমাদের কেন এইরূপ নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ? আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াই তোমার চরণসেবার কামনায় এখানে আসিয়াছি, আমাদের পরিত্যাগ করিও না। তুমি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ কর।[৩১] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও প্রেমবতী ব্রজরমণীদের এইরূপ প্রীতিপূর্ণ বিনয় বচন শুনিয়া সানন্দে তাঁহাদের সহিত বিলাস-লীলায় প্রবৃত্ত হইলেন।[৩২]

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়া গোপীগণ নিজেদের সৌভাগ্যে গর্বিত হইলে অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ সেই স্থান ত্যাগ করেন। তিনি অদৃশ্য হইলে গোপীগণ বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া

তাঁহার বিভিন্ন লীলার অনুকরণ এবং তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। এই অবস্থায় অন্যের পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন, কোন একজন ভাগ্যবতী গোপীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্জন স্থানে আছেন এবং মনে মনে সেই গোপীর সৌভাগ্যে তাঁহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। কিন্তু সময় অতিবাহিত হইতে থাকিলে তাঁহারা ক্রমশঃ বিরহে অধিকতর কাতর হইয়া করুণভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদের দুঃখে অভিভূত শ্রীকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া রাসলীলা আরম্ভ করেন। রাসমণ্ডলে যত গোপী ছিল, তিনি নিজেকে তত সংখ্যায় পরিণত করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে লীলায় প্রবৃত্ত হন্। ইহাই সংক্ষেপে ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা।

ভাগবতের ন্যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও রাসলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কামক্রীড়ার বর্ণনা মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেও এই পুরাণেই সর্বপ্রথম গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবতে একজন সৌভাগ্যবতী গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের নির্জনে অবস্থানের কথা বলা হইলেও এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভাগবতের 'অনয়ারাধিতঃ' এই শ্লোকাংশ হইতে তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়া অনুমান করিলেও[৩৩] ভাগবতে শ্রীরাধার নামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই আমরা সর্বপ্রথম গোপী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার নাম দেখিতে পাই। পদ্মপুরাণে রাসলীলার বিস্তৃত বিবরণ না থাকিলেও, এই পুরাণ হইতে আমরা একটি নূতন তথ্য জানিতে পারি। তাহা হইতেছে, ব্রজগোপীগণ পূর্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি ছিলেন। বনবাসী রামচন্দ্রের সুন্দর মূর্তি দেখিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য তাঁহাদের মনে ব্যাকুলতা জাগে এবং এই জন্মে তাঁহারা বৃন্দাবনে গোপীরূপে অবতীর্ণ হন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

রাসলীলার বিশেষত্ব

ভাগবতে রাসলীলার কাহিনী আলোচনা করিলে ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমে আমাদিগকে মুগ্ধ করে গোপীদের সর্বত্যাগী প্রেমের অনিন্দনীয়তা। ভাগবতকার যজ্ঞপত্নীদের কাহিনী (১০।২৩ অধ্যায়) বর্ণনার দ্বারা পরোক্ষভাবে গোপীপ্রেমের অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যজ্ঞপত্নীগণ প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদস্বরূপা অনুরাগিণী। তাঁহারা পতিপুত্র, গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রেমের গভীরতা পরীক্ষার জন্য পাতিব্রত্যের গুণ কীর্তন করিয়া গৃহে ফিরিবার উপদেশ দিলে তাঁহারা বলেন, 'আমরা পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এখন ফিরিয়া গেলে তাঁহারা আর আমাদের গ্রহণ করিবেন না'। এইরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই, পতিগণ তাঁহাদের গ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই আশ্বাস পাইয়া তাঁহারা কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান।[৩৪] গোপীদের ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। তিনি পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে ফিরিবার উপদেশ দিলে তাঁহারা বলেন, আমরা তোমার কোন উপদেশ শুনিতে চাই না। আমাদের কাছে তুমিই পরম প্রিয়, জীবমাত্রেরই পরমাত্মাস্বরূপ, পরম বান্ধব, তোমার সেবাতেই আমাদের সকল সেবার সার্থকতা।[৩৫] এই উক্তির মধ্য দিয়া ব্রজগোপীদের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই রাসলীলাকে অনন্যসাধারণ বিশেষত্বে মণ্ডিত করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন, ব্রজগোপীগণ যে সেবার আকাঙ্ক্ষায় ঘরে ফিরিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ কী? ভাগবতকার রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।[৩৬] অঙ্গসঙ্গ দিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেও ইহাতে

তাঁহাদের আত্মসুখলাভের কোন বাসনা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গের জন্ম লালায়িত বলিয়াই তাঁহাদের এইভাবে সাধনা। ইহার মূলে যদি নিজেদের কোনরূপ সম্ভোগের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের চরণে ব্যথা লাগিবে এই আশঙ্কায় নিজেদের কঠিন স্তনযুগলে সে চরণ ধারণ করিতে তাঁহারা ভীত হইতেন না।[৩৭] তাঁহাদের অন্তরে নিজেদের সুখভোগের ইচ্ছা বিন্দুমাত্র থাকিলে প্রিয়তমের ব্যথার কথা তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইতেন। ব্রজগোপীদের এই সেবা রাসলীলার আর এক বিশেষত্ব।

রাসলীলার অপর বিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাভাবে সমাদর লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ নিজেদের সৌভাগ্যে গর্বিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল পরিত্যাগ। এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার সাহায্যে ভাগবতকার এই ইঙ্গিতই করিতে চাহিয়াছেন, ভক্ত যত বড় ও প্রিয়ই হউন না কেন, তাঁহার মনে অহঙ্কার জন্মিলে ভগবানকে হারাইতেই হইবে। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিও সেই কথাই বলিয়াছেন—'অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো।'

এই ঘটনার অন্য একটি তাৎপর্য আরও গভীর। বিরহ ছাড়া কখনও সম্ভোগরসের পুষ্টি হয় না—'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে'। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোর উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করা যায় না, তেমনই বিরহের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ না করিলে মিলনের অপরিসীম আনন্দেরও সম্পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নহে। বিরহের তীব্র দহন সমস্ত মলিনতা ভস্মীভূত করিয়া ভক্তের হৃদয় পবিত্র করে, না-পাওয়ার বেদনা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করিয়া তোলে বলিয়াই বিরহে প্রেম পুষ্টি লাভ করে। মিলনের রসাস্বাদনে বিরহ তাই এতই মূল্যবান। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে তাঁহার অদৃশ্য হইবার কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে গোপীদের নিকট

এই সত্যকেই প্রকাশ করিয়াছেন।[৩৮] তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের প্রেমবর্ধনের জন্যই আমি চোখের আড়ালে ছিলাম।

ভগবৎ-সাধনায় বিরহের প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য সম্প্রদায়েও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। Mrs. Underhill তাঁহার Mysticism নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"In the midst of psychic storm (বিরহ) mercenary love is forever disestablished and the new state of true love (অকৈতব প্রেম) is abruptly established in its place." সুফী সাধকগণও এই কারণেই মিলনের পরিবর্তে বিরহকেই অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করেন—"The sufis do not desire to be united to the Beloved. Why? Because they believe such a consummation would rob them of the ecstasy of endeavour and of constant questing."

বিরহ শুধু যে ভক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলে তাহাই নহে, ইহা মিলনকে কখনও পুরাতন হইতে দেয়না—নিত্য নূতন করিয়া রাখে। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঠাকুরাণীর কথা'-য় বলিয়াছেন, "বিরহ এবং মিলন, পুনরায় বিরহ এবং পুনরায় মিলনই রস। চিরমিলনে বিরহিণীর চক্ষুর জল ঘুচিয়া গেলে নিরুৎসাহে রসের রসত্বের অভাব হইত। তাই রাধাগোবিন্দ পরামর্শ করিয়া ব্রজে একেবারে চক্ষুর জল ঘুচান না,······মিলন পুরাতন হইতে পায় না, বিরহ তাহাকে নিত্য নূতন করিয়া রাখে, মিলন পুরাতন হইতে না পারায় একটা চির অতৃপ্তির ভিতর দিয়া চরম রসের অলৌকিক নিতুই নূতন আস্বাদন হয়, প্রতি মিলনই প্রথম মিলনের মত চমৎকার এবং বিরহের জ্বালা বরাবর সমান তীব্র।"[৩৯]

এই অন্তর্ধান এবং গোপীদের ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় আবির্ভাবের মধ্য দিয়া আর একটি তাৎপর্যও রাসলীলাকে বিশেষত্ব

দান করিয়াছে। তাহা হইতেছে, ভগবান প্রেমের অধীন। ভক্তের প্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতা পরীক্ষার জন্য তিনি সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হইলেও তাহার আকুলতার নিঃসংশয় প্রমাণ পাইবার পর তিনি কিছুতেই ধরা না দিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় আবির্ভাবের মধ্য দিয়া রাসলীলায় এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাও রাসলীলার আর একটি বিশেষত্ব।

রাসলীলা কি কামক্রীড়া

কিন্তু এই সকল বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও রাসে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলায় দেহকে যেরূপ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ভাগবত-পুরাণের দশম স্কন্ধের 'বাহুপ্রসার' ইত্যাদি শ্লোকে (১০।২৯।৪৬) তাহার যে নগ্ন প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহাতে অনেকেই রাসলীলাকে ঘৃণিত কামক্রীড়া বলিয়া ধিক্কার দিয়া থাকেন। 'বাহুপ্রসার' ইত্যাদি শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে ইহাকে অতি নিন্দনীয় কামক্রীড়াই বলিতে হয়। সুতরাং কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, পরকীয়া ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে বিহার, তাহা প্রাকৃত কামকেলি কিনা। রাসলীলার প্রবক্তা শুকদেব এই লীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যেগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সেই উক্তিগুলি হইতেছে—'ভগবানপি……রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ,' 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ,' 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' এবং 'আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ'। এই উক্তিগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক।[৪০]

১। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ……যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"—রাসলীলার প্রথম শ্লোকেই শুকদেব 'ভগবান্' এই বিশেষণ প্রয়োগের

দ্বারা রাসলীলা যে কামক্রীড়া নহে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন। তারপর 'রন্তুম্' অর্থাৎ রমণ করিতে পদটির তাৎপর্য বিচার্য। রমণ শব্দটি ক্রীড়াবাচক রম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং কামক্রীড়াই রমণ শব্দের একমাত্র অর্থ নহে। কারণ পদ্মপুরাণে শ্রীরামশতনামস্তোত্রে আছে :

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

যোগিগণ যে সচ্চিদানন্দতত্ত্বে রমণ করেন, রাম শব্দে সেই পরব্রহ্মকেই বুঝায়। রমণ শব্দের অর্থ যদি কেবল কামক্রীড়াই হয়, তাহা হইলে উপরি-উক্ত শ্লোকের রাম শব্দের অথবা রাসপঞ্চাধ্যায়ের আত্মারাম শব্দের অর্থের সহিত ইহার সামঞ্জস্য স্থাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে রমণ শব্দের আনন্দ আস্বাদন অর্থই সঙ্গত। অতঃপর 'যোগমায়া' শব্দের তাৎপর্য বিচার্য। যোগমায়া অর্থ ভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন 'যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি'। (মধ্য—২১।১০৩)

২। আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ—'আত্মনি আরমতি' আত্মারাম শব্দের এই ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যাঁহার আনন্দ উপভোগে কোন বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় না, যিনি সচ্চিদানন্দময় আত্মানন্দস্বরূপ তিনিই আত্মারাম।

৩। 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'—এই পদের তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় শ্রীজীব বলিয়াছেন, মোহমুগ্ধ বা মথিত করে যে, এই অর্থে মদ্ বা মথ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন যে কোন শব্দেই মদনকে বুঝায়; সেই মদনকে যিনি মথিত বা অভিভূত করেন, তিনি মন্মথ অর্থাৎ রুদ্ররূপী মহাদেব। সেই রুদ্রের মদ বা গর্ব যিনি মথিত করেন—মোহিনীমূর্তিতে যিনি তাঁহার গর্ব খর্ব করেন, তিনিই মন্মথমন্মথ

শ্রীকৃষ্ণ। এহেন শ্রীকৃষ্ণকে মদন যে কোন মতেই অভিভূত করিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

৪। 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ' অর্থাৎ যিনি নিজের মধ্যে সর্বপ্রকার ভাব অবরুদ্ধ বা সংযত করিয়া গোপীদের সহিত রমণ করেন।

উপরে উল্লিখিত উক্তিগুলির তাৎপর্য আলোচনা করিয়া দেখা গেল, শুকদেব প্রথম শ্লোকেই রাসলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, লীলাবর্ণনার বহু শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে আত্মারাম, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ তাহা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং রাসলীলা যে 'অবরুদ্ধসৌরত' অবস্থায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ঘোষণা করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়াছেন। সুতরাং রাসলীলাকে কোনমতেই কামক্রীড়া বলা চলে না। এই কথাই শ্রীধর স্বামী রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন।

এই সকল আভ্যন্তরিক প্রমাণ ছাড়া অন্যদিক হইতে বিচার করিলেও প্রতীত হইবে, শৃঙ্গার রসের বহিরাবরণে বর্ণিত হইলেও রাসলীলা কামক্রীড়া নহে। কারণ, ভাগবত-প্রণেতা ব্যাসদেব বেদের বিভাগকর্তা, মহাভারতের রচয়িতা, পুরাণের সঙ্কলয়িতা এবং ব্রহ্মসূত্রকার; ভাগবতের বক্তা আজন্ম ব্রহ্মচারী ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব; ইহার শ্রোতা মৃত্যু-পথযাত্রী, পরলোকে কল্যাণকামী মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং অগণিত রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি। রচয়িতা, বক্তা ও শ্রোতার চরিত্র ও মনোভাবের কথা চিন্তা করিলেই প্রতিপন্ন হয় যে কামক্রীড়ার রূপকে বর্ণিত হইলেও রাসলীলা কামলীলা নহে, কামজয়ী লীলা। শুকদেব রাসলীলার উপসংহারে যথার্থই বলিয়াছেন:

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥” (১০।৩৩।৪০)

ইহার অর্থ, যে-ব্যক্তি ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সর্বদা শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া অচিরেই গোপীদের ন্যায় ভগবানে সর্বোত্তম প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কামরূপ হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে রাসোল্লাসতন্ত্রকারের মন্তব্যও স্মরণীয় :

“মৈথুনং সহ কৃষ্ণেন গোপিকাচরিতঞ্চ যৎ।
তন্ন কামাৎ অকামাৎ বা ভাবদেহেন তৎ কৃতম্॥”

,এই সকল কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতকার বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

“সহজ গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি ‘কাম’-নাম॥ (মধ্য-৮।২১৫)

রাসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

• রাসলীলা কেবল কামনা-কলুষ-বর্জিত লীলাই নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই লীলার অনির্বচনীয় মহিমা ভাগবত ও বিভিন্ন পুরাণে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বহু রচনায় নানা ভাবে কীর্তিত হইয়াছে। উপসংহারে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আদিপুরাণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, রাসলীলার সহচরী গোপীগণ ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, এমন কি নিজের চেয়েও তাঁহার অধিক প্রিয়—“ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।

ন চ লক্ষ্মীর্ন আত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥”

গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই মনোভাবে যে রাসলীলার শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার রাসলীলাকে পুরাণের সারভূতা লীলা বলিয়াছেন—"কথং পুরাণসারাণাং রাসযাত্রা হরেরহো।
হরিলীলা পৃথিব্যাস্তু সর্বা শ্রুতিমনোহরা॥"

গর্গসংহিতায় রাসের অনির্বচনীয় মহিমা একটি ঘটনার মধ্য দিয়া অতি সুন্দরভাবে কীর্তিত হইয়াছে।[৪১] ইহাতে দেখা যায়, মদনভস্মকারী মহাদেব ও কৃষ্ণভক্ত মহাতপা আসুরি মুনি রাসলীলারত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য যমুনাতীরে উপস্থিত হইলে দ্বারপালিকাগণ বলেন, গোপীগণ ছাড়া রাসমণ্ডলে প্রবেশের অধিকার আর কাহারও নাই। তাঁহাদের যদি এই লীলা দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে মানস সরোবরে স্নান করিয়া গোপীভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে। মহাদেব ও আসুরি এই নির্দেশ অনুসারে রাসমণ্ডলে উপনীত হইয়া গোপীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করেন। রাস শ্রেষ্ঠ লীলা না হইলে মহাদেব কখনই ইহা দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেন না এবং এই লীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে বন্দনাও করিতেন না।

অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকট তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণের কথা ভাগবতে যে ভাবে স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই রাসলীলার শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বলিযাছেন, গোপীদের প্রেমের ঋণ দেবতাদের মতো দীর্ঘায়ু হইলেও পরিশোধ করিতে পারিবেন না। অচ্ছেদ্য গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া গোপীগণ তাঁহার যে সেবা করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা তাঁহার নাই—কেবল গোপীদের নিজ গুণেই সেই ঋণ পরিশোধ হইতে পারে।[৪২]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই স্বীকারোক্তির পর রাসলীলার শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনার উপসংহার করাই উচিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই

স্বীকারোক্তির তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে চৈতন্যচরিতামৃতকারের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন :

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥"[৪৩]

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, যে আমাকে যে-ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি।[৪৪] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা ব্রজগোপীদের অগাধ প্রেমের কাছে পরাজয় মানিয়াছে।

ইহাই ব্রজগোপীদের রাসলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য। এই প্রেমের এমনই মহিমা যে, স্বয়ং ভগবানের প্রতিজ্ঞাও ইহার কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই লীলার মহিমা তাই যুক্তি দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, নীতিশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া বুঝা যায় না। এই পরম গম্ভীর লীলার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে গোপীদের ন্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের রসানন্দে বিভোর হইতে হয়। একমাত্র এই পথেই যে এই লীলার মহিমা উপলব্ধি সম্ভব, অন্য কোন ভাবে নহে, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন—"প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড়ো দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ জিনিষ যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টাই করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে চায় এবং উহার সমালোচনা করিতে যায়। কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা

দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না।"[৫৪]

উল্লেখপঞ্জী

১। বিস্তৃত আলোচনা 'মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

২। Evelyn Underhill—Mysticism (1922) পৃঃ ৩৯১

৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৪।৩।২১

৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রেমধর্ম (১৩৪৫) পৃঃ ২৪৪

৫। Evelyn Underhill—Mysticism পৃঃ ১৭৫, ৫০৯

৬। উজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীহরিপ্রিয়া-প্রকরণ পৃঃ ১৯-২০

৭। ভাগবতপুরাণ—১০।২৯।৮

৮। ঐ —১০।৩১।১৬

৯। ঐ —১০।৩২।২১

১০। ঐ —১০।৩৩।২৬-২৮

১১। ঐ —১০।৩৩।৩০

১২। ঐ —১০।৩৩।৩৬

১৩। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—২।১৭

১৪। গীতা—১৩।২

১৫। ভাগবতপুরাণ—১০।১৪।৫৫

১৬। ঐ —১০।৩৩।৩৭

১৭। ঐ —১০।৩৩।৩৮

১৮। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

১৯। শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য

২০। এই বিষয়ে প্রধান প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যের অভিমতের আলোচনা পরিশিষ্ট (২)-এ দ্রষ্টব্য

২১। সাহিত্যদর্পণ—৬।২৯৮

২২। হরিবংশ—২।২০।২৫-২৮, ৩৫
২৩। বিষ্ণুপুরাণ—৫।১৩।৪৮-৫০
২৪। ভাগবতপুরাণ—১০।৩৩।৩
২৫। ড°সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য—The Philosophy of the Srimad Bhagavata (1960) পৃঃ ১১৬
২৬। ভাগবতপুরাণ—১০।২১।২০
২৭। ঐ —১০।২৯।৪
২৮। ঐ —১০।২২।২৫, ২৭
২৯। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রাসলীলা (১৩৪৫) ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
৩০। ভাগবতপুরাণ—১০।২৯।২২, ২৬
৩১। ঐ —১০।২৯।৩১
৩২। ভাগবতপুরাণ—১০।২৯।৪২
৩৩। বিস্তৃত আলোচনা 'গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা' অধ্যায়ে
৩৪। ভাগবতপুরাণ—১০।২৩।৩৩-৩৪
৩৫। ঐ —১০।২৯।৩২
৩৬। ঐ —১০।২৯।৪৬
৩৭। ঐ —১০।৩১।১৯
৩৮। ঐ —১০।৩২।২১
৩৯। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথা (১৩৫৪)—পৃঃ ২১৬—২১৭
৪০। ভাগবতপুরাণ—১০।২৯।১, ৪২ ; ১০।৩২।২ ; ১০।৩৩।২৬
৪১। বৃন্দাবনখণ্ড—২৫ অধ্যায়
৪২। ভাগবতপুরাণ—১০।৩২।২২
৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত—১।৪।১৫১-৫২
৪৪। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' গীতা—৪।১১
৪৫। স্বামী বিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২। শতবার্ষিক সংস্করণ।

দ্বাদশ অধ্যায়

গোপীতত্ত্ব ও শ্রীরাধা

পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গিয়াছে. ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কান্তাভাবের সাধনায় যাহার চরম অভিব্যক্তি রাসলীলায় ; এই লীলার সহচরী ব্রজগোপীগণই কান্তাভাবের সাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাধিকা। এই গোপীগণের এবং রাসলীলার চমৎকারিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা, কেবল শুকদেব বা ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবই নহেন, লীলার নায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও একাধিক প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই গোপীদের পরিচয় কি, ইঁহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য কি এবং কৃষ্ণ-ভজনায় সে সাধনার গুরুত্বই বা কতটুকু, সে সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর্তমান অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে গোপীদের নামের অনুল্লেখ

ভাগবতপুরাণের পাঁচটি অধ্যায়ে ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিবরণের কোথাও গোপীদের পরিচয়, এমন কি, নামের উল্লেখও নাই। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। উভয় পুরাণেই কেবল 'কাচিৎ', 'একা', 'সা' প্রভৃতি পদে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যেমন বিষ্ণুপুরাণে 'কাচিদা-লোক্য গোবিন্দমায়ান্তম্', 'পরিবর্তশ্রমেণৈকা……দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে'[১] ইত্যাদি এবং ভাগবতে—'তুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ', 'তত্রৈকোবাচ', 'অনয়ারাধিতো নূনম্', 'সা বধূরন্বতপ্যত,' 'কাচিদ্রাস-পরিশ্রান্তা' ইত্যাদি।[২] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, হরিবংশেও গোপীদের নামের কোনও উল্লেখ নাই। গোপীগণের সুস্পষ্ট পরিচয় না

দিয়া এইরূপ ইঙ্গিতচ্ছলে বর্ণনার একটি কারণ শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহৎ ভাগবতামৃতে অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শুকদেব রাসলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে গোপীদের নাম উল্লেখ না করায় উত্তরা বিস্মিত হইয়া পুত্র পরীক্ষিৎ-কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পরীক্ষিৎ ইহার উত্তরে বলেন, আমার গুরু শুকদেব কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সী রুক্মিণী প্রভৃতির নাম কীর্তন করিয়াছেন কিন্তু পরম প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণের অনুপম কৃষ্ণ-প্রেমের কথা স্মরণ করিলেই তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। এই কারণেই তিনি তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। শ্রীসনাতন বলেন—"অতএব দশমস্কন্ধে সামান্যেনৈব উক্তির্নতু বিশেষেণ নামগ্রহণাদিনা।" তাঁহার এই অনুমান যে ভাগবতসমর্থিত, তাহা পুরাণকারের অঘাসুরলীলার উপসংহার শ্লোকের বর্ণনা হইতে জানা যায়।[৩]

গোপীদের পরিচয়

এই সকল পুরাণে ব্রজগোপীগণের নামের উল্লেখ না থাকার কারণ যাহাই হউক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ পদ্মপুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, রাধাতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী কয়েকজন গোপীর নাম পাইয়াছেন এবং তাহা বৈষ্ণবসমাজে প্রচারও করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণীতে এইরূপ আটজন গোপীর নাম করিয়াছেন :

> "নৌমি চন্দ্রাবলীং ভদ্রাং পদ্মাং শৈব্যামনুক্রমাৎ
> শ্যামাং বিশাখাং ললিতাং রাধামিত্যষ্ট তৎপ্রিয়াঃ ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির 'শ্রীহরিপ্রিয়া-প্রকরণে'

পঁচিশজন গোপীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নিত্য-প্রেয়সী আর খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, কুঙ্কুমা প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ নিত্যকান্তা। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই আবার শত শত যূথ আছে। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা এবং শৈব্যা ছাড়া শ্রীরাধা হইতে কুঙ্কুমা পর্যন্ত প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী কিন্তু সৌভাগ্যের আধিক্যে শ্রীরাধা প্রভৃতি অষ্টমূর্তিই প্রধানা বলিয়া পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণলীলার মূল গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে কেবল যে গোপীদের কোন নাম ও পরিচয় নাই তাহাই নহে; সাধিকা-শিরোমণি গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা, যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুগলমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপাস্যায় পরিণত, তাঁহারও নাম এবং পরিচয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখের অভাব বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এই দুই পুরাণে কেবল এইটুকু পাওয়া যায় যে, গোপীদের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং রাসমণ্ডল হইতে প্রস্থানের পর ইঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করেন। যেমন, বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, যে রমণী অন্য জন্মে ভগবান বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন, সেই রমণীকে বিষ্ণু কোন পুষ্পের দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।[৪] ভাগবতপুরাণে বলা হইয়াছে, বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া ব্রজবালাগণ তাঁহারই অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদচিহ্নের সহিত কোনও গোপীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং অতি দুঃখিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সহচরী এই ব্রজরমণী নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া সেই ভাগ্যবতী রমণীকে লইয়া নির্জন স্থানে গমন করিয়াছেন :

"তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্॥
....
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"*

ভাগবতে রাধানামের ইঙ্গিত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে শেষোক্ত শ্লোকের 'অনয়ারাধিতঃ' পদেই রাধা নামটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রবক্তা শ্রীনাথ চক্রবর্তী তাঁহার চৈতন্যমতমঞ্জুষায় ভাগবতের এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীকে পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন এবং যেহেতু অন্য সকল গোপী অপেক্ষা ইহার উপর তাঁহার প্রীতি অধিক, সেই হেতু তাঁহাকে রাধা (যিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধা, রাধ্ ধাতুর অর্থ সিদ্ধি) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই নিরুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত একদেহে তাঁহার মিলনের বা একাত্মতার সূচক। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত। শ্রীনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন, তাঁহার এই টীকা মহাপ্রভুর মতের অনুসরণে লিখিত।* সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, 'অনয়ারাধিতঃ' পদে রাধা নামটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া মহাপ্রভু নিজেও বিশ্বাস করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব তাঁহাদের টীকায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কিন্তু অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই ব্যাখ্যা অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, ভাগবতকার যদি রাধা নামেরই উল্লেখ করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে এই বিরাট গ্রন্থে ঐ শ্লোকাংশে ছাড়া অন্যত্র কেন তাহার উল্লেখ নাই, উহাতেই বা এমন প্রচ্ছন্ন

উল্লেখ কেন এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের মাধ্যমে বিরহবিধুর গোপীদের নিকট যে-সান্ত্বনাবাক্য প্রেরণ করেন, তাহাতেই বা গোপীশ্রেষ্ঠা রাধার কোনও উল্লেখ নাই কেন? শ্রীসনাতন গোস্বামী অবশ্য বৃহৎ ভাগবতামৃতে ইহার একটা কারণ অনুমান করিয়াছেন। তাহার উল্লেখ এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকেই করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সর্বপ্রধান উপজীব্য ভাগবতপুরাণ এবং কৃষ্ণলীলা-প্রধান বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধার নাম ও পরিচয় স্পষ্টভাবে না থাকিলেও পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র, রাধাসম্মোহনতন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে শ্রীরাধার নাম, জন্ম-বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচিত্র বিলাস ও তাঁহার অনন্যসাধারণ মহিমা বর্ণিত হইয়াছে ইহা ছাড়া লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যেও শ্রীরাধার নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিভিন্ন লীলার বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল নিদর্শন হইতে জানা যায়, অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্ব হইতে শ্রীরাধা ভারতীয় সাহিত্যের পরিচিত চরিত্র এবং রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতীয় কবিকল্পনার উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল।[৭]

গোপীদের প্রকৃত পরিচয়

কিন্তু বৈষ্ণবদের নিকট গোপীগণ ও শ্রীরাধার জন্মবৃত্তান্ত, নাম-ধাম প্রভৃতি বহিরঙ্গ পরিচয়ই বড় কথা নহে, তাঁহাদের নিকট গোপীদের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় হইল, ইহারা মহাভাববতী কৃষ্ণ-প্রেয়সী; শ্রীকৃষ্ণকে বশ করার উপযোগী প্রেম (মহাভাব) সযত্নে রক্ষা করেন বলিয়াই ইহারা গোপী।[৮] ইহাদের স্বরূপের এই তাৎপর্য-বর্ণনায় চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন:

> "বৃন্দাবন-ক্রীড়ার সহায় গোপীগণ
> গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন।

প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ-প্রেমরসগুণে গোপিকা প্রবীণ॥[৯]

গোপীদের স্বরূপের এই তাৎপর্য বুঝিতে হইলে তাঁহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। আবার সেই সাধনার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গোপীতত্ত্ব বুঝিতে হইলে শক্তিতত্ত্ব জানা দরকার। ইতিপূর্বে[১০] বলা হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ত্রিবিধ—স্বরূপশক্তি বা চিৎ-শক্তি, মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গশক্তি এবং জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি। এই স্বরূপশক্তির আবার ত্রিবিধ প্রকাশ—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। তাঁহাদের মধ্যে সন্ধিনী পরব্রহ্মের সৎ অংশের, সংবিৎ চিৎ অংশের এবং হ্লাদিনী আনন্দ অংশের শক্তি। স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যাহার দ্বারা নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন, তাহাকেই বলে হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি। পরব্যোমে নারায়ণের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীদেবী এবং পরব্যোমস্থিত অন্য ভগবৎ-স্বরূপসমূহের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকা-মথুরায় রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ এবং ব্রজে কৃষ্ণ-কান্তা গোপীগণ হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ সকলেই হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত বিগ্রহ হইলেও ইহাদের আনন্দদায়িনী শক্তিতে তারতম্য আছে এবং সেই তার-তম্যেই ইহাদের আপেক্ষিক উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়া থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে সকল কৃষ্ণ-কান্তার মধ্যে গোপীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার যুক্তিধারা অবলম্বনে গোপীগণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের কৃষ্ণ-প্রেমই কান্তারতি বা মধুরা রতি; তারতম্যভেদে এই রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা।[১১]

ইহাদের মধ্যে যে-রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনেই যাহা উৎপন্ন হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার মূল কারণ, তাহাকেই সাধারণী রতি বলে।[১২] ভাগবতপুরাণে বর্ণিত কুব্জার প্রেমই সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণদর্শনেই কুব্জার মনে সম্ভোগের ইচ্ছা জাগিয়াছিল।[১৩] এই রতি দুই দিক হইতে নিকৃষ্ট। প্রথমে, গাঢ়তার অভাবে সম্ভোগ ইচ্ছাতেই এই রতির শেষ; সম্ভোগের ইচ্ছা হ্রাস পাইলে ইহাও হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, সম্ভোগেচ্ছায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখের দ্বারা নিজে প্রীতিলাভ করিব, ইহাই ছিল কুব্জার বাসনা সুতরাং এই প্রীতি নিকৃষ্ট।

যে-রতি গুণ প্রভৃতি শ্রবণে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে, সেই গাঢ় রতিকে সমঞ্জসা বলে।[১৪] শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছা হইতেই সমঞ্জসা রতিমতীদের পত্নীত্বের অভিলাষ এবং তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্ভোগের ইচ্ছা। তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা সাধারণী রতিবিশিষ্টা কুব্জা প্রভৃতির ন্যায় আত্মসুখের বাসনা হইতে উৎপন্ন নহে। সমঞ্জসা রতির বিকাশের অবস্থায় সম্ভোগের তৃষ্ণা থাকে না, কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছাই থাকে। পরে সময় সময় সম্ভোগের তৃষ্ণা দেখা দেয় কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছা দূর হয় না। উভয়ই একসঙ্গে থাকে। শ্রীরূপ এই রতির দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তার[১৫] উল্লেখ করিয়াছেন।

যে-রতির একমাত্র তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং যাহাতে নিজের সুখের ইচ্ছা একেবারেই নাই তাহাই সমর্থা রতি।[১৬] সাধারণী ও সমঞ্জসা রতি হইতে সমর্থা রতির একটি অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ, এই রতি সাধারণী রতির ন্যায় সাক্ষাৎ-দর্শন

বা আত্মসুখবাসনা হইতে উৎপন্ন নহে; সমঞ্জসা রতির ন্যায় ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের গুণ প্রভৃতি শ্রবণের অপেক্ষাও নাই, স্বভাবধর্মে এই রতি স্বতঃস্ফূর্ত এবং শীঘ্রই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়।[১৭] দ্বিতীয়তঃ, সাধারণী রতিতে নিজের সুখের জন্য সম্ভোগের ইচ্ছাই প্রবল। সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় এইরূপ ইচ্ছা জন্মে কিন্তু সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীদের কখনও এইরূপ ইচ্ছা জাগে না। কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনাই তাঁহাদের মধ্যে প্রবল। তৃতীয়তঃ, সমঞ্জসা রতিবিশিষ্টা রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য ব্যাকুল হইলেও ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া সেবায় প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহারা পত্নীত্ব লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমর্থা রতিবিশিষ্টা ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা এতই প্রবল যে, সেইজন্য তাঁহারা সর্বপ্রকার ধর্ম বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামী এই তিন শ্রেণীর রতির বিশেষত্ব আলোচনার শেষে বলিয়াছেন, সাধারণী রতির শেষ সীমা প্রেম, সমঞ্জসার অনুরাগ কিন্তু সমর্থা রতির শেষ সীমা ভাব।[১৮] সুতরাং অন্য সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সী অপেক্ষা গোপীদের উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে এই তিনটি অবস্থার অর্থাৎ প্রেম, অনুরাগ ও ভাবের বিশেষত্ব জানা প্রয়োজন।

শ্রীরূপ গোস্বামী সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা—রতির তিন প্রকার ভেদ আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, রতি দৃঢ় হইলে তাহার নাম হয় প্রেম, প্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়।[১৯] এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চৈতন্যচরিতামৃতকার ভাবের উর্ধ্বে মহাভাব নামক একটি স্তর নির্দেশ করিয়া তাহাকেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশের অবস্থা বলিয়াছেন ঃ

"প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥"[২০]

শ্রীরূপ গোস্বামী ভাব ও মহাভাবের মধ্যে কোন তারতম্য করেন নাই; তাঁহার মতে এই দুইটি যে প্রেমের একই অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম, তাহা 'ভাবের' বিশেষত্ব নির্দেশপ্রসঙ্গে 'মহাভাবের' প্রয়োগ হইতেই বুঝা যায়।[২১]

শ্রীজীবও লোচনরোচনী টীকায় বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে যেমন মাঝে মাঝে ভগবান না বলিয়া স্বয়ং ভগবান বলা হয়, তেমনই ভাবকেও কোন কোন সময় মহাভাব বলা হয়। চৈতন্য-চরিতামৃতকার কিন্তু ভাব ও মহাভাবের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন:

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥"[২২]

এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয়, দুইয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিলেও ইহাদের কোনও স্পষ্ট সীমা তিনি নির্দেশ করেন নাই। তবে 'অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার' (চৈ, চ, মধ্য—২৩।৩৮) এই উক্তি হইতে মনে হয়, চৈতন্যচরিতামৃতকার 'রূঢ়'কে 'ভাব' এবং 'অধিরূঢ়'কে 'মহাভাব' বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, সাধারণী রতির শেষ সীমা প্রেম। ইহা রতি বিকাশের দ্বিতীয় অর্থাৎ রতির পরবর্তী গাঢ় অবস্থা। তিনি ইহার সংজ্ঞা নির্দেশপ্রসঙ্গে বলেন, ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও সর্বপ্রকার ধ্বংসরহিত যে-নিশ্চল বন্ধন, তাহাই প্রেম।[২৩]

সমঞ্জসা রতির শেষ সীমা অনুরাগ। যে-রাগ প্রতি মুহূর্তে নূতন হয়, যাহার ফলে অতি পরিচিত প্রিয়জনকেও নবপরিচিত-রূপে প্রতীতি জন্মে এবং যে-রাগ তাহাকে প্রতিক্ষণ নবীনতা দান করে, তাহারই নাম অনুরাগ।[২৪]

রতি-বিকাশে পরবর্তী স্তরের নাম ভাব।[২৫] 'ভাব' বলিতে অনুরাগের সেই উৎকৃষ্ট অবস্থাকে বুঝায়, যে-অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের অনুপম মাধুর্য আস্বাদনের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করা যায়, যাহাতে আস্বাদনের চমৎকারিতায় আস্বাদক নিজের ও আস্বাদ্য বস্তুর কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কেবল মাধুর্যই অনুভব করেন; সেই অবস্থায় তাঁহার দেহে একই কালে অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য তিনি দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল, আত্মীয়পরিজন ও শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নিয়ম প্রভৃতি অসঙ্কোচে ত্যাগ করিতে পারেন। অমৃত যেমন সর্বোৎকৃষ্ট আস্বাদ্য বস্তু, প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও ভাব বা মহাভাব তেমনই সর্বাপেক্ষা আস্বাদনীয়। শ্রীরূপ এইজন্যই ইহাকে 'বরামৃতস্বরূপ শ্রীঃ' বলিযাছেন। ইহা মনকে স্বরূপে অবস্থান করায় অর্থাৎ মহাভাব হইতে মহাভাববতীদের মনের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, মন মহাভাবাত্মক হইয়া যায়—'স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ'।

এই ভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুই প্রকার। ভাবের প্রথম অবস্থাকে রূঢ় ভাব বলে। ইহাতে কতকগুলি অনুভাব লক্ষিত হয়। যেমন ১। নিমেষের অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ চক্ষুর পলক পড়ার সময় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যে বাধা জন্মে, তাহাও অসহ্য। ২। নিকটস্থ দর্শকদের হৃদয় বিলোড়ন অর্থাৎ এই রূঢ় ভাব বিকাশের সময় যাঁহারা নিকটে থাকেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই ইহার প্রভাব ৩। কল্পক্ষণত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক কল্পকাল (৪৩২ কোটি বৎসর) মিলিত থাকিলেও তাহা মুহূর্তের বলিয়া অনুভব ৪। শ্রীকৃষ্ণের সুখেও আর্তি-শঙ্কায় খেদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে থাকিলেও, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও মমতার আধিক্যবশতঃ, তাঁহার দুঃখ আশঙ্কা করিয়া দুঃখবোধ ৫। মোহাদির অভাবেও সর্ববস্তুর বিস্মরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ প্রভৃতির অত্যধিক স্মৃতিবশতঃ

মূর্ছা প্রভৃতি ছাড়াই 'আমি ও আমার জ্ঞান' লোপ ৬। ক্ষণকল্পতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণকালকেও এক কল্প বলিয়া ধারণা ৭। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকারিতা অর্থাৎ এই রূঢ় ভাবের এমনই প্রবল প্রভাব যে তাঁহার বিরহে গোপীগণ যখন একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, তখন ঐ প্রেমের শক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন।

এই ভাব বা মহাভাবের অপর অবস্থাকে বলে অধিরূঢ় মহাভাব। যখন অনুভাবগুলি রূঢ় মহাভাবে যেরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইতেও অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করে, তখন তাহাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে।[২৬] এই মহাভাব এবং তাহার এইরূপ বিকাশ রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের পক্ষেও অতি দুর্লভ; ইহা কেবল শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপীদের উপলব্ধির বিষয়। শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাবের বিশেষত্ব নির্দেশের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন :

"মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে।"

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—ব্রজের প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ মহিষীদের পক্ষে দুর্লভ, তবে গুণে ও পরিমাণে কিছু কম এবং সমঞ্জসা রতির উপযোগী প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ নহে। কিন্তু মহাভাব তাঁহাদের পক্ষে সর্বতোভাবেই দুর্লভ কারণ ইহা একমাত্র ব্রজগোপী-দেরই অনুভবের বিষয়। এইখানেই রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীর সহিত ব্রজগোপীদের কৃষ্ণরতিতে পার্থক্য এবং এই জন্যই তাঁহারা অন্য সমস্ত কৃষ্ণ-প্রেয়সী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ব্রজগোপীদের মধ্যে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব

কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের মধ্যে যেমন মহাভাববতী ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ,

তেমনই গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্য গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্বের একটি সুন্দর কাহিনী পদ্যাবলীতে সংকলিত একটি শ্লোকে পাওয়া যায়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, গোবর্ধনধারণ-কালে শ্রীরাধাকে দেখিবামাত্রই শ্রীকৃষ্ণের হাত কাঁপিতে থাকে ; তাহা দেখিয়া অন্য গোপীগণ শ্রীরাধাকে সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন :

"দূরং দৃষ্টিপথাত্তিরোভব হরের্গোবর্দ্ধনং বিভ্রত-
স্ত্বয্যাসক্তদৃশঃ কৃশোদরি করঃ স্রস্তোঽস্য মা ভূদয়ম্।
গোপীনামিতি জল্পিতং কলয়তো রাধানিরোধাশ্রযম্
শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রমভ্রমকরাঃ কংসদ্বিষঃ পাতু বঃ ॥"

অর্থাৎ অন্য গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধার উপস্থিতিতেই শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর মানসিক চাঞ্চল্যে অভিভূত হইয়া পড়েন।

অন্য গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব, রাধা শব্দটির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ আলোচনা করিলেও প্রতিপন্ন হয়। রাধা শব্দটি রাধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ধাতুপাঠে ইহার অর্থ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, রাধ্ সংসিদ্ধ্যৌ (accomplishment) অর্থাৎ মাধুর্যের সাধনায় যিনি চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই রাধা। শ্রীরূপ গোস্বামীও শ্রীরাধার প্রাধান্য-বর্ণনায় উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে তাঁহার এই মাধুর্যময়ী সাধনারই উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, যে-অধিরূঢ় মহাভাব ব্রজগোপীদের নিজস্ব সম্পদ, তাহা দুই প্রকারের—মোদন ও মাদন। অধিরূঢ় মহাভাবে যখন নায়ক ও নায়িকার স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবসমূহের আতিশয্য প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে মোদন বলে। ইহাতে দুইটি ক্রিয়া লক্ষিত হয়—প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপীর চিত্তে যখন মোদন নামক মহাভাবের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের মনে তো ক্ষোভ জন্মেই, উপরন্তু যে মহিষীগণ

একটু দূরে থাকিয়া আবৃত স্থান হইতে মিলন দর্শন করেন, তাঁহাদের চিত্তেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে-সকল কৃষ্ণকান্তা তাঁহাদের প্রেম-সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত, তাঁহাদের প্রেম অপেক্ষাও অধিক প্রেম মোদনাখ্য মহাভাবে প্রকাশ পায়। এই মোদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাযূথেই বর্তমান —'রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্বতঃ'। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় সর্বতঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন —'সর্বতঃ সর্বত্র চন্দ্রাবল্যাদাবপীত্যর্থঃ'। অর্থাৎ এই মোদনাখ্য মহাভাব চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতেও একান্ত দুর্লভ। বিরহ-অবস্থায় এই মোদনকে মোহন বলে; তখন বিরহজনিত বিহ্বলতার ফলে সাত্ত্বিক ভাবগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই মোহনাখ্য মহাভাব বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাতেই বহুলভাবে প্রকাশ পায়—'প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি'।

দ্বিতীয় প্রকারের অধিরূঢ় মহাভাবের নাম মাদন। ইহাতে বিরহের অভাব; মিলনের অবস্থাতেই ইহা বিকাশ পায়। রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত সমস্তই ইহাতে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। মোহনাদি হইতেও মাদনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই হ্লাদিনীর চরম পরিণতি। এই মাদন শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য কাহারও মধ্যে থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণে ইহা নাই; নাই শ্রীরাধার অন্য কোনও সখীর মধ্যেও। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারই ইহা একান্ত নিজস্ব সম্পদ। অনাদিকাল হইতে ইহা কেবল তাঁহাতেই নিত্য বর্তমান :

'সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥'[২৭]

অতএব এই আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কৃষ্ণ-প্রেমের চরম উৎকর্ষ যে-মহাভাবে, তাহা রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদের মধ্যে

নাই, তাহা কেবল গোপীদের আছে বলিয়া তাঁহারা অন্যান্য কৃষ্ণকান্তা হইতে শ্রেষ্ঠ; আবার মহাভাবের সর্বোত্তম রূপ মাদন অন্য কোন গোপীর মধ্যে নাই, তাহা কেবল শ্রীরাধায় আছে বলিয়া তিনিই গোপীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীজীব গোস্বামী তাই শ্রীরাধার স্বরূপবর্ণনায় বলিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুরবৃত্তিময়ী অসংখ্য বণিতার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার করেন—"তদেবং পরমমধুরবৃত্তিময়ীষু তাস্বপি তৎসারাংশোদ্রেকময়ী শ্রীরাধিকা"। প্রেমের এই পরাকাষ্ঠার জন্য অন্য সমস্ত শক্তিও তাঁহার অনুগত—তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, সর্বাশ্রয়স্বরূপা। শ্রীরাধায় যে সর্বশক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে, গর্গসংহিতাকার 'রাধা' শব্দটির ব্যাখ্যায় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন—রকার অর্থে রমা (শ্রী), আকার অর্থে আদিগোপী (লীলা), ধকার অর্থে ধরা (ভূ), আকার অর্থে বিরজা নদী (বিরজা)। ইঁহারা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চার প্রকার তেজ হইতে উৎপন্ন—তাঁহার পত্নী। ইঁহারা কুঞ্জমন্দিরে রাধার দেহে বিলীন হন, তাই রাধা সর্বশ্রেষ্ঠ। মণীষিগণও এই কারণে তাঁহাকে পরিপূর্ণতম বলিয়া থাকেন।[২৮] কিন্তু কেবল প্রেমের চরম উৎকর্ষে ও সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যের সমাবেশেই শ্রীরাধা অন্য গোপীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের আরও কারণ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ত্রিতত্ত্বরূপী, শ্রীরাধাও তেমনই ত্রিতত্ত্বরূপিণী। একথা বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলরামের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন:

"সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল।
ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥"

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়াই ঐ গ্রন্থে তাঁহার স্বরূপবর্ণনায় বলা হইয়াছে:

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা॥"

চৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে এই শ্লোকের তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইতেছে, শ্রীরাধা গোবিন্দের আনন্দদায়িনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্বস্ব ও সর্বকান্তার শিরোমণি। তিনি দেবী অর্থাৎ দীপ্তিময়ী, অতএব পরমা সুন্দরী। অথবা তিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা বলিয়াই তাঁহাকে দেবী বলা হয়। তিনি কৃষ্ণময়ী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান। যেখানেই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই তিনি শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দর্শন করেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসময়, তিনিও প্রেমরসময়ী কৃষ্ণ-শক্তি অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই কারণেই তাঁহাকে কৃষ্ণময়ী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণই তাঁহার আরাধনা বলিয়া তাঁহার নাম রাধিকা। তিনি পরম দেবতা, লক্ষ্মীবর্গের অধিষ্ঠান এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি সর্বসৌন্দর্যের মূল আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণের সর্ববাঞ্ছার আশ্রয় অর্থাৎ সমস্ত বাসনা পূরণে সমর্থ। যিনি বিশ্বকে মুগ্ধ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের তিনি মোহিনী। অতএব শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠ ঠাকুরাণী। শ্রীরাধা পূর্ণ শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন। অগ্নি ও অগ্নিশিখার ন্যায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোন পার্থক্য নাই।[২৯]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'প্রেমসম্পুট' নামক গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধা নিজেই বলিয়াছেন :

"একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে
স্নেকাসুসংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।
কস্মিংশ্চিদেকসরসীব চকাসদেক-
নালোত্থমজ্জযগলং খলু নীলপীতম্॥"

অর্থাৎ একই সরোবরে যেমন একই মৃণালে একটি নীল ও একটি হলুদ বর্ণের পদ্ম একত্র শোভা পায় তেমনই একই রসসাগরে একই

আত্মায় গ্রথিত আমাদের দুইটি দেহ শোভা পাইতেছে। ইহার তাৎপর্য, রাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের রূপগত পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।

যুগলতত্ত্ব

এই জন্যই দেখা যায়, যিনি উপাসিকা-শিরোমণি তিনিই উপাস্যায় পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুগলমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং এই যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ উপাস্যরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় স্বীকৃত।[৩০] রাধাকৃষ্ণ-যুগলের উপাসনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পূর্বে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে এই সম্প্রদায়ের শ্রীরাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ন্যায় পরকীয়া নহে, স্বকীযা কান্তা। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ও যুগল-উপাসনার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই উপাসনা এবং লীলাবাদ সাধ্য-সাধনের মূল তত্ত্বরূপে যেভাবে গৃহীত হইয়াছে, নিম্বার্ক অথবা বল্লভ-সম্প্রদায়ে সেই ভাবে হয় নাই।

এই যুগল-উপাসনা বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশিষ্ট দান হইলেও ভারতীয় সাধনায় যুগলতত্ত্বের কল্পনা অতি প্রাচীন। আমাদের আদি দেবতা অর্ধনারীশ্বর, এই কল্পনাও শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদেও এই যুগলতত্ত্বের স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে, "তিনি একাকী থাকায় কোন ক্রমেই আনন্দিত হইলেন না, তিনি সঙ্গীর ইচ্ছা করিলেন। স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ হইলেন এবং সেই দেহকে ভাগ করিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নীর জন্ম হইল। এই জন্যই (পত্নীগ্রহণের পূর্বে) নিজদেহ অর্ধ দ্বিদলের ন্যায় (থাকে)—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।"[৩১]

এই যুগলতত্ত্বের কথা কেবল উপনিষদে নহে, তন্ত্রসাধনায়ও দেখা যায়। যে কোন তন্ত্রের আলোচনায় শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই মূলকথা। এমন কি, পরবর্তী কালে বৌদ্ধতন্ত্রেও এই যুগলতত্ত্ব দেখা যায়। বৌদ্ধ সাধনায় ইহার নাম যুগনদ্ধতত্ত্ব। H. V. Guenther তাঁহার "Yuganaddha" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The apparent dual aspect of man as well as of the whole universe of which the human being is but a certain manifestation, has been symbolised by the Prajnopaya (প্রজ্ঞোপায়). Prajna (প্রজ্ঞা) is the female aspect and Upaya (উপায়) is the male aspect. When they are represented or pictured in the anthropomorphic shape, they embrace each other, touching at all points of contact. This is to show that the one cannot be without the other and they are basically one."[৩২]

এই প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন—"ভারতবর্ষের ধর্মমতগুলি ভাল করিয়া দেখিলে মনে হয়, এই একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস যেন ভারতীয় মনের আদিম ধর্মবিশ্বাস; এই একটি বিশ্বাসই যেন ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র দেশ-কালের পরিবেশের ভিতর দিয়া নিত্য-নববৈচিত্র্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই যুগলে বিশ্বাসই হইল ভারতবর্ষের শক্তিবাদের একটি বিশেষ রূপ। এই-জন্যই ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদকে কোন শৈব বা শাক্ত মতবাদের গণ্ডির ভিতরে সীমাবদ্ধ করিতে আমরা নারাজ। এই যে একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস ইহা শৈব নহে, বৈষ্ণব নহে, সৌর, গাণপত্য নহে—ইহা বেদান্ত নহে, সাংখ্য নহে, তন্ত্র নহে—ইহা হিন্দুও নহে, বৌদ্ধ-জৈনও নহে—ইহা রহিয়াছে ভারতবর্ষের সর্বত্র, প্রায়

সর্বমতে; আমরা তাই বলিব, ইহা দর্শন-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের।"[৩৩]

অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যুগলসাধনা শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহাদের যুগল-উপাসনার মূলে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রেরণা রহিয়াছে। তাহা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনায় ভক্তের গুরুত্ব স্বীকার। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাঁহার পূজা অপেক্ষা তাঁহার ভক্তের পূজা কোন অংশে ন্যূন নহে—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'।[৩৪] গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ঘোষণাকে পূর্ণ মর্যাদা দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনায় ভক্তের উপাসনাকে অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার লঘুভাগবতামৃতের উত্তরার্ধ ভক্তামৃতে পদ্মপুরাণের ভিত্তিতে মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তের এক তালিকা দিয়া স্মৃতি-পুরাণের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের ভক্তই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকে ঘৃণা করেন বা তাঁহার পূজা করিতে অনিচ্ছুক, তিনি যথার্থ ভক্ত নহেন। শ্রীরূপের মতে ভক্তদের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ, পাণ্ডবগণ অপেক্ষা যাদবগণ, যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজগোপীগণ এবং অন্যান্য গোপী অপেক্ষা শ্রীরাধার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার উপাসনা গৌড়ীয় ভক্তিসাধনায় অপরিহার্য।[৩৫]

'গণে'র সাধনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় ভক্তের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের উপাসনা কেবল যুগল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা নহে পরিকর-পরিবৃত যুগলের উপাসনা। ব্রজে পরিকরগণই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। এই পরিকরবর্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণের

অনির্বচনীয় লীলার সহায়ক, তাঁহাদের সহায়তাতেই এই লীলার চরম স্ফূর্তি। সুতরাং, এই লীলার পরিপূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে পরিকরদের উপস্থিতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে অপরিহার্য। তাই দেখি, মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলার যে-নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন তাহাতে নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি শ্রীরাধা, সুবল, নারদ ও উদ্ধবের ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে অনুষ্ঠিত এই অভিনয়ের বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, যুগল রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পরিকরদের সহায়তা চৈতন্য মহাপ্রভু অপরিহার্য মনে করিতেন। কবিকর্ণপূরও গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় রাধাভাবদ্যুতিশবলিত সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণের যুগল লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও এই একই কারণে সঙ্কল্পকল্পদ্রুমে সখীপরিবৃত যুগল রাধাকৃষ্ণই যে তাঁহার একান্ত আরাধ্য, তাহা ঘোষণা করিয়াছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। বিষ্ণুপুরাণ—৫ ১৩।৪৩, ৫২

২। ভাগবতপুরাণ—১০।২৯।৫ ১০।৩০।২২, ২৮, ৩৯; ১০।৩৩।১১

৩। ঐ—১০।১২।৭৭

৪। বিষ্ণুপুরাণ—৫।১৩।৩৪

৫। ভাগবতপুরাণ—১০।৩০।২৬, ২৮

৬। চৈতন্যমতমঞ্জুষা, মঙ্গলাচরণ শ্লোক

৭। বিস্তৃত আলোচনা অবতরণিকায় দ্রষ্টব্য

৮। গুপ্‌ ধাতু হইতে গোপী শব্দ নিষ্পন্ন। গুপ্‌ ধাতু রক্ষণে, যে-সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণযোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী।—ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ—চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ১১৬

৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।১৪।১২১, ১৫৪
১০। ষষ্ঠ ও নবম অধ্যায়ে
১১। উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়িভাব-প্রকরণ—৪৩
১২। ঐ ঐ —৪৫
১৩। ভাগবতপুরাণ—১০।৪৮।৯
১৪। উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়িভাব-প্রকরণ—৪৮
১৫। ভাগবতপুরাণ—১০।৫২।৩৮
১৬। উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়িভাব-প্রকরণ—৫২-৫৩
১৭। ঐ ঐ —৩৮
১৮। ঐ ঐ —২৩২
১৯। ঐ ঐ —৫৯-৬০
২০। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।১৯।১৫২
(বিস্তৃত আলোচনা 'সাধনার ধারা' অধ্যায়ে)
২১। উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়িভাব-প্রকরণ—১৫৪,১৫৬
২২। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি। ৪।৫৯
২৩। উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়িভাব-প্রকরণ—৬৩
২৪। ঐ ঐ —১৪৬
২৫। ঐ ঐ —১৫৪
২৬। ঐ ঐ —১৭০
২৭। ঐ ঐ —২১৯
২৮। গর্গসংহিতা—গোলোকখণ্ড—১৫।৬৮-৭০
২৯। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি।৪
৩০। ঐ—মধ্য। ৮।১৯৮, ২১০
৩১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—১।৪।৩
৩২। Yuganaddha—Vol—III, 1952—Page 154
৩৩। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ (১৩৭০)—পৃঃ ৭৪
৩৪। ভাগবতপুরাণ—১১।১৯।২১
৩৫। লঘুভাগবতামৃত, উত্তরখণ্ড—৮, ১২, ১৮,২২,২৯,৪৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণই প্রাণনাথ

(মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গোপীগণ তথা শ্রীরাধার সাধনার বিশেষত্ব আলোচনায় দেখা গিয়াছে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধা গোপীগণের অগ্রগণ্য। নিজেদের সুখের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনাই মহাভাববতী গোপীদের সাধনার মূলমন্ত্র। ইহাদের সাধনার অনির্বচনীয়তাই চৈতন্যদেবকে বিশেষভাবে চমৎকৃত করে এবং তিনি ইহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনপন্থারূপে স্বীকার করিয়া ভগবৎ-সাধনার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করেন। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা চৈতন্য-প্রবর্তিত সেই সাধনার ধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

চৈতন্যদেব গোপীভাবে সাধনাকে কেন সর্বপ্রকার সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, তাহা রায় রামানন্দের সহিত আলোচনায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ভিত্তিতে চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় ভক্তিসাধনার বিশেষত্ব নির্ণয়প্রসঙ্গে ভগবৎ-সাধনার অন্যান্য পন্থার আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, তাহা না হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার তাৎপর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব যথার্থরূপে বুঝিতে পারা যাইবে না।

চতুর্বর্গ

এ জগতে মানুষমাত্রেরই কাম্য দুঃখ হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ ও ঐকান্তিক সুখভোগ। ইহাই পুরুষের (জীবের) অর্থ (কাম্য)। অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার

সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে, সেই পরম কাম্যবস্তুই পুরুষার্থ। কিন্তু যাহাতে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে, সেই চরমতম কাম্যবস্তুটি কি? সংসারে বিভিন্ন প্রকার মানুষের বিভিন্ন প্রকার রুচি ও প্রকৃতি দেখা যায়। সেইজন্য সাধারণভাবে সুখ সকলের কাম্য হইলেও রুচি ও প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য সুখের ধারণা সকলের এক প্রকার নহে। মানবপ্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার প্রকার পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের চতুর্বর্গও বলা হয়। শাস্ত্রকারগণ জীবের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চার প্রকার পুরুষার্থের এইরূপ ক্রমনির্দেশ করিলেও ধারাবাহিক উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই চারটি পুরুষার্থের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে কাম, তারপর অর্থ, তারপর ধর্ম ও সর্বশেষে মোক্ষের আলোচনা করিতে হয়।

সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থূল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে উপায় তাহারা অবলম্বন করে তাহা শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক দিক হইতে সমর্থনযোগ্য কি না, সে বিষয়ে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই শ্রেণীর লোকের পুরুষার্থকে বলে কাম।

পরবর্তী পুরুষার্থ অর্থ। অর্থ বলিতে সাধারণতঃ ধনসম্পত্তি বুঝায়। এই ধনসম্পদ লাভের ইচ্ছাই দ্বিতীয় পুরুষার্থ। ইহার উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, তবে ইহা কাম অপেক্ষা কিছুটা উন্নত স্তরের। অর্থকে যাহারা পুরুষার্থ মনে করে, তাহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজে মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিও কামনা করে। ধন-সম্পদ না থাকিলে তাহা পাওয়া যায় না বলিয়া ইহারা অর্থ চায়; অর্থকেই ইহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানে।

এই দুই শ্রেণীর লোক কেবল ইহকালের অস্তিত্বেই বিশ্বাসী, পরকালের কথা ইহারা চিন্তাও করে না। কিন্তু আর একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কেবল ইহকালের ভোগেই তৃপ্ত নহেন। পরকালে স্বর্গলোকে সুখভোগও ইঁহাদের কাম্য। পরকালে সুখভোগ করিতে হইলে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ধর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন। কারণ শাস্ত্রে বলে স্বধর্মের অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠানে কেবল ইহকালে নহে, পরকালেও সুখভোগ সম্ভব হইতে পারে। তাই স্বধর্মানুষ্ঠান ইঁহাদের লক্ষ্য। এই শ্রেণীর মানুষের পুরুষার্থকে বলা হয় ধর্ম।

মুক্তিই পরম পুরুষার্থ

এই তিনটি পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষারই তিনটি রূপ। এই তিন প্রকার পুরুষার্থেরই সমাপ্তি দেহের সুখে, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে। এই সংসারে সুখ অবিমিশ্র নহে—দুঃখ-মিশ্রিত, অনিত্য, মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী। স্বধর্মানুষ্ঠানে যে স্বর্গসুখ লাভ হয়, তাহাও দেহেরই সুখ এবং তাহাও নিত্য নহে। কারণ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মান' 'ণ পুণ্যবলে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হইলেও পুণ্যক্ষয়ে তাহাদের পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।[১] তাই এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন ধর্ম, অর্থ ও কাম যখন বাস্তবিক চিরস্থায়ী সুখ দিতে পারে না, তখন ইহাদের প্রকৃতপক্ষে পুরুষার্থই বলা যায় না। তাঁহারা কামনা করেন এমন সুখ, যাহা অনিত্য দৈহিক সুখ নয়, দেহের বিনাশ হইলেও যাহা শেষ হয় না, যাহা চিরস্থায়ী। অনিত্য দেহের সহিত যতদিন সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন নিত্য সুখ সম্ভব নহে। সুতরাং অনিত্য দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঘুচাইতে হইবে। মায়ার বন্ধন ঘুচাইতে পারিলে অনিত্য দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধের অবসান হইতে পারে এবং নিত্যসুখের সন্ধান-

লাভও সম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা মায়ার বন্ধন ছেদনের চেষ্টা করেন। এই বন্ধন-ছেদনের নামই মোক্ষ বা মুক্তি। ইহাই তাঁহাদের কাম্য। এজন্য এই শ্রেণীর লোকের পুরুষার্থকে বলে মোক্ষ। এই মোক্ষ লাভ হইলে সাংসারিক দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ও নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। সুতরাং চারপ্রকার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিই একমাত্র পুরুষার্থ।

এই মোক্ষ বা মুক্তিই সকল ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য। আস্তিক ও নাস্তিক (চার্বাক ভিন্ন) সকল দার্শনিকই এই মোক্ষের স্বরূপ ও তাহা লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এই মুক্তি মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুইপ্রকার। মুখ্য মুক্তিকে নির্বাণ বা কৈবল্য বলা যায়। নির্বাণ বা কৈবল্য অর্থে সাধারণতঃ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বুঝায়; অর্থাৎ জীবের যে-অবস্থায় সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ভবিষ্যতে আর কখনও কোন প্রকার দুঃখের আশঙ্কা থাকে না, সেই অবস্থাই জীবের কৈবল্য বা নির্বাণ।

কিন্তু যে সকল দার্শনিকের মতে পরমেশ্বর সাকার এবং লোক-বিশেষে সর্বদা অবস্থিত, যাঁহাদের মতে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন নহে, জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না, তাঁহারা নির্বাণ বা কৈবল্য কামনা করেন না। তাঁহাদের মতে মুক্তি চতুর্বিধ—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য। ঈশ্বর যে-লোকে প্রকাশমান, সেই বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি। ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য বা সমৃদ্ধি লাভ সার্ষ্টি মুক্তি। তাঁহার সহিত সর্বদা একত্র বাস করাই সামীপ্য মুক্তি এবং তাঁহার ন্যায় আকৃতি লাভ করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি অর্জন করার নাম সারূপ্য মুক্তি। এই চার-প্রকার মুক্তিকে গৌণমুক্তি বলে।

বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ মুখ্য ও গৌণ ভেদে এই দুইপ্রকার

মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করে। সকল দর্শনই এই মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সর্বদা সচেষ্ট। ভেদবাদী বা অভেদবাদী দার্শনিকদের মতে যেমন মুক্তিই মানবের চরম বা পরম পুরুষার্থ, পঞ্চরাত্র মতেও সেইরূপ; অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মুক্তিই যে মানবের পরম পুরুষার্থ, সে বিষয়ে দার্শনিকদের সহিত পাঞ্চরাত্রিকগণের কোন মতভেদ নাই। সাংখ্য, পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি দার্শনিকগণ নির্বাণ মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করেন কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকগণ নির্বাণকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সালোক্য, সারূপ্য, প্রভৃতি মুক্তির যে কোন একটি হইলেই জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। যে-নির্বাণে জীবের নিত্য-সিদ্ধ অহংভাবের বিনাশ হয়, সেই নির্বাণ কখনই কোন জীবের কাম্য হইতে পারে না। পাঞ্চরাত্রিকগণের এই সিদ্ধান্তই আচার্য রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি ভক্তিসম্প্রদায়ের মহাপুরুষগণের অভিমত। ইহাদের সকলের মতেই ভক্তি মুক্তির সাধন, ভক্তি জ্ঞানের পরিপক্ব অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে।

গৌড়ীয় মতে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ—মুক্তির জন্য ভক্তি নহে। চৈতন্যদেবই এই অপূর্ব সিদ্ধান্তের প্রবক্তা। তাঁহার অনুগৃহীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করেন যে, মোক্ষ বা নির্বাণ মানুষের চরম বা পরম পুরুষার্থ নহে; ভক্তির চরম অবস্থা যে-প্রেম তাহাই পরম পুরুষার্থ। কারণ, মুক্ত অবস্থার পরেও ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তির প্রেরণায় সিদ্ধদেহ ধারণ করিয়া ভগবানের সেবা করেন—

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।' সৌপর্ণশ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, 'মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসতে' অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণও ভগবানের উপাসনা করেন। এই প্রসঙ্গে গীতার 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকের[৭] তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিতেছেন যে, ব্রহ্মভূত বা মুক্ত হইবার পরে মানুষ শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ মুক্তি জীবের চরম বা পরম অবস্থা নহে, ভক্তিই জীবের চরম বা পরম অবস্থা। এই কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মুক্তি-কামনাকে 'পিশাচী' এবং ভক্তিপথের বাধা বলিয়া নির্দেশপূর্বক ঘোষণা করিয়াছেন, যে-পর্যন্ত হৃদয়ে ভোগের বাসনা এবং মুক্তির কামনা-রূপ দুই পিশাচী বর্তমান থাকে, সে পর্যন্ত হৃদয়ে ভক্তিরূপ নির্মল সুখের আবির্ভাব সম্ভব নহে :

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥" (১।২।২২)

এই ভক্তি কিন্তু শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি সাধনভক্তি নহে, সাধ্য বা পঞ্চম পুরুষার্থ-রূপ ভক্তি। ইহাকেই গৌড়ীয় আচার্যগণ প্রীতি বা প্রেমরূপ ভক্তি বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এই :

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

অর্থাৎ অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই ভক্তি। ইহা যদি ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভের কামনাশূন্য হয় এবং নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন ও কর্মযোগ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ইহাকে উত্তমা ভক্তি বলে।[৮] মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ

তর্কভূষণ মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিক কিংবা ভক্তমণ্ডলী সকলেই মোক্ষকে চরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যগণ ভক্তিকে কোথাও সাধ্য বলেন নাই, মুক্তির সাধনরূপেই ইহার স্থান। সুতরাং ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম পরম পুরুষার্থ, ইহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রচার করিয়াছেন। ····· কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ইহাই হইল যে, মুক্তি হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সমধিক। অর্থাৎ ভক্তিই চরম ও পরম পুরুষার্থ।······বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর হইতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মোক্ষবাদ প্লাবিত ভারতবর্ষ এইরূপ অপূর্ব শিক্ষার সন্ধান পায় নাই।"[৪]

মহাপ্রভু-রামানন্দ সংবাদ : সাধ্যতত্ত্ব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রীতি বা প্রেমভক্তিকে কেন পরম পুরুষার্থ মনে করেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে 'মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের আলোচনায় সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে গোদাবরীর তীরে রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া সাধ্যবস্তু অর্থাৎ পুরুষের কাম্যবস্তু নির্ণয় করিতে অনুরোধ জানান।

মহাপ্রভুর নির্দেশে সাধ্যবস্তু-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে রামানন্দ বলেন —'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়' এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক[৫] উদ্ধৃত করেন। ইহা প্রথম পুরুষার্থ ধর্মের কথা। মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া বলেন—সত্য বটে, বিষ্ণুভক্তিই সাধ্যবস্তু এবং বর্ণাশ্রমের নিয়ম পালন করিতে করিতে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হয় এবং সৎসঙ্গের প্রভাবে ভক্তিলাভের সম্ভাবনাও ইহাতে আছে। কিন্তু বর্ণাশ্রমের আচরণবিধি প্রত্যক্ষ-

ভাবে সাধ্যভক্তির সাধন না হইয়া, পরম্পরায় সাধন হওয়ায়, উহা অন্তরঙ্গ সাধন নহে, বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। অতএব 'আগে কহ আর।' তখন রায় রামানন্দ বলেন—'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার' এবং ইহার সমর্থনে গীতার শ্লোক[৬] উদ্ধৃত করেন। এই শ্লোকের অর্থ—হে অর্জুন, যে কাজ কর, যাহা আহার কর, যে যজ্ঞ কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর সেই সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে। ইহাও প্রথম পুরুষার্থ ধর্মেরই আর একটা দিক। কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য কৃষ্ণে কর্মফল সমর্পণ। তাই মহাপ্রভু বলিলেন—ইহাও অন্তরঙ্গ সাধনের কথা নয়—বহিরঙ্গ সাধনেরই কথা। ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন ভক্তিই হওয়া উচিত। সকাম বর্ণাশ্রমপালনের ন্যায় কৃষ্ণার্পিত নিষ্কাম কর্মযোগও কর্মই, উভয়ই আরোপসিদ্ধা[৭] ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি নহে। আরোপসিদ্ধা ভক্তি কখনও পরম পুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে না। অতএব 'আগে কহ আর।'

ইহার পর রামানন্দ বলিলেন—'স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার।' এবং ইহার সমর্থনে গীতার শ্লোক[৮] উদ্ধৃত করেন। ইহাতে শাস্ত্র-প্রচলিত প্রথম পুরুষার্থ ধর্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। রায় রামানন্দের এই শ্লোক পাঠের উদ্দেশ্য এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম পালনরূপ সকাম কর্ম এবং শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগ আরোপসিদ্ধ হইলেও, সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিরূপ যে ভক্তি, তাহা স্বরূপসিদ্ধ, অতএব শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্তু মহাপ্রভু ইহাও অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন—ইহাও বহিরঙ্গ সাধনের কথা। কারণ শরণাগতি স্বরূপসিদ্ধ হইলেও সাধক নিজের দুঃখ নিবারণের জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হন বলিয়া ইহাও শুদ্ধা ভক্তি হইতে পারে না। জ্ঞান ও কর্মের আবরণমুক্ত হইলেও, ইহাতে দুঃখ-নিবারণের উদ্দেশ্য থাকায় ইহা শুদ্ধা ভক্তি নহে, কারণ শুদ্ধা ভক্তির অন্যতম লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ ভিন্ন অন্য

কোন সুখের কামনা-শূন্যতা ; তাহা ইহাতে নাই। অতএব 'আগে কহ আর।'

ইহার পর রামানন্দ বলিলেন—'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।' এবং ইহার সমর্থনে গীতার শ্লোক* উদ্ধৃত করিলেন। ইহা শাস্ত্রনির্দিষ্ট চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের কথা। রায় রামানন্দের এই শ্লোক পাঠের উদ্দেশ্য, শরণাগতিতে দুঃখনিবারণের উদ্দেশ্য থাকায় উহা যদি উত্তমা ভক্তি না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কারণ, জ্ঞানমার্গে সুখ ও দুঃখ বাস্তব নহে; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে দুঃখনিবারণের উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু মহাপ্রভু ইহাও অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন—ইহাও বহিরঙ্গ সাধনের কথা। কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে দুঃখনিবারণের উদ্দেশ্য না থাকিলেও জ্ঞানের আবরণ থাকায়, ইহাও উত্তমা ভক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ ইহা স্বরূপসিদ্ধই নহে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞানই অঙ্গী, ভক্তি ইহার অঙ্গ মাত্র। এই ভক্তিতে মোক্ষলাভ হইলেও ইহা প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ দান করিতে পারে না। কারণ, ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও কেহ যদি নানারূপ তত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ভজনের প্রতিকূল ব্যাপারেই যে কেবল তাঁহার সময় বৃথা নষ্ট হইবে তাহা নহে, ক্রমাগত তত্ত্বের আলোচনায় একটা মোহও জন্মিতে পারে। এইরূপ মোহ জন্মিলে তত্ত্বের আলোচনাকেই তিনি ভজনের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করিতে পারেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছায় যিনি ভক্তির পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার ভজনে ভাবাবেশ জন্মিতে পারে না; ভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাও তাঁহার থাকে না। অতএব, 'আগে কহ আর।'

মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উত্তম বলিয়া গ্রাহ্য না হওয়ায় রায় রামানন্দ বলিলেন—'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।' এবং

ইহার সমর্থনে ভাগবতের শ্লোক[১০] উদ্ধৃত করিলেন। রামানন্দ-কথিত এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তি হইল ভগবানের মহিমা, তত্ত্ব প্রভৃতির জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। ভগবানের তত্ত্বাদি জানিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল সাধুমুখে উচ্চারিত ভগবৎ-কথাদি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফুরণ এবং প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। এতক্ষণ পর মহাপ্রভু বলিলেন—'এহো হয়'। অর্থাৎ ইহাই উত্তমা ভক্তি। কিন্তু এই শ্রবণকীর্তনাদিরূপ ভক্তি উত্তমা ভক্তি হইলেও সাধ্যভক্তি[১১] নহে, সাধন ভক্তি। অতএব 'আগে কহ আর'; অর্থাৎ যাহা সাধ্যভক্তি, তাহার কথা বল। রায় রামানন্দ তখন বলেন—'প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার।' রামানন্দ এতক্ষণ যে ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাকে 'সাধ্যসার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রেমভক্তির স্তরে আসিয়া বলিলেন—ইহা 'সর্বসাধ্যসার'। এবং ইহার সমর্থনে স্বরচিত দুইটি শ্লোকের[১২] উল্লেখ করেন। এই শ্লোক দুইটির প্রথমটির মর্ম, ভগবান কেবল প্রেমেরই প্রত্যাশা করেন, প্রেমশূন্য পূজার নানাবিধ সামগ্রীতেও তিনি সন্তুষ্ট হন না। আর দ্বিতীয়টির মর্ম, সর্বপ্রকারে নিজের মতি-বুদ্ধি প্রভৃতি কৃষ্ণরসে সিঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে। মহাপ্রভু বলিলেন, প্রেমভক্তিই যে সাধ্যসার তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তুমি যে প্রেমের কথা বলিতেছ, উহা মমত্ববর্জিত শান্ত প্রেম। উহা হইতেও যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার কথা বল—'এহো হয়, আগে কহ আর।'

রামানন্দ তখন বলেন—'দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার' এবং ইহার সমর্থনে ভাগবতের শ্লোক[১৩] উদ্ধৃত করেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন—দাস্যপ্রেম মমতাযুক্ত বলিয়া মমত্বশূন্য শান্ত প্রেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও সঙ্কোচ, গৌরব প্রভৃতির জন্য কিছু পরিমাণে শিথিল। অতএব উহা উৎকৃষ্ট নহে। উহা হইতে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহার কথা বল—'এহো হয়, আগে কহ আর'।

রামানন্দ তখন বলিলেন—'সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার' এবং ইহার সমর্থনে ভাগবতের শ্লোক[১৪] উদ্ধৃত করেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—এহোত্তম, আগে কহ আর'। এখানে লক্ষণীয়, এই সর্বপ্রথম মহাপ্রভু 'উত্তম' বলিলেন। এই প্রেমকে উত্তম বলার কারণ: শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ যে ভক্ত—

"আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥" (চৈ. চ-আদি।৪)

সখ্য প্রেমে এই সমত্বভাব বিদ্যমান; ইহাতে দাস্যপ্রেমের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ও সেবা আছে উপরন্তু আছে সঙ্কোচহীনতা যাহা দাস্যে অনুপস্থিত। এই প্রেম গাঢ় বটে কিন্তু এত গাঢ় নয় যাহাতে অন্যায় দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন, ভর্ৎসনা করিতে পারে; তাই মহাপ্রভু বলিলেন, 'আগে কহ আর' অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা তাহার কথা বল। রামানন্দ তখন বলিলেন—'বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্যসার' এবং ভাগবতের দুইটি শ্লোক[১৫] উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উক্তি সমর্থন করিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—এই প্রেম নিঃসন্দেহে উত্তম, কারণ ইহাতে সখ্যের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, সেবা ও সঙ্কোচহীনতা আছে উপরন্তু আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাড়ন, পালন ও অনুগ্রহের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজের চেয়ে ছোট বলিয়া ধারণা। কিন্তু এই প্রেমে নিজের অঙ্গ দিয়া সেবার কথা নাই, তাই শ্রীচৈতন্য বলিলেন—'আগে কহ আর' অর্থাৎ ইহার চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু থাকিলে বল।

রামানন্দ তখন বলিলেন—'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার' এবং ইহার সমর্থনে ভাগবতের দুইটি শ্লোক[১৬] উদ্ধৃত করেন। কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন অনেক। অতএব সাধন অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও অনেক। যাঁহার যে-ভাবে নিষ্ঠা, সেই ভাবকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে

ভাবসমূহের তারতম্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সেই অনুসারে কান্তাপ্রেমকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। কারণ, কান্তা-প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবা, সখ্যের নিষ্ঠা, সেবা ও সঙ্কোচশূন্যতা, বাৎসল্যের নিষ্ঠা, সেবা, সঙ্কোচহীনতা ও মমতার আতিশয্য—এই সমস্ত গুণ তো আছেই উপরন্তু আছে নিজের অঙ্গ দিয়া সেবার গুণটি। গুণের আধিক্যের জন্য উত্তরোত্তর স্বাদের আধিক্য হয়। মধুররস সর্বগুণের আধার, অতএব ইহা সর্বাপেক্ষা স্বাদু। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কান্তাপ্রেমেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন :

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥"

এই প্রেমের এমনই অতলস্পর্শী গভীরতা যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ইহার প্রতিদানে অক্ষম। তাই তিনি ভাগবতে স্বীকার করিয়াছেন, ব্রজদেবীগণের কান্তাপ্রেমের নিকট তিনি ঋণী।[১৭] তাঁহাদের এই প্রেমের গভীরতার কথা বলিয়া রায় রামানন্দ আর একটি অদ্ভুত কথাও শুনাইলেন। তাহা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ অপরিসীম সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আশ্রয় হইলেও তিনি যখন ব্রজ-গোপীদের সঙ্গে থাকেন, তখন সেই মাধুর্য বহু গুণ বর্ধিত হয়। অতএব ব্রজগোপীদের কান্তাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ।

কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—ব্রজদেবীগণের কান্তাপ্রেমই যে সাধ্যের সীমা, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু ইহার পরও যদি কিছু থাকে তাহা বল :

"……এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥"

রায় বলিলেন—ইহার পরও প্রশ্ন করিতে পারেন, এমন লোক পৃথিবীতে আছেন বলিয়া জানিতাম না। আপনি যখন প্রশ্ন

করিলেন, তখন শ্রবণ করুন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে রাধার প্রেমই 'সাধ্যশিরোমণি'—ইহা সর্বশাস্ত্র-সম্মত :

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥"

রাধা-প্রেমের মহিমা পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু যেন আপত্তির সুরে বলিলেন, রায়, তুমি যে বলিতেছ রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি, তাহার তো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। রাধার প্রেম যদি সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কেন অন্য গোপীদের ভয়ে তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন, তাঁহাদের সমক্ষেই তো শ্রীরাধাকে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিতেন। যে প্রেমে গোপনীয়তা আছে, তাহাকে তো গাঢ় প্রেম বলা যায় না।

রায় রামানন্দ অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত মহাপ্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। তিনি কবি জয়দেব-বর্ণিত বসন্তরাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের উপস্থিতি উপেক্ষা এবং তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়াই শ্রীরাধার সন্ধানে গিয়াছেন। বসন্তরাসের দুইটি শ্লোকে[১৮] অন্য গোপী অপেক্ষা রাধার উৎকর্ষই প্রমাণিত হইতেছে।

রামানন্দের মুখে রাধার সর্বাতিশায়ী প্রেমের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন—সাধ্য-সাধননির্ণয় জানিলাম। কিন্তু আরও কিছু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে; কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি আমাকে বল। এই প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয়, সাধ্যতত্ত্ব ও রাধার প্রেমের মহিমা সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বুঝি জানা হইয়া গিয়াছে; তাই অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। কিন্তু তাহা নহে, সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। প্রেম-মহিমার চরমতম বিকাশেই রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। সেই পরম

মহিমা বিকাশের জন্যই প্রথমে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, তারপরে বিলাসতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভুর প্রশ্ন।

রায় রামানন্দ সংক্ষেপে এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন ; কারণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসেই রাধাপ্রেমের অপূর্ব মহিমার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রবলভাবে আকর্ষণ ও বশীকরণের মহাশক্তিই যে রাধাপ্রেম, তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর কৌতূহল এখনও নিবৃত্ত হয় নাই. তাই তিনি বলিলেন—'এহো হয়, আগে কহ আর'। রায় রামানন্দ বলিলেন, ইহার পর বুদ্ধির অগ্রগতি অসম্ভব। তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসবিবর্ত বলিয়া এক বস্তু আছে, তাহা শুনিয়া আপনি সুখী হইবেন কিনা, জানিনা। এই কথা বলিয়া স্বরচিত একটি গীত গাহিলেন :

"পূহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল--অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥"

গানটি শ্রীরাধার উক্তি। শ্রীমতী আক্ষেপ করিয়া সখীর নিকট বলিতেছেন, প্রথমে চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাদের অনুরাগ প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর ভাবের চরম উৎকর্ষ মহাভাবে পরিণত হইল।

তখন আর স্ত্রী-পুরুষের ভেদ রহিল না। কাম উভয়ের মন পেষণ করিয়া এক করিল। অনুরাগের এই অবস্থায় অন্য কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই ; একমাত্র মদনই মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মিলন ঘটাইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আজ সবই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার বিরাগের অবস্থায় দূতীর প্রয়োজন হইল। সুপুরুষের প্রেমের ইহাই রীতি।

এই গানের 'না সো রমণ, না হাম রমণী' অংশেই প্রেমবিলাস-বিবর্তের ইঙ্গিত। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে 'বিবর্ত' শব্দের অর্থ বিপরীত আর শ্রীজীবের মতে পরিপক্ক অবস্থা। এস্থলে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যায়। পরিপক্ক অবস্থার ফলে বৈপরীত্য। প্রেমের চরম পরিপক্ক অবস্থায় পুনঃ পুনঃ মিলনের মধ্যেও অতৃপ্তিবশতঃ মিলনের জন্য যে প্রবল উৎকণ্ঠা, তাহার ফলে বাস্তব মিলনেও যে স্বপ্নের ন্যায় অনুভব, নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি ও বৈপরীত্য-জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রেমবিলাস-বিবর্তের প্রকাশক।

রামানন্দের মুখে এই গীতটি শুনিয়া সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে মহাপ্রভুর জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হইল। তিনি স্থির করিলেন, প্রেমবিলাস-বিবর্তে রাধা-প্রেমের যে মহিমা তাহাই চরমতম সাধ্যবস্তু। এই কারণেই প্রেমাবেশে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, সাধ্যবস্তুর সীমা ইহাই বটে কিন্তু সাধন ছাড়া সাধ্যবস্তু লাভ হয় না ; অতএব সেই সাধ্যবস্তু-লাভের উপায় বল।

সাধনতত্ত্ব

রায় রামানন্দ বলিলেন, সাধনে রহস্য অতিশয় গোপনীয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলা দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের দ্বারা বোঝা যায় না। কেবল সখীগণেরই এই লীলায় অংশগ্রহণের অধিকার আছে। তাঁহাদের সাহায্যেই এই লীলার বিস্তার। সখী ছাড়া

এই লীলা পুষ্ট হয় না। তাঁহারাই লীলাবিস্তার করিয়া ইহার রস আস্বাদন করেন। যিনি সখীভাবে সখীর আনুগত্যে ভজনা করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা-রূপ সাধ্যবস্তু লাভ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া সাধ্যবস্তু লাভের অন্য উপায় নাই। সখীগণের অনির্বচনীয় স্বভাবের বিশেষত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের লীলায় তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইয়া যে সুখ লাভ করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের মিলনের সুখ হইতে কোটী গুণ বেশি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা। সখীগণ শ্রীরাধারূপ প্রেমকল্পলতার পল্লব, পুষ্প ও পাতা; অতএব শ্রীকৃষ্ণলীলারূপ অমৃতের দ্বারা যদি ঐ লতাকে সেচন করা যায়, তবে পল্লব প্রভৃতির নিজেদের সেচন হইতে কোটী গুণ ফল লাভ হয়। যদিও কৃষ্ণের সহিত মিলনের ইচ্ছা সখীদের নাই, তথাপি শ্রীরাধা নানা ছলে শ্রীকৃষ্ণকে সখীদের নিকট প্রেরণ করিয়া পরস্পরের মিলন ঘটাইয়া থাকেন এবং তাহাতে নিজের মিলন অপেক্ষা কোটী গুণ সুখ অনুভব করেন। এইরূপ আত্ম-সুখবর্জিত প্রেমেই রসের পরিপুষ্টি হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই প্রেম দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। মহত্ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া গোপীপ্রেম স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত সাদৃশ্যের জন্যই গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে কামের উদ্দেশ্য নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ আর গোপীপ্রেমের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ। গোপীগণ নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখের কামনা করেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই গোপীভাবরূপ অমৃতের আস্বাদনে যাঁহার ইচ্ছা জন্মে, তিনি লোকধর্ম, বেদধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকেন। যিনি রাগানুগামার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হন।[১১]

সখীভজন

রায় রামানন্দ শ্রীরাধার প্রেমকে 'সাধ্যবস্তুর অবধি' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াও সখীভাবে সাধনাকে সাধ্যবস্তু লাভের একমাত্র উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে কয়েকটি প্রশ্ন উদিত হয়। প্রথমতঃ, কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াও তাঁহার ভাব গ্রহণ না করিয়া তাঁহার সখীগণের ভাব আশ্রয়ের কথা বলা হইল কেন অর্থাৎ রাধাভাবে সাধনার পরিবর্তে সখীভাবে সাধনার কথা বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়তঃ, এই সখীগণের স্বরূপ কি, তাঁহাদের সাধনার বিশেষত্বই বা কি; তৃতীয়তঃ, যে-সখীভাবে সাধনাকে তিনি একমাত্র সাধনপন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সাধনার ইঙ্গিত তিনি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন অর্থাৎ অন্য কোন [illegible] ইহার নির্দেশ আছে কিনা।

রাধাভাবে সাধনার পরিবর্তে সখীভাবে সাধনাকেই একমাত্র পন্থা বলিয়া রায় রামানন্দের নির্দেশের কারণ, শ্রীরাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি হইলেও উহা নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতে একমাত্র শ্রীরাধাতেই উহা বিদ্যমান। উহা তাঁহার কোনরূপ সাধনার ফল নহে। অতএব অপর সাধারণের পক্ষে সাধনার দ্বারা উহা লাভ করা সম্ভব নহে। জীব তো দূরের কথা, অন্য ভগবৎ-পরিকরগণ, এমন কি ব্রজগোপীদের পক্ষেও উহা একান্ত দুর্লভ। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-সেবা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; এজাতীয় সেবায় নিত্যদাস জীবের কোন অধিকার নাই—শ্রীরাধার সখীদের অনুগতরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই তাঁহার একমাত্র অধিকার। কান্তাভাবময়ী রাধাকৃষ্ণ-লীলার রহস্য একমাত্র মহাভাববতী ব্রজগোপীদেরই উপলব্ধির বিষয়। তাই ব্রজগোপীদের আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের সেবাই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু। এই কারণেই সখীদের আনুগত্যে সখীভাবে ভজনাকেই

রায় রামানন্দ জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনপন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রেমিক ভক্ত নিজের সুখের জন্য প্রেমময় ভগবানের ভজনা করেন না। কেবল প্রেমাস্পদের আনন্দবিধানের আকাঙ্ক্ষাতেই নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণতা। শ্রীরাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ অধিকতর, ইহা জানিয়া সখীগণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও যুগলমূর্তির সেবা। সখীগণের এই নিষ্কাম ভজনাই ভক্তসাধকের আদর্শ। এই কারণেই রায় রামানন্দ রাধাভাবে সাধনার পরিবর্তে সখীভাবে সাধনাকেই একমাত্র সাধনপন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন, এই সখীদের স্বরূপ কি এবং ইহাদের ভজনের আদর্শই বা কিরূপ? শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সখীপ্রকরণে সখীদের স্বরূপ ও তাঁহাদের ভজনের আদর্শ বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, সখীগণ প্রেম, লীলা ও মিলন প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিস্তার ঘটান। শ্রীরাধার সখীগণ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী—এই কয় ভাগে বিভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে প্রেষ্ঠসখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা প্রভৃতি আটজন সর্বগুণান্বিতা। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা-বশতঃ ইহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের, কখনও রাধার অনুগামিনী। এই সকল সখীর কাজ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রেম, গুণ প্রভৃতি কীর্তন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার, পরস্পরকে অভিসারে প্রেরণ, কৃষ্ণের হস্তে রাধাকে সমর্পণ, নায়ক-নায়িকার দোষ গোপন, নায়িকার পতি প্রভৃতিকে বঞ্চনা, যথাকালে মিলনসম্পাদন, সংবাদ-প্রেরণ প্রভৃতি। এই সখীগণের প্রেমের বিশেষত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীরূপ রাধার এক সখীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার কোনও নিত্যসখীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "শ্রীরাধার সহিত তোমার চিরমধুর লীলার সেবাই

আমার কাম্য। ইহা ছাড়া আমার আর কোন ইচ্ছা নাই। নিজের সুখলেশশূন্য এইরূপ সেবাতেই সর্বসুখের শেষ সীমা। তোমার অঙ্গস্পর্শের আনন্দও তাহার সহিত তুলনীয় নয়। সুতরাং আমি তাহার জন্য উৎসুক নই। আমাকে চিরবাঞ্ছিত এই সেবারই অধিকার দাও।"[২০] শ্রীরূপের এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, সখীর প্রেমে আত্মসুখের লেশমাত্র ইচ্ছা নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে সুখী করিবার একান্ত বাসনাই সখীপ্রেমের মূলমন্ত্র। তাঁহাদের সেবা করিয়াই সখীগণ ধন্য; সেবাসুখের সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদের নাই। এই স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কাম প্রীতিই প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কারণেই রায় রামানন্দ সখীভাবের সাধনাকেই একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সখী-সাধনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশেষত্ব

পরবর্তী প্রশ্ন হইতেছে, এই সাধনার ইঙ্গিত, রায় রামানন্দ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? অবতরণিকায় আলোচনা করা হইয়াছে, আলোয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে কান্তাভাবের সাধনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহাতে সখীভাবে সাধনার কোন উল্লেখ নাই। অন্য কোন সম্প্রদায়েও ইহার অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। তবে রামানন্দ এই সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে:

> "রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি।
> যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
> ....
> হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
> কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥"

রামানন্দের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভুর কৃপাতেই সাধনার এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহারই প্রেরণায়

রায় রামানন্দ উহা প্রচার করেন। এই সখীভাবে সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিজস্ব সম্পদ। চৈতন্য মহাপ্রভুই ইহার প্রথম প্রচারক।

অতএব এই আলোচনার শেষে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—জ্ঞান, কর্ম, মুক্তি, ধন, জন, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা নহে, গৌড়ীয বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য ভক্তি। এই ভক্তি কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—ভগবানের অনুরাগ ও বিরাগ, পীড়ন ও প্রসন্নতা, কোন কিছুতেই এই ভক্তির তারতম্য ঘটে না। ইহার একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের ঐকান্তিক সেবায় আত্মনিয়োগ। যাঁহার আবির্ভাবে কলিযুগ পবিত্র হইয়াছে, ভক্তিধর্মের প্রচারক সেই মহাপ্রভুই রাধাভাবে ভাবিত হইয়া এই ভক্তির আবেশে 'শিক্ষাষ্টকে' বলিয়াছেন :

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

মহাপ্রভুর উক্তি অবলম্বনে কবিরাজ গোস্বামী এই সাধনার বৈশিষ্ট্য তাঁহার অতুলনীয় ভঙ্গিতে যে-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতে পারে

"আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।

তা সভারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা কাহে হয় দুখী ?
মুঞি তার পায় পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তারে সুখী ॥

. . . .

এই রাধার বচন বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর রায় ।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধরণ না যায় ॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্বন্ধ ॥" (চৈ. চ. অন্ত্য ২০)

উল্লেখপঞ্জী

১। গীতা—৮।১৬

২। ঐ —১৮।৫৪-৫৫

৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।১।১১

৪। বাংলার বৈষ্ণব দর্শন (১৩৭০)-পৃঃ ১৩-১৪

৫। বিষ্ণুপুরাণ—৩।৮।৯

৬। গীতা—৯।২৭

৭। ভক্তি শুদ্ধা ও মিশ্রা ভেদে দুই প্রকার। শুদ্ধা ভক্তিকে নির্গুণ বা স্বরূপসিদ্ধাও বলা হয়। ইহা জ্ঞানকর্মাদির অধীন নহে। অপরপক্ষে, জ্ঞানকর্ম-যোগাদিমিশ্রিত ভক্তি মিশ্রাভক্তি। ইহাতে ভক্তি কেবল জ্ঞানকর্ম ও অষ্টাঙ্গ-যোগে ফলসিদ্ধির সহায়। এই শ্রেণীর কর্মমিশ্রা ভক্তির অপর নাম আরোপসিদ্ধা ভক্তি। কর্মমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত নিষ্কাম কর্মসমূহ এবং জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা সমাধি প্রভৃতি শ্রবণকীর্তনাদির ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধা নহে।

৮। গীতা—১৮।৬৬

৯। ঐ—১৮।৫৪

১০। ভাগবত—১০।১৪।৩

১১। উত্তমা ভক্তি সাধ্য ও সাধন ভেদে দুই প্রকার; শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের কৃপায় ইন্দ্রিয়সমূহের প্রেরণায় শ্রবণ-কীর্তনাদির নাম সাধনভক্তি আর শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি সাধনভক্তির দ্বারা যাহাদের আবির্ভাব ঘটে, সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবসমূহ সাধ্যভক্তি। সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে এবং সাধ্যভক্তি ভাব ও প্রেম ভেদে দুই প্রকার।

১২। (ক) "নানোপচারকৃতপূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥"

(খ) "কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

(পদ্যাবলীতে সংকলিত ও চৈ. চ. মধ্য। ৮ম-এ উদ্ধৃত)

১৩। ভাগবতপুরাণ—৯।৫।১৬

১৪। ঐ —১০।১২।১১

১৫। ঐ —১০।৮।৪৬ ও ১০।৯।২০

১৬। ঐ —১০।৪৭।৬০ ও ১০।৩২।২

১৭। ঐ —১০।৩২।২২

১৮। গীতগোবিন্দ—৩।১-২

১৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য। ৮

২০। উজ্জ্বলনীলমণি—সখীপ্রকরণ, ৮৮

চতুর্দশ অধ্যায়

সাধনার ধারা

(এক)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধন-রীতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধিকা হইলেও তাঁহার স্বরূপতা লাভ কিংবা রাধাভাবে কৃষ্ণসেবা জীবের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে। জীব নিত্য কৃষ্ণ-দাস ও অণু-স্বভাব বলিয়া তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার সমভাবাপন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যই মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ সখীভাবে—সখীর আনুগত্যে সেবাকেই জীবের একমাত্র সাধন-পন্থা বলিয়া নির্দেশ করেন।

সখী-সাধনার দুই রূপঃ রাগাত্মিকা ও রাগানুগা

রায় রামানন্দের এই নির্দেশের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সখীভাবে সাধনার দুই প্রকার—রাগাত্মিকা ও রাগানুগার পার্থক্য জানা প্রয়োজন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগের সাধন-ভক্তিলহরীতে এই দুই প্রকার সাধনার বিশেষত্ব নির্ণয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উপাস্য দেবতার প্রতি পরম আভিনিবেশই রাগ, সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। এই ভক্তি ব্রজবাসিগণের মধ্যে প্রকাশমান; যে-ভক্তি রাগাত্মিকার অনুগত, তাহাই রাগানুগা নামে খ্যাত।[১] চৈতন্যচরিতামৃতেও ইহারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়ঃ

> "রাগাত্মিকা ভক্তি-'মুখ্যা' ব্রজবাসিজনে।
> তার অনুগত ভক্তি 'রাগানুগা'-নামে॥
> ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা' রাগের স্বরূপলক্ষণ।

ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম॥"[২]

রাগাত্মিকা ভক্তিতে কেবল ব্রজবাসিগণেরই অধিকার; ইহা একমাত্র তাঁহাদেরই নিজস্ব সম্পদ। ব্রজবাসী অর্থ ব্রজের যে কোন অধিবাসী নহে। নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গল, শ্রীরাধা-ললিতা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণই এই সম্পদের অধিকারী। যত প্রকার ভক্তি আছে, তাহাদের মধ্যে রাগাত্মিকা ভক্তিই স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির প্রকাশে, বিষয়ে ও আশ্রয়ে সর্বপ্রধান। এই ভক্তি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাস। এই ভক্তি অনুপম মাধুর্যময় লীলা প্রভৃতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ। ইহার একমাত্র বিষয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকরগণ। রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার—সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা। মাতাপিতা, দাসসখা প্রভৃতি সম্বন্ধের অভিমানবশতঃ যাঁহারা অনুরাগের সহিত নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের ভক্তিকে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা বলে আর যাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই জাতীয় কোন সম্বন্ধ নাই, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করার বাসনায় যাঁহারা অনুরাগের সহিত তাঁহার সেবা করেন, তাঁহাদের ভক্তিকে কামরূপা রাগাত্মিকা বলে। কামরূপার বিশিষ্টতা এই যে, পার্থিব সম্বন্ধ তাহার কারণ নহে, একমাত্র প্রেমই তাহার প্রবর্তক। অধিকন্তু সম্বন্ধের একটা সীমা আছে; সেই সীমা সম্বন্ধরূপার সেবায় অতিক্রম করা চলে না। কামরূপার সেবায় কোনরূপ সীমা নাই, বাধাবিঘ্নও নাই। ইহাতে সেবার ইচ্ছাই সেবার একমাত্র প্রবর্তক; সুতরাং যে-ভাবে সেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, সেই ভাবেই সেবা করা যায়। মাতাপিতা নন্দযশোদা, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি

বন্ধুগণ, রক্তক, পত্রক প্রভৃতি সেবকবৃন্দ সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকার পাত্র। মহিষীদের অনুরাগ সম্বন্ধরূপা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত; কারণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের পতি—এই সম্বন্ধই তাঁহাদের সেবার প্রবর্তক। কিন্তু ব্রজগোপীগণের সেবার মূলে কোন প্রকার সম্বন্ধের প্রেরণা নাই বলিয়া একমাত্র তাঁহারাই কামরূপা রাগাত্মিকার আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে অথবা অনুরাগী ভক্তের নিকট হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির অপূর্ব মাধুর্যের কথা শুনিয়া সেইরূপ সেবার বাসনা জন্মিলে ভক্ত সেই সেবার অধিকার লাভের জন্য ব্রজবাসীদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজনা করেন। এই আনুগত্যমূলক ভজনই রাগানুগা ভক্তি। চৈতন্যচরিতামৃতকার ইহার লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

“রাগময়ী ভক্তির হয় ‘রাগাত্মিকা’ নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি॥”[৩]

রাগানুগা ভক্তির বিশেষত্ব এই, ইহাতে ভক্তের মনে সেবার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা কোনরূপ শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না। লোভনীয় বস্তু দেখিলে মানুষ যেমন আপনিই লুব্ধ হয়, কোনরূপ যুক্তিতর্ক বা শাস্ত্র-প্রমাণের বিধিনিষেধ বা নির্দেশের অপেক্ষা করে না, তেমনই রাগানুগা ভক্তিতে ব্রজবাসীদের সেবা-মাধুর্যের কথা শুনিয়াই ভক্তের মনে সেবার অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই আকাঙ্ক্ষার উন্মেষের জন্য কোনরূপ শাস্ত্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না, সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ইহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে-ভজনে শাস্ত্রের নির্দেশ থাকে, তাহাই বৈধী; শাস্ত্রে আছে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে সুখসমৃদ্ধিলাভ ঘটে, না করিলে পাপের ফলে

বিপদে পড়িতে হয়, পরিণামে নরকযন্ত্রণা-ভোগের আশঙ্কাও থাকে। এই শাস্ত্রকথিত সুখসমৃদ্ধির লোভে, আপদ-বিপদের ভয়ে, নরকযন্ত্রণার আশঙ্কায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনিই বিধিমার্গের ভক্ত। এই ভক্তির মূলে শাস্ত্রবিধির নির্দেশ থাকে বলিয়াই ইহাকে বলে বৈধী ভক্তি। কিন্তু রাগানুগার মূলে শাস্ত্রবিধির শাসন নয়, প্রাণের আকর্ষণ, ভজনের আকাঙ্ক্ষা। এইখানেই রাগানুগার সহিত বৈধী ভক্তির আসল পার্থক্য। এই দুই প্রকার ভজনের আর একটি পার্থক্য—বৈধীমার্গের ভক্তের প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার জ্ঞানযুক্ত আর রাগানুগা মার্গের ভক্তের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অনুভবমণ্ডিত।

রাগানুগা ভক্তির বিশেষত্ব, ইহা আনুগত্যমূলক—অনুকরণাত্মক নহে। রাগানুগার প্রকৃতিই এই, ইহা ব্রজবাসীর ভাবের অনুসরণ করে অর্থাৎ রাগাত্মিকার অনুগমন মাত্র করে, অনুকরণ করে না। ব্রজপরিকরদের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চার প্রকার রাগাত্মিকা ভাবের ভক্ত আছেন। রাগানুগা ভক্তদের মধ্যে যেভাবে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহাকে সেই ভাবের আনুগত্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজনা করিলে নন্দ-নন্দনের সেবার অধিকার পাওয়া যায় না। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট সখী-সাধনার বিশেষত্ব বর্ণনার সময় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, রাসলীলার কথা শুনিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশের জন্য লক্ষ্মীর অভিলাষ জন্মিয়াছিল; তিনি যথেষ্ট ভজনও করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজনা করায় তিনি লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই :

"গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥

তাহার দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥"[৩৪]

রাগাত্মিকা ভক্তির আনুগত্য বলিতে বুঝায়, ইহার আশ্রয় ব্রজবাসিগণ যে-সব সেবা-পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন, তাহার আয়োজনে আনুকূল্য করা, সেই সমস্ত সেবার দ্বারা নিজে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার চেষ্টা নহে। সেইরূপ চেষ্টা করিলে রাগাত্মিকার অধিকারী ব্রজপরিকরদের বিরাগভাজনই হইতে হইবে। রাগাত্মিকার সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধা নিজের সহিত সঙ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন। কোন সাধক সিদ্ধাবস্থায় সেইরূপ সম্ভোগাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে চাহিলে তাহা রাগাত্মিকার চেষ্টাই হইবে। ইহা রাগানুগার প্রকৃতি নহে, সাধকের সাধ্যও নহে। রাগানুগার প্রকৃতি, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সংঘটনে কেবলমাত্র সহায়তা করা, উভয়ের ভাবের পুষ্টিতে আনুকূল্য করা এবং আপন ইষ্টদেবতা রাধাকৃষ্ণ-যুগলের সময়োচিত পরিচর্যা। মঞ্জরী বা কিঙ্করীরূপেই এই সেবা সম্ভব। জীবের স্বরূপ বিচার করিলেই ইহার তাৎপর্য বুঝা যায়। বৈষ্ণব দার্শনিকের দৃষ্টিতে জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, তাঁহার প্রেয়সী, সখা অথবা মাতাপিতা নহে; সুতরাং আনুগত্যময়ী সেবাই তাঁহার স্বভাবধর্ম। স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা সেবার বাসনা স্বরূপশক্তির বিলাসবিশেষ। সুতরাং স্বরূপশক্তির অংশ নন্দ, যশোদা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের সহিতই তাঁহার সজাতীয় সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ জীবের সহিত তাঁহার সজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তাই দাসের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী হইতে পারে না, তাহা সর্বদাই আনুগত্যময়ী। মধুর-ভাবে কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের, বাৎসল্যভাবে নন্দ-যশোদার, সখ্যভাবে সুবল-মধুমঙ্গল প্রভৃতির আনুগত্যে কৃষ্ণদাসত্বই জীবের কর্তব্য।

ইহাই রাগানুগার প্রকৃতি। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা, সখা বা প্রেয়সী মনে করা দূষণীয়। কারণ ভগবৎ-তত্ত্বে ও তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস নিত্যসিদ্ধ পরিকর-তত্ত্বে কোন পার্থক্য নাই। তাঁহাদের সহিত ঐক্যবোধ আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐক্যজ্ঞান একই কথা। এইজন্যই ইহা দূষণীয়।

রাগাত্মিকার দুইটি অঙ্গ সম্বন্ধরূপা ও কামরূপার ন্যায় রাগানুগারও দুইটি অঙ্গ আছে। সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগাকে বলে সম্বন্ধানুগা আর কামরূপা রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগাকে বলে কামানুগা। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাবের অনুগত রাগানুগা সম্বন্ধানুগা এবং ব্রজগোপীদের মধুরভাবের অনুগত রাগানুগা কামানুগা। কামানুগা ভক্তি আবার দুই প্রকার— সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। নিজের সুখের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন যে-ভক্তির উদ্দেশ্য, তাহাকে সম্ভোগেচ্ছাময়ী আর যে-ভক্তির উদ্দেশ্য নিজ নিজ যূথেশ্বরীর ভাবমাধুর্য কামনা তাহাকে তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী বলে।[৫] ইহাদের মধ্যে সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগায় শ্রীকৃষ্ণের সেবার অধিকার পাওয়া যায় না। কারণ ইহাতে নিজে সুখী হইবার ইচ্ছাই একান্ত অভীষ্ট। পরিকরগণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় পরিকরদের সুখ। স্বসুখ-বাসনা কাহারও নাই। ব্রজপরিকরদের মধ্যে ইহা নাই বলিয়া সম্ভোগেচ্ছু সাধক বা সাধিকা কোন ব্রজপরিকরের আনুগত্য লাভ করিতে পারে না, সুতরাং তাহার পক্ষে ব্রজরস-আস্বাদনও সম্ভব নয়। দ্বারকায় মহিষীদের মধ্যে কোন কোন সময় এইরূপ সম্ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়। সুতরাং সম্ভোগেচ্ছু সাধক বা সাধিকার পক্ষে মহিষীদের আনুগত্যলাভ সম্ভব হইতে পারে। এই কথাই শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন।[৬] কিন্তু তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগা ভক্তিতে সাধক বা সাধিকার চিত্তে

সম্ভোগেচ্ছা থাকে না। লীলায় প্রবেশ করার পরেও শ্রীকৃষ্ণ যদি কোন সময় রাধা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কিংবা অন্য কোন কারণে সেই ভক্তের সহিত রমণে অভিলাষী হন, তখনও তিনি ভোগ-বিমুখই থাকেন। আপনা হইতে তাঁহার সম্ভোগেচ্ছা তো হয়ই না, শ্রীকৃষ্ণের কামনায়ও তাহা জাগে না। তাই তত্তদ্‌ভাবেচ্ছাময়ীই বিশুদ্ধ কামানুগা ভক্তি।

রাগানুগার সাধনপ্রণালী

রাগানুগা ভক্তির সাধনপ্রণালী দুইরূপ—একটি বাহ্য, অপরটি আন্তর। বাহ্য দেহের দ্বারা যে ভজন, তাহা বাহ্য সাধন আর মনে মনে নিজের সিদ্ধদেহ[৭] চিন্তা করিয়া সেই অন্তশ্চিন্তিত দেহে স্বীয় ভাবের অনুকূল পরিকরগণের আনুগত্যে সর্বদা কৃষ্ণ-সেবার চিন্তা আন্তর সাধন। রাগানুগা মার্গের ভক্তিতে এই মানসিক বা আন্তর সাধনই ভজনের প্রধান্ অঙ্গ। শ্রীরূপ গোস্বামী রাগানুগা সাধনের অঙ্গ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন, ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যে সাধকরূপে এবং সিদ্ধরূপে দুইভাবে ভজনা করিতে হইবে। বৈধী ভক্তির প্রসঙ্গে শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি যে সকল অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, মনীষিগণ রাগানুগা ভক্তির ক্ষেত্রেও সেই সকল অঙ্গের উপযোগিতা স্বীকার করেন।[৮]

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে, রাগানুগা ভক্তিতে সাধকের মনে সেবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ার কালে যখন বৈধী ভক্তির ন্যায় শাস্ত্রশাসন বা যুক্তির অপেক্ষা থাকে না, তখন বৈধী ভক্তির শ্রবণ-কীর্তনাদি বিবিধ অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, সাংসারিক জীবনে যেমন কোন বস্তুর প্রতি প্রবৃত্তির বশে লোভ জন্মিলে উহা লাভের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে হয়, সেই সকল পন্থা অনুসরণে

যেমন লোভনীয় বস্তুটিকে পাওয়া সম্ভব হয়, সেইরূপ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে নিজেকে সেই সেবার উপযোগী করিবার উপায় শাস্ত্র অথবা উপযুক্ত ভক্তের নিকট হইতে জানিয়া তাহা অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবদ্ধ জীবের এই বিষয়ে নিজের কোন অভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই শাস্ত্রের নির্দেশ ও গুরুর উপদেশ পালন একান্ত কর্তব্য। এই কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন, শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত সাধনপন্থা অবলম্বন করিলে রাগানুগা মার্গের ভজন একটা উৎপাতবিশেষে পরিণত হইবে।[১] দ্বিতীয়তঃ, মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত সর্বদাই বিষয় চিন্তায় বিক্ষিপ্ত। এই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করিবার একটি প্রধান উপায় শ্রবণ-কীর্তনাদি বাহ্য সাধন। তৃতীয়তঃ, বৈধী ভক্তির অঙ্গ শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান ভিন্ন ব্রজবাসিগণের আনুগত্য সিদ্ধ হয় না। এই সকল কারণেই মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান-কালে বৈধী সাধনের অঙ্গ শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি রাগানুগা সাধনেও অনুষ্ঠানের যোগ্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

> "এইত সাধন-ভক্তি দুইত প্রকার।
> এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥"

তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রাকৃত দেহের সাধনেও সর্বপ্রকারে মনের যোগ রাখিতে হইবে। কারণ, 'বাহ্য, অভ্যন্তর, ইহার দুইত সাধন' (চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২২)। মনের যোগ না রাখিয়া কেবল বাহিরে যান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করিলে ঠিক রাগানুগা মার্গের ভজন হইবে না। এইজন্যই চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন, অন্যাসঙ্গভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিশূন্য বা অমনোযোগী হইয়া বহু জন্ম শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-ধন লাভ করা যায় না ঃ

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেম-ধন॥" (আদি।৮)

আসল কথা, রাগানুগা মার্গের ভক্তিতে আন্তর সাধন ভজনের প্রধান অঙ্গ হইলেও বাহ্য সাধন বা জড় দেহের সাধনও উপেক্ষণীয় নহ। বাহ্য সাধনেব দ্বারা আন্তর সাধন পুষ্টিলাভ করে, আবার আন্তর সাধনের দ্বারা বাহ্য সাধনে অনুরাগ জন্মে।

সাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ

রাগানুগাব বাহ্য সাধনে চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তিব অনুষ্ঠান বিধেয়। চৈতন্যচবিতামৃতের মধ্যলীলার ২২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুব পূর্ববিভাগের দ্বিতীয় লহরীতে ইহাব বিবরণ আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে এই চৌষট্টি প্রকার ভজনাঙ্গকে সাধন-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ কবা হইযাছে—বৈধী বা রাগানুগা ভক্তিব অঙ্গ বলা হয নাই। ইহাতে বুঝা যায এই অঙ্গগুলি বৈধী ও রাগানুগা উভয় প্রকার সাধনভক্তিরই অঙ্গ।

এই চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তির মধ্যে গুরুপদে আশ্রয়, দীক্ষা গ্রহণ, গুরুসেবা, ধর্ম-জিজ্ঞাসা, সৎপথের অনুসরণ, কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস,[১০] যাবৎ নিবাহ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ প্রযোজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করা, একাদশীর উপবাস এবং আমলকী, অশ্বত্থবৃক্ষ, গোব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পূজা—এই দশটি অঙ্গ সাধনভক্তিব আরম্ভ স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি প্রধান। সেবাপরাধ, নামাপরাধ প্রভৃতি পরবর্তী দশটি[১১] অঙ্গ বর্জনাত্মক। ভজনকারীকে এই দশটি অঙ্গ অবশ্যই পরিহার কবিয়া চলিতে হইবে। গ্রহণাত্মক ও বর্জনাত্মক এই বিশটি অঙ্গ ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। গুরুপদাশ্রয় প্রভৃতি প্রথম দশটি গ্রহণ করিয়া এবং

সেবাপরাধ প্রভৃতি পরবর্তী দশটি বর্জন করিয়া সাধককে সাধনভক্তি অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়।

এই বিশটি অঙ্গের পরবর্তী চুয়াল্লিশটি ভজনের প্রধান অঙ্গ। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট এই ভজনাঙ্গগুলির উল্লেখ করিয়া সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরামণ্ডলে বাস এবং শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবা—এই পাঁচটিকে সাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ঃ

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"[১২]

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মহাপ্রভু সাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের কথা বলিলেও ভাগবতে ভক্তির মাত্র নয় প্রকার অঙ্গেরই উল্লেখ দেখা যায়।[১৩] কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, মহাপ্রভু-কথিত দশটি গ্রহণাত্মক ও দশটি বর্জনাত্মক অঙ্গ বাদ দিলে বাকি চুয়াল্লিশটি অঙ্গ প্রকৃতপক্ষে নয়টি অঙ্গেরই শাখা-প্রশাখাতুল্য। কারণ চুয়াল্লিশটি অঙ্গের মধ্যে এই নয়টির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বাকি অঙ্গগুলির কোন না কোনটি নববিধা ভক্তির কোন একটির অঙ্গ। এই চৌষট্টি-অঙ্গসমন্বিত ভক্তি প্রকৃতপক্ষে নববিধা ভক্তিরই বিবৃতি; এই নববিধা ভক্তিতেই চৌষট্টি অঙ্গের পর্যবসান। এই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে কেবল পাঁচটি সাধনাঙ্গের প্রতি মহাপ্রভু কেন এত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

সাধুসঙ্গ

মহাপ্রভু-নির্দেশিত পঞ্চপ্রধান সাধনাঙ্গের প্রথমটি সাধুসঙ্গ।

সাধনার প্রভাবে, ভগবৎ-কৃপায়, সর্ববিধ মলিনতার অবসানে যাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ব আবির্ভূত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়, তাঁহারাই সাধু বা মহৎ। এই সাধু বা মহৎ ব্যক্তিগণের লক্ষণ-বর্ণনায় ভাগবতকার বলিয়াছেন, ইহারা সকলের সুহৃদ, প্রশান্ত, অক্রোধ, সর্বপ্রাণীতে সমচিত্ত; ভগবৎ-প্রীতিকেই ইহারা পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন; তাহা ছাড়া আর সব কিছু ইহাদের নিকট একেবারেই তুচ্ছ।[১৪] ইহাদের সম্বন্ধেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়, তাঁহারা আমাকে ভিন্ন কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন কিছু জানি না'।[১৫] এহেন সাধু ব্যক্তির সান্নিধ্যে মনের মলিনতা ও বেদনা দূরীভূত হয়; হৃদয় ও শ্রবণসুখকর ভগবৎ-কথার আলোচনায় অবিদ্যার অবসানে ক্রমশঃ ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রেমভক্তি জন্মিয়া থাকে।[১৬] এই সাধুসঙ্গের ফলেই বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, গজেন্দ্র, জটায়ু, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ, যজ্ঞপত্নীবৃন্দ ও অন্য সকলের ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছিল। ইহারা কেহই বেদ অধ্যয়ন অথবা তপস্যা করেন নাই, কেবল সাধুসঙ্গের গুণেই ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—যোগ, সাংখ্য, অহিংসা, বেদপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ, মঙ্গলকর্ম, দান, ব্রত, যজ্ঞ, তীর্থ, নিয়ম, সংযম আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না, যেমন পারে সর্বপ্রকার আসক্তিনিবারক সৎসঙ্গ।[১৭]

সাধুসঙ্গ সাধকের পক্ষে অপরিহার্য ভজনাঙ্গ হইলেও যে-কোন সম্প্রদায়ের সাধুসঙ্গ লাভ করিলে চলিবে না। নিজে যে ভাবের সাধক, ঠিক সেই ভাবের উপাসকের সঙ্গ লাভ করিতে হইবে। এই কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—সজাতীয় ভাবাশ্রয়ী বৈষ্ণবদের সঙ্গ করিতে হইবে। যাঁহারা একই ভাবের উপাসক

অর্থাৎ যাঁহারা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের যে-কোন একটিতে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করেন, তাঁহাদেরই সজাতীয় ভাবাশ্রয়ী বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। বাৎসল্য ভাবের সাধক যদি মধুর ভাবের সাধকের সঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাবপুষ্টির সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই শ্রীরূপ সাধুসঙ্গের ব্যাপারে সজাতীয় ভাবের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

নামসংকীর্তন

মহাপ্রভু-নির্দেশিত পাঁচটি মুখ্য ভজনাঙ্গের মধ্যে নামসংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই নামসংকীর্তনের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয় :

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥"

ইহার তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তন হৃদয়-দর্পণের মলিনতা মুক্ত করে ও সংসাররূপ দাবানল নির্বাপিত করে; চন্দ্রের উদয়ে যেমন কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, তেমনই সংকীর্তনরূপ ভক্তির উদয়ে সর্বপ্রকার মঙ্গলের আবির্ভাব ঘটে; শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তনেই জীবনে বিদ্যালাভ সফল ও সার্থক হয়; শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তন শ্রবণে সুখসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে এবং পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করিয়া আত্মা সর্বপ্রকারে অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করে।

ভগবানের অসংখ্য নাম। সকল নামেরই সমান শক্তি। যাঁহার যে-নামে অভিরুচি, তিনি সেই নামই করিতে পারেন। এই নাম-সংকীর্তনে স্থান-কালের কোন বিধি-নিষেধ নাই, তবে তরু হইতেও সহিষ্ণু এবং নিরভিমান হইয়া অপরকে

সম্মান করিয়া সর্বদা নামকীর্তন করিতে হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর নির্দেশ।[১৮]

চৈতন্য মহাপ্রভু নামসংকীর্তনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, সেইরূপ গুরুত্ব পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধনায় আরোপিত না হইলেও ভগবানের নামকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে বার বার ঘোষিত হইয়াছে। ভাগবতকার বলিয়াছেন, ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে যেমন একই সঙ্গে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমনই নামসংকীর্তনের ফলে ভক্তি, পরমেশ্বরের উপলব্ধি এবং সংসারে বিরক্তি একই কালে সম্পন্ন হয়।[১৯] এই ভাগবতেই শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন, সর্বদোষের আকর কলিকালের একটি মহৎ গুণ আছে। এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনের দ্বারা জীব বন্ধন মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে। সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে সেবায় এবং কলিযুগে কেবল শ্রীহরির নামসংকীর্তনে মুক্তি লাভ ঘটে।[২০] ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ, বরাহপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ প্রভৃতিতেও নামকীর্তনের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।[২১]

নামসংকীর্তনের উপর এত গুরুত্ব আরোপের কারণ, বৈষ্ণব-দৃষ্টিতে কৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ঃ

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥"[২২]

নাম সমস্ত পুরুষার্থের কারণ বলিয়া চিন্তামণি ও চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। নামেব মহিমা সম্পূর্ণরূপে অবগত না হইয়াও যাঁহারা তাহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন, তাঁহারা নামের কৃপায় সচ্চিদানন্দময় প্রেম-ভক্তি লাভ করেন। নামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, নামী অপেক্ষা নামকেই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া গণ্য করেন।[২৩] তিনি বলেন, বাচ্য বিভু পরমেশ্বর হইতে বাচক

কৃষ্ণাদি নামকেই আমরা পরম করুণ বলিয়া মনে করি। কারণ, বাচ্য পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী জীব যদি মুখে বাচক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বপ্রকার অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-প্রেমের আনন্দে নিমগ্ন হন। ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী মহাপ্রভুকে 'স্বভজন-বিভজনাবতার' বলিয়া যে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই নামসংকীর্তনেরই গৌরব সূচনা করে।

ভাগবতশ্রবণ

সাধুসঙ্গ ও সংকীর্তনের ন্যায় ভাগবতশ্রবণও সাধনভক্তির আর একটি প্রধান অঙ্গ। ভাগবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ ভক্তিশাস্ত্র। ভগবানের এই সকল লীলা শ্রবণ ও পাঠে ভক্তের মন কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। ভাগবতপুরাণকার এই কারণেই বলিয়াছেন, চোখে কাজল লাগাইলে যেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ যে আমার পুণ্য গাথা শ্রবণ ও কীর্তন করে, তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয়; সে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়।[২৪] তবে মহাপ্রভু ভাগবতশ্রবণের যে-নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণীয় নহে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; ভাগবতপাঠ ও শ্রবণ যে-কোন বৈষ্ণবেরই অবশ্য কর্তব্য। ভাগবতে বর্ণিত লীলা অবলম্বনে কাব্য রচনা ও সেই কাব্য পাঠও ভাগবতশ্রবণের মতই ফলদায়ক; কারণ, সেই সকল কাব্য রচনা এবং পাঠেও ভক্তের মন সমভাবে কৃষ্ণ-ভাবনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। এই ধরণের লীলাত্মক কাব্যরচনা মহাপ্রভুর উৎসাহ ও প্রেরণায় সাধনার অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করায় বাংলার ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করেন। দিনরাত্রির এক মুহূর্তও যাহাতে বিফলে না যায়, অষ্টপ্রহর যাহাতে কৃষ্ণচিন্তায় মন পূর্ণ থাকে, সেইজন্য তাঁহারা

অষ্টকালীন লীলাত্মক কাব্য রচনা করেন। ইষ্টস্মরণের এই পদ্ধতি অন্য কোন সম্প্রদায়ে আছে কি না সন্দেহ। সাধককবি যে-ভাবের লীলায় কৃষ্ণসেবা করিতে ইচ্ছুক, নিজের রুচি অনুসারে সেই ভাবেরই অষ্টকালীন লীলাকাব্য রচনা করেন। রাগানুগা ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার স্মরণই বৈষ্ণব সাধকগণের প্রধান সাধন। শ্রীরূপ গোস্বামী কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকর্ণপূরের শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতে এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে এই অষ্টকালীন লীলার বিস্তার দেখা যায়। নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ এবং নৈশ লীলায় ইহার বিস্তার। বিচিত্র অবস্থানের মধ্য দিয়া শ্রীরাধাকেই এই কৃষ্ণলীলার প্রধান অবলম্বনরূপে দেখা যায়; ব্রজপরিকরগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই লীলারস পরিপুষ্ট করেন।

ভাগবতশ্রবণের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলাকাব্য লইয়া এই আলোচনার কারণ, বৈষ্ণব সাধক-কবিদের নিকট কাব্যরচনা সাধনারই অঙ্গস্বরূপ। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আলংকারিক কবিকর্ণপূর কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি তাঁহার অলংকারকৌস্তুভে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

> "যশঃ প্রভৃত্যেব ফলং নাস্য কেবলমিষ্যতে।
> নির্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণগুণলাবণ্যকেলিষু॥
> চিত্তস্যাভিনিবেশেন সান্দ্রানন্দলয়স্তু যঃ।
> স এব পরমো লাভঃ স্বাদকানাস্তথৈব সঃ॥"

অর্থাৎ খ্যাতিলাভই কৃষ্ণবিষয়ক কাব্যরচনার একমাত্র কাম্য ফল নহে। কাব্য-রচনাকালে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ-লীলাতে চিত্তের যে একাগ্রতা, তাহাই কাব্যরচয়িতাদের পরম লাভ। কেবল কাব্য-

রচয়িতা কেন, যাঁহারা এই কাব্য আস্বাদন করেন, তাঁহাদেরও পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

মথুরাবাস

সাধনার পাঁচটি প্রধান অঙ্গের আর একটি মথুরাবাস। মথুরা বলিতে ব্যাপক অর্থে সমগ্র ব্রজমণ্ডলই বুঝায়। এই ব্রজমণ্ডলের নদীপর্বত, বৃক্ষলতা, প্রতিটি ধূলিকণা শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর লীলার স্মৃতিবিজড়িত। ব্রজমণ্ডলে অবস্থানের ফলে ভক্তের মন সর্বক্ষণ অনিবার্যভাবেই কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মথুরামণ্ডলে বাসের তাৎপর্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ত্রিভুবনে যত তীর্থ আছে মথুরা তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ সমুদয় তীর্থসেবনেও যে প্রেমভক্তি সুদুর্লভ, মথুরার স্পর্শমাত্রেই তাহা পাওয়া যায়। এই কারণেই তাঁহার অভিমত—মথুরামাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, মথুরাধামের স্মৃতি, মথুরাবাসের বাসনা, মথুরাদর্শন, মথুরায় গমন, মথুরাধামে আশ্রয়গ্রহণ, মথুরাধামের স্পর্শ এবং মথুরার সেবা করিলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।[২৫] অতএব কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরূপের নির্দেশ—'কুর্যাৎ বাসঃ ব্রজে সদা'। অর্থাৎ সর্বদা ব্রজে বাস করিতে হইবে। প্রাকৃত দেহে সম্ভব না হইলে অন্ততঃ কল্পনায় করিতে হইবে।

শ্রীমূর্তির সেবা

সাধনার সর্বশেষ অঙ্গ শ্রীমূর্তির সেবা। কৃষ্ণমূর্তিকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া প্রীতি ও ভক্তির সহিত সেবা করিতে হইবে। শ্রীমূর্তির এইরূপ সেবায় কি ফল লাভ হয়, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আদিপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,

যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণসেবায় প্রীতি অনুভব করেন, ভগবান তাঁহাকে মুক্তির পরিবর্তে ভক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন :

"মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন॥"[২৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি প্রকৃতপক্ষে নয় প্রকার ভক্তিরই শাখা-প্রশাখাবিশেষ। সনাতন-শিক্ষায় মহাপ্রভু বলিয়াছেন, সাধক নিজের রুচি অনুযায়ী শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নয় প্রকার সাধনভক্তির যে কোন এক বা একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং তাহাতেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। মহারাজ পরীক্ষিৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব কীর্তন, প্রহ্লাদ স্মরণ, লক্ষ্মী চরণসেবা, রাজা পৃথু পূজা, অক্রূর বন্দনা, হনুমান দাস্য, অর্জুন সখ্য এবং বলিরাজ আত্মনিবেদনের দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন।[২৭] আর মহারাজ অম্বরীষ ভক্তিসাধনার নয় প্রকার অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, চরণসেবা প্রভৃতি একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠানের দ্বারা ঈশ্বরের ভজনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।[২৮]

রাগানুগার দ্বিবিধ সাধন

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। রাগানুগার বাহ্য-সাধনে শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি ভক্তিসাধনার অঙ্গের উপযোগিতা স্বীকৃত হইলেও বৈধী ভক্তির অঙ্গসমূহের মধ্যে যেগুলি রাগানুগার অনুকূল, কেবল সেইগুলিই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায় সাধনভক্তির ভজনাঙ্গগুলিকে স্বাভীষ্ট-ভাবময়, স্বাভীষ্টভাবসম্বন্ধী, স্বাভীষ্টভাবের অনুকূল, অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাগানুগা ভজনের

অনুকূল ও প্রতিকূল অঙ্গগুলি নির্দেশ করিয়াছেন। দাস্য-সখ্যাদি এবং ব্রজে বাস প্রভৃতি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্টভাবময়; গুরুচরণে আশ্রয়, গুরুসেবা, জপ, ধ্যান, শ্রবণ-কীর্তনাদি নয় প্রকার ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্টভাবসম্বন্ধী; তুলসী, কাষ্ঠমালা, তিলক, চরণচিহ্নধারণ প্রভৃতি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্টভাবের অনুকূল; গো, অশ্বত্থ, ধাত্রী, ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্টভাবের অবিরুদ্ধ। এই সমস্ত অঙ্গ ভাবের উপযোগী বলিয়া রাগানুগা মার্গের সাধকের গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শাস্ত্রে বিধান থাকিলেও, অহংগ্রহোপাসনা,[২৯] ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান, মহিষীধ্যান প্রভৃতি স্বাভীষ্টভাবের বিরুদ্ধ; সুতরাং রাগানুগা মার্গের সাধকের পরিত্যাজ্য।

রাগানুগার বাহ্য সাধন আলোচনার পর আন্তর সাধনের বিষয় উল্লেখযোগ্য। আন্তর সাধন একান্তভাবেই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাধন। শ্রবণ-কীর্তনাদি বাহ্য সাধন অনুষ্ঠিত হয় বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়তায় কিন্তু আন্তর সাধন অনুষ্ঠিত হয় কেবল মনের দ্বারা অর্থাৎ আন্তর সাধনে সাধক নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহেই ব্রজে স্বীয় ভাবের অনুকূল লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, সর্বদা এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। এই আন্তর সাধনের প্রণালী কি অর্থাৎ সিদ্ধদেহে কিরূপে সেবা করিতে হয়, মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় তাহার নির্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥"[৩০]

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামীও অনুরূপ নির্দেশই দিয়াছেন:

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥"

অর্থাৎ রাগানুগা মার্গের সাধক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়তম পরিকরবর্গের মধ্যে যিনি সেই সাধকের প্রিয়, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া স্বীয় ভাবের অনুকূল লীলাকথায় অনুরক্ত হইয়া সম্ভব হইলে প্রাকৃত দেহে, অন্যথায় অন্তশ্চিন্তিত দেহে সর্বদা ব্রজে বাস করিবেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও রাগানুগা মার্গে আন্তর সাধনের অনুরূপ দিগ্‌দর্শন লক্ষিত হয়।[৩১]

পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রাকৃত ও অন্তশ্চিন্তিত দেহে ভজনা করিতে করিতে রাগানুগা মার্গের সাধকের অন্তরে কৃষ্ণপ্রীতি জন্মে। এই প্রীতির অঙ্কুরাবস্থাকে বলে ভাব বা রতি আর গাঢ় অবস্থাকে বলে প্রেম। এই প্রেমেই সাধকের অভীষ্টলাভ একপ্রকার সুনিশ্চিত। ইহাই তাঁহার একমাত্র কাম্য বস্তু: কারণ, স্বরূপে জীবের যে কৃষ্ণসেবা কর্তব্য, তাহা প্রেম ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না।

সাধকচিত্তে এই ভাবের উদয় কিরূপে হয় এবং কি প্রকারেই বা এই ভাব প্রেমে পরিণতি লাভ করে, তাহাও মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদানপ্রসঙ্গে (চৈ. চ. মধ্য। ২৩) বলিয়াছেন:

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থনিবর্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দধাম॥[৩২]

অর্থাৎ প্রথমে সাধকচিত্তে ভগবৎ-কথা বা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা জন্মে। ইহা আপনা হইতে জন্মে না, সৎসঙ্গ বা ভগবৎ-কৃপা হইতেই জন্মিয়া থাকে। শ্রদ্ধা জন্মিলে সাধক পুনরায় সাধুসঙ্গ করেন। সাধুদের নিকট হইতে ভগবৎ-লীলাকথাদি শ্রবণ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সময় সময় কীর্তনও করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া সাধকের ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে এবং তিনি তাহা করিয়াও থাকেন। এইরূপে একনিষ্ঠভাবে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত হইতে অসৎ প্রবৃত্তি অর্থাৎ অনর্থ[৩৩] দূরীভূত হয়। কুপ্রবৃত্তি দূর হইলে ভক্তি-অঙ্গে নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠার সহিত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রবণ-কীর্তনাদিতে রুচি জন্মে, এইরূপে রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে অর্থাৎ রুচি গাঢ় হয়; তখন সাধক শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতিতে এমনই আনন্দ লাভ করেন যে, তাহা আর ছাড়িতে পারেন না। এই আসক্তি গাঢ় হইলে শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে এবং রতি গাঢ় হইলেই প্রেমে পরিণত হয়। এই প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবের স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণতম বিকাশের অবস্থা মহাভাবে পরিণত হয়:

"প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥"[৩৪]

রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত প্রেমের এই সমস্ত স্তর ব্রজের সকল ভাবের পরিকরের মধ্যে থাকে না। তাই মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছেন:

"শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্যন্ত ক্রমে ত বাড়য়।
সখ্য-বাৎসল্য-(রতি) পায় অনুরাগ-সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্যন্ত প্রেমের মহিমা॥"[৩৫]

ব্রজে শান্ত ভব নাই; দাস্যরতি রাগের শেষ সীমা পর্যন্ত, সখ্যরতি অনুরাগ পর্যন্ত, বাৎসল্যরতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত এবং কান্তারতি মহাভাব পর্যন্ত বর্ধিত হয়। ব্রজের রাগানুগা মার্গের সাধক নিজের অভীষ্ট সেবার উপযোগী প্রেমের স্তরে উপনীত হইতে পারিলেই পার্ষদরূপে লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন।

এই সুদুর্লভ সৌভাগ্যলাভই সাধক-জীবনের চরম সার্থকতা। তাই এই অভিনব ধর্মসাধনার প্রবর্তক চৈতন্য মহাপ্রভুর আকুল প্রার্থনা:

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥"[৩৬]

চৈতন্যচরিতামৃতে ইহারই ভাবানুবাদ:

"তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥"[৩৭]

(দুই)

চৈতন্য জীবনে বাস্তব রূপায়ণ

ভক্তির পথে ভগবৎ-সাধনার ইতিহাসে চৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবদানের তত্ত্বগত আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ের পূর্বার্ধে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা

গিয়াছে, মোক্ষবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ভারতে তিনি যে অপূর্ব বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা হইতেছে—ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ নহে, ভক্তিই চরম কাম্য, পরম পুরুষার্থ। এই ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন নয়; ইহা কামনাশূন্য; ইহার পরিপূর্ণতম প্রকাশ ভাগবতে ব্রজগোপীদের সাধনায়। তাঁহারা নিজেদের সুখের কথা মুহূর্তের জন্যও চিন্তা না করিয়া প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার আকাঙ্ক্ষায় সমাজসংসারের দুর্জয় শৃঙ্খল, ভ্রূকুটি-কুটিল শাসন উপেক্ষা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইয়া তাঁহাকে সুখী দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছায় নিজেদের সুখ সম্পূর্ণ বিসর্জনের এই অসীম উদারতা যাঁহাদের চরিত্রে, যাঁহাদের সাধনায়, তাঁহারাই প্রেমভক্তির একমাত্র আদর্শ। তাই মহাপ্রভু ব্রজগোপীদের আনুগত্যে গোপীভাবে সাধনাকেই সকল সাধনার সার, জীবের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু কেবল এই অপূর্ব শিক্ষাদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই সিদ্ধান্তের দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই, আপনার জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই সাধনার চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করিয়া আচরণের দ্বারা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী। তাই তাঁহার মুখে আমরা শুনিতে পাই:

"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥" (চৈঃ চঃ আদি।৩)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপন জীবনাচরণের দ্বারাই শরণাগত ভক্তগণকে ও অনাগত মানবসমাজকে এই অপূর্ব সাধনার সত্য অনুভব করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁহার সমগ্র জীবনই রাধাপ্রেমের ভাব-ব্যাখ্যা। চৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায়:

"রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর ॥" (চৈঃ চঃ আদি।৪)

এই অতিশয় গোপনীয় লীলার কথা মহাপ্রভুর সন্ন্যাসজীবনের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর তাঁহার অতি প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন, রঘুনাথ নিজের রচনায় তাহার সামান্য পরিচয় দিয়াছেন। রঘুনাথের কৃপায় চৈতন্যচরিতামৃতকার সেই সকল লীলা অবগত হইয়া তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় তাহাদের কোন কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর সেই বিবরণ অবলম্বনে চৈতন্যদেবের গোপীভাব তথা রাধাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

চব্বিশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আরও চব্বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের পরিচয় চৈতন্যচরিতামৃতকার সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই চব্বিশ বৎসরের সন্ন্যাস-জীবনে শেষ দ্বাদশ বৎসর গম্ভীরায় তিনি যে লীলা করেন, তাহাতে তাঁহার প্রধান সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ। 'স্বরূপ গোস্বামী ব্রজরসের অদ্বিতীয় মর্মজ্ঞ সাধক, প্রভুর পরম প্রিয় পার্ষদ—তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ। আবার কৃষ্ণলীলা-তত্ত্বের বিচারে রায় রামানন্দের সমকক্ষ কেহ নাই। বিরহ-সন্তপ্ত মহাপ্রভু উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদেন, অন্তরের কথা বলিতে গিয়া আকুল হন। গম্ভীরা-গৃহে এই দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদের সহিত দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি মহাপ্রভু অতি গূঢ় ব্রজরসের বিস্তার করেন।'

চৈতন্যদেবের নিদ্রা বড়ই কম; ভজনে, কীর্তনে ও ধ্যানধারণায় রাত্রির অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়। স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় অনুযোগ করেন

এবং নিয়মিতভাবে আহারনিদ্রার জন্য বারংবার অনুরোধ জানান। প্রেমিক সন্ন্যাসী স্বরূপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রেমমধুর স্বরে বলেন—প্রিয় বান্ধব, আমি কি করিব, আমি নিরুপায়। আমার মন আমাতে নাই। শূন্য মোর শরীর আলয়। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, মলিনতা, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা, মোহ, মৃত্যু (স্পন্দনহীনতা) এই দশ দশা[৩৮] প্রেমের গভীরতায় ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়। এই দশ দশার দুই চারটির বিকাশই দুর্লভ। চৈতন্যদেবের দেহে এই সময় উক্ত দশ দশার প্রকাশ সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়:

'এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নাহি মনে।"

প্রভু কখনও ভগবানের বিরহে কাতর হন, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, দৈন্য-বিষাদে দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়ে, করুণ আর্তনাদ ও হা-হুতাশে অন্তরঙ্গগণেরও হৃদয় বিগলিত হয়। কখনও "হা! হা! কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহাঁ যাঙ কাহাঁ পাঙ মুরলী-বদন।।" (চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য।১২) বলিয়া স্বরূপ গোস্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করেন। 'মহাপ্রেমে প্রভু ঘন ঘন উদ্বেলিত হইয়া উঠেন। আয়ত নয়নযুগল হইতে অনরবত অশ্রুপাত হইতে থাকে। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করেন, কীর্তনসঙ্গীরা তাঁহার চোখের জলে সিক্ত হইয়া উঠেন। পুলকের তীব্রতায় দেহের রোম উদ্গত হয়। রোমকূপে অজস্র ব্রণ, আর তাহা হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, প্রভুর সুগৌর দেহবর্ণ একেবারে শঙ্খের ন্যায় সাদা, কখনও বা রক্তজবার ন্যায় লাল। কম্পনের তীব্রতাই বা কি অদ্ভুত। সুগঠিত দীর্ঘায়ত দেহ বেত্রলতার ন্যায় কাঁপিতে থাকে। তীব্র ভাবাবেশে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কোন সময় হয়ত তাঁহার

গ্রন্থিসমূহ শিথিল এবং দেহ দীর্ঘতর হয়। আবার কখনও সুন্দর সুঠাম দেহ সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মাকৃতি ধারণ করে।' এই সকল অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সময় সময় দেহে প্রাণ আছে কিনা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা অমঙ্গল আশঙ্কায় আকুল হন। স্বরূপ দামোদর এই সকল অবস্থার স্বরূপ বুঝিতে পারেন। তাঁহার নির্দেশে তখন ভাবের অনুরূপ নাম শুনাইতে শুনাইতে প্রভুর দেহে চেতনার সঞ্চার হয়, বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। এমনই ভাবে গম্ভীরায় দিনের পর দিন লীলা চলে। কখনও বিরহবেদনায় অধীর, কখনও মিলনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত, কখনও বা মধুর রসসম্ভোগে আত্মহারা। বিরহের দহন যত বাড়ে, মিলনের আনন্দ ততই হয় উচ্ছ্বসিত। এমনি করিয়াই চলে মহাভাবের সমুদ্রমন্থন।

দিব্যোন্মাদ

'মহাপ্রভুকে লইয়া অন্তরঙ্গ পার্ষদদের হইয়াছে মহা সমস্যা। প্রায় সব সময়ই তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা। স্বরূপ দামোদর আর রায় রামানন্দ প্রভুর বিলাপে সান্ত্বনা দেন—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আর গীতগোবিন্দের শ্লোক ও সঙ্গীত শ্রবণ করান। মহাপ্রভু তখন ভাবাবেশে থাকেন নীরব. নিশ্চল। তারপরই আবার আরম্ভ হয় প্রেমার্তি আর মর্মভেদী বিরহ-বিলাপ' :

"কাঁহা গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন।
তাঁহার সৌন্দর্য মোর হরিল নেত্র-মন ॥" (চৈ. চ.—অন্ত্য।১৫)

'প্রতিদিন গভীর রাত্রে প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়া, গম্ভীরা গৃহে শয়ন করাইয়া তবে হয় স্বরূপ গোস্বামী আর রায় রামানন্দের ছুটি।'

'একদিন রাত্রে চৈতন্যদেব শয্যায় বসিয়া আছেন—বাহির হইতে তাঁহার উচ্চকণ্ঠে নামকীর্তন শুনা যাইতেছে, হঠাৎ একসময়

তিনি একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। স্বরূপ গোস্বামী ও প্রভুর সেবক গোবিন্দ কুটিরের বহির্দ্বারেই শয়ন করেন, তাঁহাকে পাহারা দেন। উভয়ের সন্দেহের উদয় হইল। প্রভু হঠাৎ এমন চুপ করিয়া গেলেন কেন? চৈতন্যদেব ভাবাবেশে হঠাৎ যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারেন, সেইজন্য ভিতর হইতে পর পর তিনটি কপাট রাত্রে বন্ধ থাকে। কিন্তু প্রভু তো শয্যায় নাই, চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। আলো লইয়া সকলে চারিদিকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। প্রভুকে পাওয়া গেল মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকটে। সবিস্ময়ে ভক্তগণ দেখিলেন, এক অদ্ভুত প্রেমবিকারে তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। সমস্ত অস্থি-গ্রন্থি শিথিল। চক্ষুতারকা উর্ধ্বদিকে স্থির। এ অবস্থা দেখিয়া সঙ্গীরা কাঁদিয়া আকুল। স্বরূপ দামোদর প্রভুকে কৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ভক্তগণের বক্ষ হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। সিংহদ্বারের নিকট নিজেকে দেখিয়া তিনি নিজেও বিস্মিত হইলেন—আমি এখানে কেন, তোমরাই বা এখানে কি করিতেছ? স্বরূপ দামোদরের নিকট নিজের অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন- হঠাৎ যেন দেখিলাম, কৃষ্ণ আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—বিদ্যুৎ-চমকের মতো মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তারপর কি হইয়াছে, কি করিয়াছি, আমার কিছুই মনে নাই।

আর একদিনের কথা। মহাপ্রভু সমুদ্র-স্নানে চলিয়াছেন। হঠাৎ চটক পর্বত[৩১] দেখিয়া গিরিগোবর্ধনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অমনি তিনি তীর-বেগে সেই দিকে ছুটিয়া চলিলেন। গোবিন্দ প্রাণপণ ছুটিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চিৎকারে অন্য ভক্তগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। প্রভুর দেহে আশ্চর্য সাত্ত্বিক বিকারসমূহের প্রকাশ।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা নাই। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে থাকিলে প্রভুর অর্ধবাহ্য অবস্থা ফিরিয়া আসিল। ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে করিতে তিনি বলিলেন, আমি তো এতক্ষণ গোবর্ধনে ছিলাম—সেখানে হইতে কে আমাকে এখানে আনিল? শ্রীকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের সুযোগ পাইয়াও মনের সাধ মিটাইয়া দেখিতে পাইলাম না।

মহাপ্রভু জগন্নাথদর্শনে গিয়াছেন। জগন্নাথ দেখিতেছেন বটে, কিন্তু শ্রীমূর্তির স্বরূপ দেখিতে পাইতেছেন না। শ্রীমূর্তির স্থানে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। সকালবেলার ভোগারতি শেষ হইলে ভক্তগণ কোন প্রকারে কিছু পরিমাণে বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া গম্ভীরায় লইয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়াও ভাবের সম্পূর্ণ উপশম হইল না। স্বরূপ ও রামানন্দের গলা ধরিয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগে শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠা অন্তরে অনুভব করিয়া সেই ভাবের শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন:

"এত কহি গৌরহরি দুজনার কণ্ঠ ধরি
কহে, শুন, স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ্ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥" (চৈঃ, চঃ-অন্ত্য।১৫)

আর একদিনের কথা, প্রভু সমুদ্রতীরে যাইতেছেন। হঠাৎ পুষ্পোদ্যান দেখিয়া অন্তরে বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগিল। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্ধান করিলে গোপীগণ ব্যাকুল হইয়া বনে বনে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। প্রভুর অন্তরে সেই ভাবের উদয় হইল। প্রভু ব্যাকুল ভাবে দ্রুতবেগে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন—ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে তরুলতা, বৃক্ষ ও

মৃগকে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া প্রভু কাতর হইলেন। অন্তরে যমুনাতটের স্ফুরণ হওয়ায় যমুনাভ্রমে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইলেন ঃ

"এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥
সৌন্দর্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥" (চৈঃ, চঃ-অন্ত্য।১৫)

ভক্তগণ দেখেন, প্রভুর দেহে স্বেদরোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের বিকার, অন্তরে অসীম আনন্দ। ভক্তগণের নামকীর্তনে প্রভুর মূর্ছা ভঙ্গ হইল। রসপুষ্টির জন্য প্রভু স্বরূপ গোস্বামীকে অনুরূপ পদ গান করিতে বলিলেন। স্বরূপ গোস্বামী গীতগোবিন্দের একটি প্রসিদ্ধ গীত[৪০] আরম্ভ করিলে প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেহে দেখা দিল নানা প্রকার সাত্ত্বিক বিকার। অনেকক্ষণ নৃত্য করিয়াও প্রভুর সাধ মিটিল না, স্বরূপ গোস্বামী গান বন্ধ করিলেন কিন্তু প্রভুর নৃত্য তবু থামে না। তিনি স্বরূপ গোস্বামীকে গাহিবার জন্য কেবলই অনুরোধ করিতে থাকেন, ভাবের আতিশয্য বুঝিয়া তিনি প্রভুর অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

আর একদিন। সেদিনও প্রভুর চক্ষে ঘুম নাই। শয্যায় বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতেছেন। তখন অর্ধরাত্রি, হঠাৎ যেন মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুল-করা বাঁশী বাজিতেছে। বাঁশীর শব্দে প্রভুর প্রাণ আকুল হইল, ভাবাবেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে যেখানে তেলেঙ্গা গাভীগুলি থাকে, চৈতন্যদেব সেখানে গিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। প্রভুর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া গোবিন্দের চমক ভাঙ্গিল—কপাট খুলিয়া দেখিলেন, প্রভু ঘরে নাই। গোবিন্দের চিৎকারে স্বরূপ গোস্বামী আসিলেন,

আসিলেন অন্য ভক্তগণও। সকলে প্রভুর সন্ধানে বাহির হইলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া দেখেন, প্রভু গোশালায় পড়িয়া আছেন। সংজ্ঞাহীন, হস্তপদ দেহে প্রবিষ্ট, আকার কূর্মের ন্যায়। মুখে ফেন, অঙ্গে পুলক, নেত্রে অশ্রু। তাঁহারা প্রভুর চৈতন্য সম্পাদনের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চৈতন্য ফিরিল না। ধরাধরি করিয়া প্রভুকে গৃহে আনিলেন, সুরু করিলেন কীর্তন, অনেকক্ষণ পরে প্রভুর চেতনা ফিরিল। অনুযোগের সুরে তিনি স্বরূপ গোস্বামীকে বলিলেন—তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া আসিলে? আমি বৃন্দাবনে গোপীগণের সঙ্গে প্রভুর লীলা দেখিতেছিলাম—সে স্বর্গীয় আনন্দের রাজ্য হইতে জোর করিয়া কেন তোমরা এখানে লইয়া আসিলে? স্বরূপ, আমার কর্ণ মুরলী-ধ্বনির তৃষ্ণায় উৎকণ্ঠিত, আমার তৃষ্ণা দূর কর; কর্ণরসায়ন শ্লোক পড়। স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর ভাব বুঝিয়া ভাগবতের শ্লোক[৪১] পড়িলেন—"হে অঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণ), ত্রিভুবনে এমন নারী কে আছে যে তোমার মধুর বেণুগীতে মোহিত হইয়া নিজধর্মে জলাঞ্জলি দেয় না।" গোপীভাবে আবিষ্ট প্রভু নিজেই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অন্তর্দশা-বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী বলেন:

"হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন।
কৃষ্ণের মুখ-হাস্য-বাণী ত্যাগে, তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন॥
নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়?" (চৈঃ, চঃ-অন্ত্য।১৭)

ভাগবতের শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে করিতে শ্রীরাধার চিত্তদীর্ণ আর্তিতে মহাপ্রভু অভিভূত হইয়া পড়িলেন:

"হা হা সখি ! কি করি উপায় ?
ক্যা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ।" (চৈঃ, চঃ-অন্ত্য ।১৭)

ভাবের আবেগে প্রভু আবার ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিলেন। স্বরূপ গোস্বামী কোনমতে ধরিয়া রাখিলেন। বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীত শুনাইয়া তখনকার মত শান্ত করিলেন।

"এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে।
উন্মাদচেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥" (চৈঃ, চঃ-অন্ত্য ।১৭)

প্রতিদিনই তাই একটা চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি। আর একটি দিনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। বিমল চন্দ্রকিরণে পুলকিত ধরণী স্বপ্নলোকের ন্যায় বোধ হইতেছে। এমনই এক রজনীতে ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপার পরাকাষ্ঠা—প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা রাসক্রীড়া ব্রজে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন রজনীতে নিদ্রা যাওয়া তো দূরের কথা. প্রভু ঘরেও স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ভাবুক সন্ন্যাসী ভক্তগণের সহিত পুরীর উপবনসমূহে ভ্রমণের জন্য বাহির হইলেন। সকলের মন অন্তর্মুখী এবং চিত্ত বৃন্দাবন-লীলার স্মৃতিতে তন্ময়। ভক্তগণ ভগবানের ধ্যানে মগ্ন. প্রভু উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ভ্রমণ করিতেছেন। 'দূর হইতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্র দেখিয়া প্রভু উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। ভাবসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সমুদ্রের নীলজল দেখিয়া যমুনা বলিয়া বোধ হইল. মনে হইল, গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি করিতেছেন। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া প্রভু সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপ দিলেন। তরঙ্গে তরঙ্গে. স্রোতের আকর্ষণে প্রভুর দেহ কোণারকের দিকে ভাসিয়া চলিল।

এদিকে প্রভুকে কোথাও না দেখিয়া ভক্তগণ পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছেন। কোন স্থানেই খুঁজিতে বাকী রহিল না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া একদল ভক্ত সমুদ্রের তীর ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রভু সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, না, তীর ধরিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, কে বলিবে! পথে তাঁহাদের এক ধীবরের সহিত দেখা— স্কন্ধে তাহার মাছ ধরার জাল। তীরে দাঁড়াইয়া লোকটি পাগলের ন্যায় হাসিতেছে, নাচিতেছে। আবার কখনও বা সে কাঁদিয়া আকুল, তাহার মুখে কিন্তু অবিরাম হরিনাম।

স্বরূপ দামোদর মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন, এ সকল প্রভুরই কাণ্ড। শ্রীচৈতন্যরূপ পরশমণির স্পর্শ এই ধীবরের দেহে লাগিয়াছে, আজ তাই সে মহাভক্তে রূপান্তরিত। সকলে আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিলেন, এ দশা তাহার কবে, কি করিয়া হইল। ধীবর উত্তর দিল, সে সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছিল; জাল ফেলিয়া তীরে বসিয়াছিল মাছের আশায় কিন্তু কোথা হইতে এক অদ্ভুত মানুষ ভাসিয়া আসিয়া তাহার জালে আটকাইল। দীর্ঘ তাঁহার দেহ, বর্ণ শঙ্খের ন্যায় শুভ্র, ঊর্ধ্ব নেত্র, কখনও তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করেন, কখনও বা অচেতন। তাঁহাকে টানিয়া তুলিতেই তাঁহার ভিতরের ভূত ধীবরকে চাপিয়া ধরিয়াছে; কিছুতেই ছাড়িতেছে না।'

অন্তর্দশা

স্বরূপ গোস্বামী ধীবরের নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ শুনিলেন; তাঁহারা তখনই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর দেহ ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, প্রভুর ঘোর অন্তর্দশা।[৪২] তিনি তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীচৈতন্যদেব যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন কিন্তু মন তখনও বাহ্য জগতে নামে নাই, তাঁহার অর্ধবাহ্য দশা। সেই অবস্থায় প্রভু প্রলাপ বচনে বলিতে লাগিলেন:

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি, জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ৷৷
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ৷৷
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ৷৷" (চৈঃ. চঃ-অন্ত্য ১৮)

এমন সময় তোমরা মহাকোলাহল করিয়া আমার সেই মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলে। সেই যমুনা, সেই বৃন্দাবন, সেই কৃষ্ণ, সেই গোপীগণ কোথায়? তোমরা কেন আমাকে এখানে লইয়া আসিলে?

একাদিক্রমে বার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে এই অন্তর্গূঢ় লীলা — অশ্রু-হাসি, স্বেদকম্প, পুলক-বেদনার মহাভাবময় জীবনের অমৃত-মন্থন। এ লীলা বড়ই মধুর, বড়ই করুণ। প্রভুর এ যেন রাই উন্মাদিনীর দশা; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্যে এই প্রেম-তন্ময়তার রসঘন চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়দেব এবং বিল্বমঙ্গলও শ্রীমতীর দশা অবলম্বনে করুণরসের যথেষ্ট বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রভু এই বিরহ-রস জীবকে বুঝাইলেন আপন মর্মজ্বালার উদ্‌ঘাটন করিয়া অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের মধ্য দিয়া। কেবল কথায় নহে, কাব্যে নহে, প্রতিদিনের জীবন-চর্যার মধ্য দিয়া ব্রজরস আর কৃষ্ণবিরহের স্বরূপ তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন। এ যেন মর্ত্যের ধূলিধূসর অঙ্গনে স্বর্গের অমৃত-বিতরণ। এমন করিয়া এ অমৃত কে কবে বিলাইয়াছে? এমন কৃপা আর কাহার? চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত, পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ (নরহরি সরকার?) প্রভুর এই কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছেন:

"গৌরাঙ্গ নহিত, কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।

রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
'জগতে জানাত কে ॥
মধুর-বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী-
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
ব্রজ-যুবতী- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥"

রসমধুর ব্রজলীলা মহাপ্রভুর মধ্যে রূপায়িত। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের অনুপম মাধুর্য, অপর দিকে শ্রীরাধার অতুলনীয় প্রেম—এই মাধুর্য, এই প্রেমের অপরূপ লীলা তাঁহার দেহে, মনে, আন্তর সত্তায়।' অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম এতদিন মানুষের মনে ছিল একটা অমূর্ত তত্ত্বভাবনারূপে। মর্মভেদী বিরহকাতরতা, ক্রন্দন ও প্রেম-বিকাশের মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যে মূর্ত, জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্যই এই মহাজীবনের আবির্ভাব; গৌড়ীয় ভক্তগণের উপলব্ধিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ। ব্রজধামে তিনি যে লীলা-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রবল বেগ ধারণ করিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিয়াছে। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা একই প্রবাহের দুইটি অংশ। শ্রীকৃষ্ণের অনুপম মাধুর্যময় লীলাসমূহের আরম্ভ ব্রজে, পূর্ণতা নবদ্বীপে। অবতারতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে, পরম করুণ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান উদ্দেশ্য রসাস্বাদন, গৌণ উদ্দেশ্য রাগমার্গের ভক্তি প্রচার। ব্রজে তিনি নানারূপ রস আস্বাদন করিলেন বটে, তথাপি তাঁহার রসাস্বাদ পূর্ণতা লাভ করিল না। কারণ ব্রজে তিনি নিজের অনুপম মাধুর্যরস আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এই মাধুর্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায় শ্রীমতী রাধার মাদনাখ্য মহাভাব। শ্রীকৃষ্ণের তাহা ছিল না। তাই তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব

গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া নিজের মাধুর্য্যরস নিজেই আস্বাদন করিলেন। নিজের মাধুর্য-আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আরও দুইটি আনুষঙ্গিক বাসনার উদয় হয়—যে-প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই প্রেমের মহিমা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে-আনন্দ অনুভব করেন, তাহাই বা কিরূপ। স্বরূপ দামোদর একটি শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন :

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

(চৈঃ, চঃ—আদি ১।৬)

ব্রজলীলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটি বাসনা অপূর্ণ থাকে; কারণ রাধাপ্রেমের আশ্রয় না লইলে এই তিনটির কোনটিই পূর্ণ হইতে পারে না। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণরূপেই এই তিন বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। তাই ব্রজলীলায় রসাস্বাদনের যে অংশ অপূর্ণ ছিল, নবদ্বীপলীলায় তাহাই পূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাঁহার সেবা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতে সংসারে দুঃখ ভোগ করিতেছে—সংসারবাসে মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিগলিত হইল। একটা শাশ্বত ও অনুপম আনন্দের আদর্শ স্থাপন করিয়া তিনি মায়াবদ্ধ জীবকে বিষয়সুখের তুচ্ছতা দেখাইতে চাহিলেন। ব্রজে তাহা তিনি দেখাইলেন :

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"৩

ব্রজে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সহিত লীলায় সেবার অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দ তিনি জীবকে দেখাইলেও সর্বজনমনোহর আদর্শের অভাবে সাধারণ মানুষ ঐ উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কিন্তু নবদ্বীপলীলায় ভক্তভাব স্বীকার করিয়া স্বয়ং ভগবান নিজে ব্রজরস আস্বাদনের উপায়স্বরূপ ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিলেন—তাঁহার পরিবারভুক্ত গোস্বামিগণের দ্বারা অনুষ্ঠান করাইলেন। জীবের সমক্ষে ভজনের একটি আদর্শ স্থাপিত হইল। ব্রজলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে লোভনীয় বস্তুটি দেখাইয়াছিলেন, নবদ্বীপলীলায় তাহা পাওয়ার উপায় দেখাইলেন। জীব মুগ্ধ হইল, ভজনে প্রলুব্ধ হইল। ইহাই তাঁহার করুণার পূর্ণতম প্রকাশ। এইভাবে বলা যায়, ব্রজে যে লীলার সূচনা—নবদ্বীপে তাহারই সমাপ্তি। তাই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার তাৎপর্য আলোচনায় অনিবার্যভাবেই নবদ্বীপলীলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কারণ চৈতন্যমহাপ্রভু যে ব্রজলীলার রসবিগ্রহ! তাঁহার লীলা যে ব্রজলীলার অকৃত্রিম জীবন্ত ভাষ্য!

উল্লেখপঞ্জী

১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পূর্ববিভাগ শ্লোক ২৬৮, ২৭০
২। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য। ২২
৩। ঐ ঐ
৪। ঐ মধ্য। ৮
৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।২।২৯৮
৬। ঐ —১।২।৩০২
৭। সিদ্ধদেহ—"জীবের যথাবস্থিত দেহ প্রাকৃত, জড়;

এই দেহে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবা চলিতে পারে না অথচ সাক্ষাৎ-সেবাই ভক্তের প্রার্থনীয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে সাধক এমন একটি অপ্রাকৃত দেহ পাইতে ইচ্ছা করেন, যাহা তাঁহার অভীষ্ট সেবার উপযোগী। এই দেহটিকেই সিদ্ধদেহ বলে। গুরুদেব এইরূপ একটি দেহের পরিচয় দিয়া দেন। সাধক এই গুরু-নির্দিষ্ট দেহ অন্তরে চিন্তা করিয়া তদ্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভাবানুকূল সেবা করেন বলিয়াই ঐ দেহটিকে অন্তশ্চিন্তিত দেহও বলে।" ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ —চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা পৃঃ ১৮৭

৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।২।১৫১-১৫২

৯। ঐ —১।২।৭৬

১০। ঐ —১।২।৭৫

১১। "সেবা-নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জন।
অবৈষ্ণবসঙ্গ, বহু শিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব॥
হানিলাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব, অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা, গ্রাম্যবার্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥"
—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য।২২

১২। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২২

১৩। "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"
—ভাগবতপুরাণ—৭।৫।২৩

১৪। ভাগবতপুরাণ—৫।৫।২-৩

১৫। ভাগবতপুরাণ—৯।৪।৬৮

১৬। ঐ. —৩।২৫।২৫

১৭। ঐ —১১।১২।১-৭

১৮। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

১৯। ভাগবতপুরাণ—১১।২।৪২

২০। ঐ —১২।৩।৫১-৫২

২১। হরিভক্তিবিলাস—১১।২০৮, ২১৯, ২২১

২২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২য় লহরী—২৩১) উদ্ধৃত পাদ্মবচন

২৩। শ্রীরূপগোস্বামী—নামস্তোত্র

২৪। ভাগবতপুরাণ—১১।১৪।২৬

২৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।২।২১০-১১

২৬। ঐ —১।২।২২৩

২৭। পদ্যাবলী—৫৩

২৮। ভাগবতপুরাণ—৯.৪।১৮-২০

২৯। অহংগ্রহোপাসনা—উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদ ভাবনা। ইহাকেই গীতায় জ্ঞানযজ্ঞ বলা হইয়াছে। (গীতা—৯।১৫)—শ্রীহরিদাস দাস সম্পাদিত—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা—৯১।

৩০। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২২

৩১। পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড ৫২।৭-১১

৩২। তুলনীয়—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।৩।১৫-১৬

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে অনর্থ চার প্রকার—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। দুরভিনিবেশ, দ্বেষ বা আসক্তি প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ; বিবিধ ভোগে অভিনিবেশ সুকৃতোত্থ অনর্থ;

নামাপরাধসমূহই অপরাধোত্থ অনর্থ; ভক্তির দ্বারা ধনাদিলাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাপ্তির আশা ভক্ত্যুত্থ অনর্থ।—মাধুর্যকাদম্বিনী, তৃতীয় বৃষ্টি দ্রষ্টব্য।

৩৪। উজ্জ্বলনীলমণি—স্থায়িভাব-প্রকরণ, শ্লোক ৫৯

৩৫। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য।২৩

৩৬। শিক্ষাষ্টক—৫ম শ্লোক

৩৭। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য।২০

৩৮। উজ্জ্বলনীলমণি—শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ ১৩৭

৩৯। পুরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সমুদ্রের তীরে ক্ষুদ্র পর্বতাকার বালির স্তূপ

৪০। গীতগোবিন্দ—২।২

৪১। ভাগবতপুরাণ—১০।২৯।৪০

৪২। "তিন দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্বকাল।
অন্তর্দশা, বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্য আর॥"

অন্তর্দশাতে (জড়সমাধিতে) ভগবানের সহিত পূর্ণ মিলনে মন, বুদ্ধি তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ায় দেহ-চেতনা থাকে না। দেহকে স্পন্দনহীন জড়বস্তু বলিয়া মনে হয়। তখন কোন প্রকার বাহ্য চেষ্টা বা কথাবার্তা বলা চলে না। সেই অবস্থা হইতে কিছু নিচে নামিলে দেহ-চেতনা দেখা দেয়। অর্ধবাহ্য দশায়ও ভাবসমাধিতে মন বাহ্য জগতে আসে না। হাবভাব, চেষ্টা, কথা-বার্তায় অন্তর্জগতের অদ্ভুত উপলব্ধির বার্তাই প্রকাশিত হয়। এই অবস্থা হইতে আরও নিচে নামিলে বাহ্য-দশা—জাগ্রত অবস্থা; তখন বাহ্য জগতের জ্ঞান হয়।

৪৩। ভাগবতপুরাণ—১০।৩৩।৩৬

পরিশিষ্ট—(১)

[অপ্রকট ও প্রকট লীলার শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা]

অপ্রকট ও প্রকট লীলায় দুইটি করিয়া ভাগ আছে। অপ্রকট লীলা মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী ভেদে দুই প্রকার আর প্রকট লীলা বয়স অনুসারে পৌগণ্ড ও অপৌগণ্ড—এই দুই ভাগে বিভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট লীলার অন্তর্গত মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী লীলার লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে সাধনতত্ত্বের আচার্য পূর্বসূরিগণের অভিমতের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন—এক স্থানে এক রূপে নিত্য স্থিতিশীল এবং মন্ত্রের ধ্যানে পরিকর প্রভৃতির যেরূপ সংস্থান বর্ণিত আছে, সেইরূপ সংস্থানবিশিষ্ট লীলা মন্ত্রোপাসনাময়ী, আর বহু স্থানে পরিব্যাপ্ত, নানা প্রকাশময়ী লীলা স্বারসিকী। ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। বৃন্দাবনে বহু স্থানে বহু রূপে বিবিধ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা প্রকাশমান, স্বারসিকী সেই সকল লীলাকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যের সহিত অনন্তকাল প্রবাহিত; যেমন, মন্ত্রোপাসনাময়ীতে রাধা-কৃষ্ণ যমুনাতীরের কুঞ্জে উপবিষ্টরূপে কল্পিত আর স্বারসিকী লীলায় উভয়ের প্রথম মিলন উপলক্ষে কুঞ্জে প্রবেশ, কিছুকাল সেখানে অবস্থানের পর বহির্গমন, যমুনাতীরে ভ্রমণ, রাসলীলায় প্রবেশ ও নৃত্য, ঐ মণ্ডল হইতে অন্তর্ধান, গোপীদের সহিত পুনর্মিলন ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যের অনন্ত প্রবাহ। শ্রীজীব তাই নানা লীলাপ্রবাহরূপ স্বারসিকীকে গঙ্গার এবং এক একটি লীলা-বিশিষ্ট মন্ত্রোপাসনাময়ীকে গঙ্গাপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন হ্রদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রোপাসনাময়ীর আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতা, গোপাল-তাপনী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, বিচিত্র লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের এক রূপে ভক্তহৃদয়ে নিত্যস্থিতি ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। আর স্বারসিকী লীলার স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি স্কন্দপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন:

“বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥”

তিনি মন্ত্রোপাসনাময়ী হইতে স্বারসিকীর পার্থক্য নির্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই শ্লোকের 'ক্রীড়তি' পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমন ও শয়ন প্রভৃতি লীলাও বুঝা যাইতেছে। কারণ, ক্রীড়া শব্দের অর্থ বিহার। বিহারের সময় নানা স্থানে গমন করিতে হয় বলিয়া এক স্থানে নিত্য অনুষ্ঠিত মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা হইতে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। তবে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা যে স্বারসিকীতে পরিণত হইতে পারে, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে তাহাও বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানেও গোপ-গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানসংক্রান্ত বহু তত্ত্ব সাধক উপলব্ধি করেন কিন্তু তিনি পূতনার শত্রুরূপে এখনও বর্তমান, এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। যেখানে পূতনাবধ-লীলার প্রসঙ্গ আছে, সেখানেই তাহাকে অতীত কালের ঘটনা বলিয়া ধারণা জন্মে। ভগবানের অনুগ্রহে ঐ লীলা এখনও চলিতেছে বলিয়া সাধকের অনুভব হইলে এক রূপে এক স্থানে নিত্য স্থিতিশীল অতীতের পূতনাবধও স্বারসিকীতে পরিণত হইবে।[১]

অপ্রকট লীলার ন্যায় প্রকট লীলাও যে শ্রীকৃষ্ণের বয়স অনুসারে পৌগণ্ড ও অপৌগণ্ড—এই দুই ভাগে বিভক্ত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যদিও সাধারণভাবে ব্রজের লীলাসমূহ শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তথাপি সম্প্রদায়-মতে পূতনাবধ প্রভৃতি লীলাকে পৌগণ্ড এবং বস্ত্রহরণ ও রাসলীলাকে অপৌগণ্ড বলাই সমীচীন। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের অপৌগণ্ড বা কৈশোরের বয়ঃসীমা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে মতভেদ সুস্পষ্ট। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে বর্ণিত লীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টম বর্ষে বস্ত্রহরণ ও নবম বর্ষে রাসলীলা অনুমান করিতে হয় অর্থাৎ নবম বর্ষেই পূর্ণ কৈশোর। কিন্তু পদ্মপুরাণকার কৈশোরের বয়ঃসীমা একাদশ হইতে ত্রয়োদশ, ঊর্ধ্ব সীমা পঞ্চদশ বৎসর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] পদ্মপুরাণ ছাড়া অন্যান্য পুরাণ এবং বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় কিশোর কৃষ্ণের রূপ-কল্পনায় তাঁহার বয়স দশের বেশি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তবে এখানে লক্ষণীয় এই যে, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রাস প্রভৃতি কৈশোর-লীলা নবম বর্ষে সমাপ্ত বলিয়া বর্ণিত হইলেও পরবর্তী কালে ইহার অস্বাভাবিকতা টীকাকারগণ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাহা অপনোদনে নীলকণ্ঠ

হরিবংশের[৩] এবং রত্নগর্ভ বিষ্ণুপুরাণের[৪] শ্লোকের 'কৈশোবক' পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—কৈশোরের আরম্ভ একাদশ বৎসর হইতে; এই সময় নব নব অনুরাগে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। এইভাবে অপৌগণ্ডের বয়ঃসীমা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণের মতভেদের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট—(২)

[স্বকীয়া-পরকীয়া প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মতভেদ]

শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় গোপীগণের পরকীয়াত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ উপপতিভাবেই গোপীদের সহিত মিলিত হন। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমাত্মা, জ্ঞানযোগীদের ন্যায় এই উপলব্ধি তাঁহাদের ছিল না। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় বটে কিন্তু কেবল প্রেমভক্তির দ্বারাই ভগবান বশীভূত হন—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। এইজন্যই ব্রজগোপীগণ পরকীয়া রতির দ্বারা উপপতিভাবেই নিত্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। রাসলীলায় এই নিগূঢ় রহস্যই উন্মোচিত হইয়াছে।[১] পরকীয়া প্রেমেই যে শ্রীরাধার মহিমা প্রতিষ্ঠিত, শ্রীসনাতন বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—শ্রীরাধা কুলনারীর ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া পতিকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি সতী ও পবিত্রগৌরবে গৌরবান্বিতা। সত্যই বিধাতা তাঁহাকে বিচিত্র ভাবময়ীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গার রস আস্বাদনে পরকীয়াত্বের তাৎপর্য আলোচনা করিয়া নায়কভেদ-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের উপপতিভাব সম্পর্কে বলিয়াছেন—পূর্বাচার্যগণ ইহাকে যে-নিকৃষ্ট স্থান দিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপপতিভাবের লীলায় দোষ হইতে পারে না। কারণ, তিনি কেবল রস আস্বাদনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন:

"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥"[২]

উপপতিভাবেই যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা তাহা আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীরূপ বলিয়াছেন, ইহাতে বহু বাধা ও প্রচ্ছন্ন কামুকতা; ইহাতে নায়ক-নায়িকা

পরম্পরের নিকট দুর্লভ।* তবে তাঁহার ললিতমাধব নাটকের দশম অঙ্কে দ্বারকার 'নববৃন্দাবনে' চন্দ্রাবলীর অনুমোদনে নন্দ, যশোদা প্রভৃতির সমক্ষে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়া তিনি গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী ললিতমাধবের এই ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শ্রীরূপকে স্বকীয়াবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে গোপীদের পতি তবে প্রকট লীলায় অল্প সময়ের জন্য উপপতিরূপে প্রতীয়মান, ইহাই শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু শ্রীজীবের এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ ললিতমাধব একখানি নাটক আর উজ্জ্বলনীলমণি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-অনুমোদিত সাধন-বিষয়ক সিদ্ধান্তগ্রন্থ। ললিতমাধব রচিত হইয়াছিল সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ভক্ত সাধারণকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে আর উজ্জ্বলনীলমণি রচিত হইয়াছে কান্তাভাবে সাধনার গভীর তাৎপর্য বুঝিতে সমর্থ উচ্চস্তরের ভক্ত সাধকদের সাধনবিষয়ে নির্দেশদানের প্রয়োজনে। তাই এই দুই গ্রন্থের বক্তব্যের আপাতবিরোধ সম্পর্কে ইহাই মনে হয় যে, শ্রীরূপ স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদের প্রশ্নটি সমাজ ও সাধনার দিক হইতে বিচার করিয়াছেন। পরকীয়া সাধনার গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে না পারিলে সমাজ-জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য—এই আশংকায় ললিতমাধবে সমাজ-জীবনের অনুকূলে স্বকীয়া সাধনা আর যাঁহাদের ক্ষেত্রে এইরূপ আশংকা নাই, সেই সকল ভক্ত সাধকের পক্ষে পরকীয়া সাধনার শ্রেষ্ঠত্বের কথাই শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, উজ্জ্বলনীলমণির রচনাশৈলী পরিণত ও আলোচনা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-পূর্ণ; উপরন্তু এই গ্রন্থের তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় ললিতমাধবের বহু শ্লোক দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল কারণে স্পষ্টই মনে হয়, উজ্জ্বলনীলমণি পরবর্তী কালের রচনা। সুতরাং ললিতমাধবে স্বকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত, একথা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা যাইতে পারে, শ্রীরূপ প্রথম জীবনে স্বকীয়াবাদের অনুকূলে নাটক রচনা করিলেও পরবর্তী কালে তাঁহার এই মতের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উজ্জ্বলনীলমণিতে পরকীয়াবাদকেই স্বকীয়াবাদের উপরে স্থান দেন। তৃতীয়তঃ, ললিতমাধবের কাহিনীর ভিত্তিতে

শ্রীরূপকে স্বকীয়াবাদী বলিয়া স্থির করিলে উজ্জ্বলনীলমণির সমস্ত সিদ্ধান্তই অর্থহীন হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রীবিশ্বনাথ যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সুতরাং এই সকল কারণে মনে হয়, ললিতমাধবে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিলেও শ্রীরূপ প্রকৃতপক্ষে পরকীয়া মতবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন।

শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণির লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী এবং আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্বকীয়া ও পরকীয়া সম্পর্কে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীজীব লোচনরোচনী টীকা ছাড়াও লঘুতোষণী, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, ষট্‌সন্দর্ভ এবং গোপালচম্পূতে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, ব্রজদেবীগণ বাস্তবিকপক্ষে পরম স্বকীয়া কান্তা তবে প্রকট লীলায় পরকীয়ারূপেই প্রতীয়মান।[৪] শ্রীজীব এই সিদ্ধান্তস্থাপনে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন:

১। শৃঙ্গার রসে উপপতিভাব রসাভাসজনক। শৃঙ্গার রস অতি পবিত্র। 'শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ'—অমরকোষে শৃঙ্গার 'শুচি' শব্দের সমার্থক বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং এই পবিত্র উজ্জ্বল রসে ধর্মবিরুদ্ধ উপপতিভাব অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নাট্যালঙ্কার শাস্ত্রেও উপপতিভাব নিন্দিত। 'ত্রিকাণ্ডশেষে' জার শব্দের অর্থ পাপপতি।

২। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উপপতিভাব দূষণীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৫]; পরীক্ষিৎ-ও ইহাকে ঘৃণ্য বলিয়াছেন।

৩। তবে সাধারণ উপপতির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নহে। 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং'—উজ্জ্বলনীলমণির এই শ্লোকের তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের উপপতিভাব নিন্দনীয় নহে, কারণ, তিনি রসনির্যাস অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের সার আস্বাদনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব বুঝিতে হইবে, অবতার-সময়েই অর্থাৎ প্রকট লীলাকালেই তিনি তাঁহার উপপতিভাবের প্রতীতি স্বেচ্ছায় জন্মাইয়াছিলেন, অন্য সময় অর্থাৎ অপ্রকট লীলাকালে নহে।

৪। গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাম্পত্যসম্বন্ধ। ব্রহ্মসংহিতার

'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ'[৬] শ্লোকের 'নিজরূপতয়া' পদের অর্থ প্রকট লীলায় যেমন আনন্দচিন্ময়রসের অংশস্বরূপিণী গোপীগণ পরস্ত্রীরূপে লীলার পোষকতা করেন, নিত্যলীলায় সেইরূপ নহে। পরমলক্ষ্মীদের নিত্যদাম্পত্য ভিন্ন অন্য কোন ভাব নাই। লক্ষ্মীগণ পরস্ত্রী হইতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ লক্ষ্মী। ব্রহ্মসংহিতার 'লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং' শ্লোকাংশে[৭] লক্ষ্মী শব্দের অর্থ গোপী,[৮] সুতরাং গোপীরা পরকীয়া নহে। অতএব প্রকট লীলায় তাঁহাদের পরদারত্ব মায়াপ্রসূত। ইহার সমর্থনে শ্রীজীব ললিতমাধব নাটকের গার্গী-পৌর্ণমাসীর কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৯] এই কথোপকথনে ব্রজবালাদের সহিত ব্রজগোপগণের বিবাহ যে প্রকৃতপক্ষে মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সুপরিস্ফুট। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীজীব লোচনরোচনীতে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের দাম্পত্যপ্রেমময় নিত্যসম্বন্ধ বলিয়া প্রকট লীলার শেষ সময়ে মায়িক পরকীয়া ভাবও ছিল না। কিন্তু পরকীয়া সম্বন্ধকে যদি নিত্য বলা হয়, তাহা হইলে পূর্বরীতি অনুসারে রসাভাস দোষ ঘটে। কারণ, প্রকট লীলার শেষভাগে যে দাম্পত্যই ব্যক্ত হইয়াছে, ললিতমাধবে বর্ণিত বিবাহের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে। ব্রজধামেও প্রকট লীলার শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের সম্বন্ধ দাম্পত্যেই পরিণত।

৫। গোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর ভাগে দুর্বাসা ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজদেবী-গণের স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীব এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকপ্রসঙ্গে 'স্বামী' শব্দের উল্লেখ থাকিলে প্রসিদ্ধি-বশতঃ পতিকেই বুঝায়। গৌতমীয়তন্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণকে গোপীদের পতিরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে, উপপতিরূপে নহে।[১০] ভাগবতেও শুকদেব প্রকট লীলার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রজগোপীগণকে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' বলিয়াছেন। শ্রীজীব লোচনরোচনী টীকায় এই উক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-যে গোপবনিতাদের পতি, তাহা শুকদেবও পরোক্ষভাবে ভাগবতে (১০।৩৩।৮) নির্দেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় কৃষ্ণবধূ ব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্যসম্বন্ধ এই দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট। বিদ্যুৎ যেমন মেঘের সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান সেইরূপ ব্রজগোপীগণ বধূরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নভাবে শোভা পাইতেছিলেন। তবে

যে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলিলেন, অগ্নি অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শেও যেমন অপবিত্র হয় না, সেইরূপ তেজস্বী ব্যক্তিগণের ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন দোষের নহে (ভাঃ পুঃ ১০।৩৩।২৯)—এই উক্তির অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, শুকদেবের এই উক্তি 'অভ্যুপগমবাদ'[১১] মাত্র।

৬। যেখানে বহু বাধা, প্রচ্ছন্ন কামুকতা এবং পরস্পরের মিলন সুদুর্লভ সেখানেই রতির পরাকাষ্ঠা, রসশাস্ত্রে একথা উল্লিখিত হইলেও, ইহা লৌকিক অর্থেই প্রযোজ্য। সমর্থা রতিতে বাধা প্রভৃতি না থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্গার রসের যথেষ্ট পুষ্টি হয়। তাহাতেও মাদনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং উপপতিভাবের পরিকল্পনা সব দিক দিয়াই অনাবশ্যক।

উপসংহারে বলা যায়, শ্রীজীব তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। স্বকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠায় তিনি আপাতপ্রতীয়মান অনেক পরস্পরবিরোধী উক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লোচনরোচনী টীকার শেষে বলিয়াছেন :

"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্বাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্বমপরং পরম্ ॥"

অর্থাৎ এবিষয়ে শ্রীজীব যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুটা স্বেচ্ছায় ও কিছুটা পরের ইচ্ছায়। যাহাতে পূর্বাপর সামঞ্জস্য আছে, তাহাই স্বেচ্ছায় আর যাহাতে নাই, তাহা পরের ইচ্ছায় লিখিত।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরকীয়া কান্তা। তিনি তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীজীবের যুক্তিধারা খণ্ডন করিয়া, গোপীরা যে নিত্যপরকীয়া, তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, পূর্বোদ্ধৃত লোচনরোচনীর উপসংহার-শ্লোকের ভিত্তিতে শ্রীজীবও যে নিত্য-পরকীয়াবাদে বিশ্বাসী তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অতঃপর শ্রীবিশ্বনাথের যুক্তি-ধারা আলোচনা করা যাইতেছে :

১। উপপতিভাব যে নিন্দনীয়, তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া শ্রীজীব ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও পরীক্ষিতের উক্তি এবং রসশাস্ত্র ও নাট্যালঙ্কারশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ ইহার উত্তরে বলেন, উপপতিভাব প্রাকৃত নায়কের ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে নহে। কারণ, যাঁহার

কটাক্ষমাত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটিত হয়, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিরূপা গোপীগণের এই দোষ একেবারেই থাকিতে পারে না। তিনি তাঁহার এই বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীরূপের নাটকচন্দ্রিকার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, উপপতিভাব গৌণ বলিয়া পণ্ডিতগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণকে বাদ দিয়া বুঝিতে হইবে। অলঙ্কারকৌস্তভেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। শ্রীবিশ্বনাথ এই সব যুক্তিপ্রমাণ-বলে মন্তব্য করিয়াছেন, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উপপতিভাব দূষণ না হইয়া ভূষণই হইয়া থাকে।

২। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে উপপতিভাব যে নিন্দনীয় নহে, তাহা অবশ্য শ্রীজীবও উজ্জ্বলনীলমণির 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন। তবে তাঁহার যুক্তি হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যময় শৃঙ্গার রসের সার আস্বাদনের জন্য নিজ ইচ্ছায় কেবল মায়িক প্রকট লীলায় এই উপপতিভাব স্বীকার করেন। অপ্রকট লীলায় ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ এই সিদ্ধান্তের সহিত একমত নহেন। তাঁহার মতে প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের উপপতিভাব এবং তাহাকেও আবার মায়া বলিয়া মনে করিলে রাসলীলা এবং ব্রজগোপীদের প্রেমের পরম উৎকর্ষ অবাস্তব হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধও বটে। তিনি তাঁহার এই মত-প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন:

(ক) শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা মায়া নহে। প্রকট ও অপ্রকট লীলায় মূলতঃ কোন ভেদ নাই। তাঁহার লীলামাধুর্য তিনি যখন জগতে প্রকাশ করেন তখনই তাহা প্রকট আর সেই লীলা জগতে অপ্রকাশিত থাকিলেই তাহাকে অপ্রকট বলা হয়। লঘুভাগবতামৃতেও (১৷৬৬৪) এই কথাই বলা হইয়াছে।

(খ) উপপতিভাবময় প্রকট রাসলীলাকে মায়া মনে করা অসঙ্গত। কারণ, সর্বলীলার সার রাসলীলার আদি, মধ্য ও অন্তে উপপতিভাব বর্তমান। রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রতিটি অধ্যায়েই শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের উক্তিতে ইহা স্পষ্ট-ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে।[১২] উপপতিভাবের প্রমাণস্বরূপ এই সকল অংশকে মায়া বলিয়া বর্জন করিলে রাসলীলার কোন মাধুর্যই থাকে না। ইহা ছাড়া কেহ কখনও দাম্পত্যময় রাসলীলা বর্ণনা করেন নাই। দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের

অর্থও উপপতিভাবময়। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ধ্যান এবং অন্যান্য মন্ত্রেও এই ভাব স্পষ্ট।

প্রকট লীলা মায়িক হইলে রাসলীলায় লক্ষ্মীগণের তুলনায় গোপীদের উৎকর্ষ ঘোষণা[১৩] এবং এই সকল কৃষ্ণপ্রেম-তন্ময় গোপীর চরণস্পর্শে ধন্য ব্রজের তৃণলতাগুল্মের জীবন কামনা করিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের উক্তিও[১৪] অবাস্তব হইয়া পড়ে। কেবল উদ্ধবই নহে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন, অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া গোপীগণ যেভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা তাঁহার নাই,[১৫] সেই পরম মাহাত্ম্যসূচক নিত্যসত্য ভগবানের উক্তিও অমূলক হইয়া পড়ে, ঋষিবাক্যেও অবিশ্বাস জন্মিতে পারে।

'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' গীতার এই শ্লোকের (৪।৯) ব্যাখ্যায় আচার্য রামানুজ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কর্ম ও পরিকর প্রভৃতির নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বৃহৎ বামনপুরাণেও গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'উপপতি-ভাবে আমার সুগভীর স্নেহ লাভ করিয়া তোমরা সকলেই কৃতার্থ হইবে'—প্রকট লীলার নিত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। শ্রীজীব নিজেও ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের নাম, জন্ম ও কর্ম প্রভৃতির নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের আকার, জন্ম ও কর্ম-লক্ষণান্বিত লীলা ও পরিকর, সমস্তই তাঁহার অনন্ত স্বরূপশক্তির প্রকাশ, সুতরাং নিত্য। শ্রীবিশ্বনাথ বলেন, ইহাই যখন তাঁহার সিদ্ধান্ত তখন উপপতিভাবময়ী রাসলীলাকে কিরূপে ম া বলা যায়? ভগবানের নাম নিত্য; এক এক লীলায় তাঁহার এক এক নাম। লীলা অনিত্য হইলে নামও অনিত্য হইয়া পড়ে। নামকে অনিত্য মনে করিলে অপরাধ ঘটে।

৩। শ্রীজীব ব্রজগোপীগণের নিত্যস্বকীয়া সম্বন্ধের প্রমাণস্বরূপ ললিত-মাধবের দশম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন, এইরূপ বিবাহের কথা কোন আর্ষ-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। উপরন্তু এই বিবাহের সত্যতা স্বীকার করিলে শুকদেবের মতের সহিত সঙ্গতি থাকে না। ভাগবতে পরীক্ষিৎ ধর্ম-সংস্থাপক ও আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণের উপপতিভাবে সংশয় প্রকাশ করিয়া শুকদেবকে যে-প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তরে তিনি তো স্পষ্টই বলিতে পারিতেন, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা,

পরস্ত্রী নহেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া তাঁহারা পরস্ত্রী একথা স্বীকার করিয়া তিনি ইহার দোষ খণ্ডনের এত চেষ্টা করিলেন কেন ?

৪। ব্রজগোপীগণ স্বকীয়া—এই মত প্রতিষ্ঠায় শ্রীজীব আরও বলিয়াছেন, গোপালতাপনী শ্রুতি, গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীদের পতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন, 'পতি' শব্দ কখনও কখনও গতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু কেবল বিবাহিত ব্যক্তিই যে পতি বলিয়া উল্লিখিত হন তাহা নহে, নায়িকা-প্রকরণে পরকীয়াকে স্বাধীনপতিকা বিশেষণেও চিহ্নিত করা হইয়াছে। আবার ইহাও বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোন কোন নায়িকার পতিরূপে বর্ণিত হইলেও, সকলের সহিত তাঁহার দাম্পত্য সম্বন্ধ নাই। কারণ, তিনি সকলের পতি হইলে ভাগবতে পরদারগমনের প্রসঙ্গই উঠিত না। তাছাড়া, উজ্জ্বলনীলমণির হরিপ্রিয়া প্রকরণে ৩২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে '—'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।' অর্থাৎ ব্রজগোপীদের নিজ নিজ পতির সহিত কখনও মিলন হইবে না। ইহার দ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ পতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ আরও বলেন, ভাগবতে গোপীদের 'কৃষ্ণবধূ' বলা হইলেও, বধূ শব্দে শুধু যে পরিণীতা স্ত্রীকেই বুঝায় তাহা নহে, সাধারণভাবে স্ত্রীমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। অমরকোষে বলা হইয়াছে, 'বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ' অর্থাৎ 'বধূ' শব্দে জায়া, পুত্রবধূ ও স্ত্রীলোক বুঝায়। সুতরাং 'পতি' বলিলেই বিবাহ-সম্পর্ক বুঝায় না।

৫। শ্রীজীব বলিয়াছেন, ব্রজগোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি, অতএব স্বকীয়া। শ্রীবিশ্বনাথ ইহার উত্তরে বলেন, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা যথার্থ হইলেও ভক্তের দৃষ্টিতে নহে। কারণ, লীলাবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণই তাঁহার উপাস্য, লীলারহিত রাধাকৃষ্ণ তাঁহার ধারণা ও আরাধনার অতীত এবং রাসলীলারত ব্রজগোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এইরূপে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্বকীয়াবাদের সপক্ষে শ্রীজীব গোস্বামীর সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, মহাভাবময়ী ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ অচিন্ত্য অনুরাগের ফল। এই সম্বন্ধ-স্থাপনে তাঁহাদের স্বজন ও আর্যপথ ত্যাগের দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত দুঃখ, এত ক্লেশও তাঁহাদের পক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনুরাগের চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত আর কি

হইতে পারে? শ্রীবিশ্বনাথের বক্তব্য, মহাভাববতী ব্রজগোপীদের অলৌকিক অনুরাগ যে শ্রীজীবেরও অভিপ্রেত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার লোচনরোচনী টীকার 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি শ্লোক হইতে শ্রীবিশ্বনাথ এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন যে, গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপপতি-সম্বন্ধ শ্রীজীবেরও অভিপ্রেত। যদি গুরু, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ সাক্ষী রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-গোপীদের বিবাহ হইত, তাহা হইলে উজ্জ্বলনীলমণির বক্তব্য আগাগোড়াই নিরর্থক হইত। সুতরাং শ্রীজীবের দাম্পত্যসূচক উক্তি পরেচ্ছা-প্রণোদিত।

শ্রীজীব কি পরকীয়াবাদী

শ্রীজীব গোস্বামী আসলে পরকীয়াবাদী, শ্রীবিশ্বনাথের ন্যায় আর যাঁহারা এই মতে বিশ্বাসী তাঁহারা বলেন, ভগবান শক্তিমান আর সকলই তাঁহার শক্তি—এই তত্ত্ব ভুলিয়া এবং অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত উপপতি-সম্পর্কের সরস অন্তর্গূঢ় জীব না বুঝিয়া পাছে কেহ ধর্মের নামে অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়—এই আশঙ্কাতেই শ্রীজীব তত্ত্বাংশের উপর জোর দিয়া স্বকীয়াবাদের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। নতুবা তিনি প্রকৃত-পক্ষে পরকীয়া মতবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার একথাও বলেন, লোচনরোচনী টীকায় স্বকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠায় শ্রীজীবের প্রবণতা দেখা গেলেও গোপালচম্পূ ও সংকল্পকল্পদ্রুম নামক কাব্যে তিনি পরকীয়াবাদেরই পোষকতা করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, শ্রীজীব পূর্বচম্পূর প্রথম পূরণে ঘোষণা করিয়াছেন, অবতারকালে যে মায়াময় উপপতিভাবের প্রতীতি হয় তাহার অবাস্তবতা উত্তরচম্পূতে প্রতিপাদন করা হইবে। কিন্তু স্বকীয়া লীলায় যে রসপুষ্টি হয়না তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্যই তিনি বিবাহোত্তর পর্বে শ্রীরাধার উক্তিরূপে 'যঃ কৌমারহরঃ'[১৬] ইত্যাদি শ্লোকটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। স্বকীয়া লীলাতেই রসপুষ্টি সম্ভব হইলে শ্রীজীব কখনই উপসংহারে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়া সমগ্র কাব্যের বিষয়বিন্যাসের ধারাকে বিপর্যস্ত করিতেন না।

যাঁহারা শ্রীজীবকে স্বকীয়াবাদী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা এই সকল যুক্তি মানেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ লোচনরোচনীর উপসংহার-শ্লোকের প্রামাণিকতাতেই সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে এই শ্লোক নাই, সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। আবার কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকটি শ্রীজীবের রচনা হইলেও ইহা পূর্বাপর সম্বন্ধ ছাড়াই হঠাৎ

স্বকীয়াবাদ-সিদ্ধান্তের উপসংহারে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, শ্রীজীব প্রকৃতপক্ষে স্বকীয়াবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু নিজ সম্প্রদায়ের পরকীয়াবাদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করা অশোভন মনে করিয়াই স্বকীয়াবাদের পক্ষে নিজের অভিমত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও লোচনরোচনীর উপসংহারে 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি শ্লোকটি স্থাপন করিয়াছেন। এই শ্লোকের আকস্মিকতাই শ্রীজীবের স্বকীয়াবাদে বিশ্বাসের নিঃসংশয় প্রমাণ। তিনি লোচনরোচনী টীকা ছাড়াও ব্রহ্মসংহিতার টীকা, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, লঘুতোষণী প্রভৃতিতেও ব্রজগোপীদের নিত্যস্বকীয়াত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাই তাঁহার পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত—তাঁহার নিজের ইচ্ছায় লিখিত, আর প্রকট লীলায় পরকীয়াত্বের যে সিদ্ধান্ত তাহা নিজ সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত লিখিত।

আসল কথা, শ্রীজীব স্বকীয়াবাদী না পরকীয়াবাদী ছিলেন—এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

শ্রীরূপ কবিরাজ সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দেখাইয়াছেন, প্রকট ও অপ্রকট লীলায় পার্থক্য লীলাগত বা রতিগত নহে। 'প্রকট লীলার ন্যায় অপ্রকট লীলাতেও ব্রজগোপীগণ পরকীয়া-অভিমানিনী।'[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পরকীয়াবাদী বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রকট ও অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে একমাত্র লোকচক্ষুর গোচর ও অগোচর—এই দুই কারণেই লীলার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

কবিকর্ণপুর-ও তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপপতি-সম্পর্ক তাঁহাদের আক্ষেপসূচক উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। গোপীরা দুঃখ করিয়া বলেন, তাঁহারা পতি, পুত্র, বন্ধু, ভ্রাতা প্রভৃতিকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছেন অথচ সেই শঠ কিনা রাত্রির অন্ধকারে তাঁহাদের নির্জন স্থানে একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন।[১৮]

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-ও তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে পরকীয়াবাদের সমর্থনে বলিয়াছেন:

> "তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
> সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

অতএব মধুররস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥" (আদি—৪/৪৪-৪৬)

উল্লেখপঞ্জী

পরিশিষ্ট (১)

১। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৫২ অনুচ্ছেদ।
২। "বাল্যন্তু পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
অষ্টপঞ্চককৈশোরং সীমা পঞ্চদশাবধিঃ॥"
৩। হরিবংশ—২।২০।১৮
৪। বিষ্ণুপুরাণ—৫।১৩।৫৯

পরিশিষ্ট (২)

১। ভাগবতপুরাণের—১০।২০।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য
২। উজ্জ্বলনীলমণি—নায়কভেদ-প্রকরণ ২১
৩। "বহু বার্য্যতে খলু, যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বম্।
যা চ মিথো দুর্লভতা, সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ।"—
শ্রীরূপ কর্তৃক উদ্ধৃত ভরতমুনির বচন
৪। প্রীতিসন্দর্ভ—২৭৮ অনুচ্ছেদ
৫। ভাগবতপুরাণ—১০।২৯।২৬
৬। ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৬
৭। ঐ—৫।৩৮
৮। পূর্বোক্ত শ্লোকের শ্রীজীব-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য
৯। ললিতমাধব—১।৪৪
১০। গৌতমীয়তন্ত্র—২।২৬
১১। যাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে, তাহাকে তর্কের খাতিরে স্বীকার করাকে অভ্যুপগমবাদ বলে।
১২। 'কান্তাভাব—রাসলীলা' অধ্যায়ের 'ভাগবতে পরকীয়াবাদের দৃষ্টান্ত' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৩। ভাগবতপুরাণ—১০।৪৭।৬০
১৪। ঐ — ১০।৪৭।৬১
১৫। ঐ — ১০।৩২।৩২
১৬। "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
স চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"
১৭। সারসংগ্রহ—৮৩ পৃষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত—১৯৪৯)
১৮। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—১৯ সংখ্যক স্তবক (পুরীদাস দাস সম্পাদিত)

গ্রন্থ-সূচী

অনেকার্থসংগ্রহ—৮৯

অবদানশতক—২৫২

অমরকোষ—৮৯, ৩৫৩

অলঙ্কারকৌস্তভ—৩২৪, ৩৫৬

অষ্টাধ্যায়ী—৪, ৬

অহিবুর্ধ্ন্যসংহিতা—১৯

আগমপ্রামাণ্য—২৩-২৪, ৩৯

অ[illegible] ক্ষ) পুরাণ—২, ৪৬, ৮২, ১১১, ২০৮, ২৬২, ৩২৫

আনন্দচন্দ্রিকা—২৭৯, ৩৫৩, ৩৫৫

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—৩৬০

আঁরণ্যক—৪, ২৯-৩০

উজ্জ্বলনীলমণি—৪৫-৪৬, ২২২, ২৪১, ২৬৮, ২৭২, ২৭৭-৭৮, ৩০৪, ৩৫১-৫৩, ৩৫৬, ৩৫৮-৫৯

উত্তরাধ্যয়নসূত্র—৫

উদ্ধবদূত—২৩২

উদ্ধবসন্দেশ—২২৭, ২৩২

উপনিষদ—৪, ৭, ১২, ১৩, ১৮, ২১, ২৫, ৮৭, ৯২, ১০৩, ১২৮, ১৩৩, ১৪২, ১৪৪, ১৫১, ১৬৫, ১৮৪, ১৯৫-৯৬, ২০৩, ২১৫, ২৩৭, ২৭১, ২৮২

ঋক্‌পরিশিষ্ট—৪৫, ৪৭

ঋগ্বেদ (ঋক্‌সংহিতা)—৩-৪, ৬-৭, ১১, ২০-২২, ২৮-৩০, ৬৭, ২০৫

ঐতরেয় আরণ্যক—৪

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২৯

কথা ও কাহিনী—২৫২

কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—৯৭

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়—৪৯

কূর্মপুরাণ—২, ২৩, ৮২, ১৮৩
কৃষ্ণকর্ণামৃত—৮১-৮২, ৮৮, ৩৩৪
কৃষ্ণভাবনামৃত—৩২৪
কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী—১০০, ৩২৪
কৃষ্ণোপনিষদ—১৯৫-৯৬, ২০৩
কেন উপনিষদ—১২৮
কৌষিতকী ব্রাহ্মণ—৪
ক্রমসন্দর্ভ—৮৮, ১৫৬, ১৭২
গর্গসংহিতা—৪৫, ৯৬, ১১০, ১৮১-৮২, ১৯০, ২০৬-০৭, ২১২, ২১৬, ২১৯, ২৩২, ২৬৩, ২৬৮, ২৭১, ২৮০
গাথাসপ্তশতী—৪৭, ৮২
গীতগোবিন্দ—৪৬, ৮০-৮২, ৩৩৪, ৩৩৭
গীতা—৭-১১, ১৩, ১৬, ১৯, ৩৭, ৪১, ৬৭, ১০৬, ১১২-১৩, ১১৬-১৭, ১২১, ১৩২-৩৪, ১৩৭, ১৩৯-৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৬০, ১৬৪-৬৫, ১৮২, ১৮৯-৯০, ১৯৯, ২৩৬, ২৪৪, ২৬৪-৬৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪-৯৫, ৩৫৭
গীতাভাষ্য—৪০
গোপালচম্পূ—৯২, ৩৫৩, ৩৫৯
গোপালতাপনী—৪৭, ১৪০, ১৪২, ১৭৬, ১৯৫, ২০৩-০৪, ২১৬, ২২০, ৩৫৪, ৩৫৮
গোবিন্দলীলামৃত—১০০, ৩২৪
গৌতমীয়তন্ত্র—৪৫, ৪৭, ১৭৭, ১৯৪, ১৯৭, ২১৮, ২২১, ২৬৮, ২৭১, ২৮০, ৩৫৪, ৩৫৮
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—২৮৫
ঘটজাতক—৫
চতুর্বেদশিখা—১১৮
চিলপ্পধিকারম্—৩৩
চৈতন্যভাগবত—৮১

চৈতন্যচরিতামৃত—৪৫, ৮১, ১১৪, ১৩০, ১৬০, ১৬৬, ১৮২, ১৯৬, ২১৬, ২৪৫, ২৯৩, ৩০৫, ৩১০, ৩১৭, ৩১৯, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৬০

চৈতন্যমতমঞ্জুষা—১৭৬, ২৭০

ছান্দোগ্য উপনিষদ—৪, ৭, ১৩, ২৫, ১৪২, ২১৫

ঠাকুরাণীর কথা—২৫৮

তত্ত্বসন্দর্ভ—১৪৯

তন্ত্র—১৫, ২৪, ৪৫, ৪৭, ১৫১, ১৭৭, ১৯৪, ১৯৭, ২০৫, ২১০, ২১৩, ২১৮, ২২১, ২৬২, ২৬৮, ২৭১, ২৮০

তন্ত্রবার্তিক—২৩

তিরুপ পাবৈ—৩৫

তিরুবায়মোড়ি—৩৫

তৈত্তিরীয় আরণ্যক—২৯-৩০

তৈত্তিরীয় উপনিষদ—৯২

দশাবতারচরিত—৪৯

ধ্বন্যালোক—৪৮, ৮২

নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি—৩৫

নাটকচন্দ্রিকা—৩৫৬

নাট্যদর্পণ—৪৯

নারদপঞ্চরাত্র—১৫-১৬, ২৫, ২৭, ৪৫, ২৬৮, ২৭১

নারদীয়তন্ত্র—১৫১

নিদ্দেস—২২

নৃসিংহতাপনী—১১৮

ন্যায়তত্ত্ব—৩৯

পদ্মপুরাণ—২, ২৩, ৪৫-৪৬, ৭৬, ৭৮-৭৯, ৮২, ৯৬, ১১২-১৩, ১৪১, ১৭৬, ১৮১, ১৮৩, ২০৮, ২১২, ২২১, ২৩, ২৩২, ২৪৫, ২৫৫, ২৬০, ২৬৮, ২৭১, ২৮৪, ৩২৮

পদ্যাবলী—১০০, ২৭৮

পরমাত্মসন্দর্ভ—৯০, ১০৮, ১৫০

পাদ্মতন্ত্র—১৫, ২৪

পুরাণ—২, ৩, ৯-১০, ১২, ১৬, ২৩, ৪৫-৪৬, ৬৭-৮০, ৮২-৮৩, ৮৭-৮৮, ৯৬, ১১১-১৩, ১৩৪-৩৫, ১৩৮, ১৪০-৪২, ১৪৯, ১৫২-৫৩, ১৫৭-৫৮ ১৬৪-৬৫, ১৬৮, ১৭৬, ১৮১, ১৮৩, ১৯৫, ২০৫, ২০৮-১০, ২১২, ২১৮, ২২০-২১, ২২৩, ২৩০, ২৩২, ২৪৫, ২৪৭-৪৮, ২৫৫, ২৬০, ২৬২-৬৩, ২৬৭-৬৯, ২৭১, ২৮৪, ২৯৩, ৩২২, ৩২৫, ৩২৮, ৩৫১, ৩৫৭

পূর্বমীমাংসা দর্শন—১৮৬-৮৭

প্রাকৃতপৈঙ্গল—৪৯, ৮২

প্রীতিসন্দর্ভ—১২৭, ৩৫৩

প্রেমসম্পুট—২৮১

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—২০৯

বজ্জালগ্‌গা—৪৯

বরাহতন্ত্র—২১৩

বরাহপুরাণ—২৩, ৪৬, ২০৮, ২১৮, ২২০, ৩২২

বশিষ্ঠসংহিতা—২৩

বালচরিত—৯, ৮২

বামনপুরাণ (বৃহৎ)—২, ৮২, ২০৯, ৩৫৭

বায়ুপুরাণ—২, ১২, ২৩, ৪৬, ৮২, ১১১

বিদ্বন্মণ্ডন—৯৩

বিশ্বকোষ—৮৯

বিষ্ণুপুরাণ—২-৩, ৯, ১২, ১৬, ২৩, ৪৫, ৬৭-৭৮, ৮০, ৮২, ৮৭-৮৮, ১১১, ১৩৪-৩৫, ১৩৮, ১৪০-৪২, ১৪৯, ১৫২-৫৩, ১৫৭-৫৮, ১৬৪-৬৫, ১৬৮, ১৯৫, ২৪৮, ২৬৭, ২৬৯, ২৭১, ২৯৩, ৩২২, ৩৫১

বিষ্ণুসংহিতা—২৩

বুদ্ধচরিত—৯

বৃন্দাবনধ্যান—২০৯

বৃন্দাবনপরিক্রমা—২০৯

বৃন্দাবনশতক—২১০

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—১২, ১৮, ৮৭, ২৩৭, ২৪১, ২৮২
বৃহদ্দেবতা—৭
বৃহন্নারদীয় পুরাণ—২৩, ৩২২
বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী—৯১, ২৪৭, ২৬৮, ৩৫১
বৃহদ্ভাগবতামৃত—১০০, ১৭২, ২৬৮, ২৭১, ৩৫১
বৃহৎসংহিতা—৩২
বেণীসংহার—৪৮
বেদান্তকামধেনু (সিদ্ধান্তরত্ন)—৪২, ১৬৩
বেদান্তদীপ—৪০
বেদান্তপারিজাতসৌরভ—৪২, ১৬৩
বেদান্তসার—৪০
বেদান্তসূত্র—ব্রহ্মসূত্র দ্রষ্টব্য
ব্রজপরিক্রমা—২০৮-০৯
ব্রহ্মপুরাণ—আদিপুরাণ দ্রষ্টব্য
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—২, ৯, ১৬, ৪৫-৪৬, ৭৬-৭৯, ৮২-৮৩, ২১৮, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৮, ২৭১
ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তসূত্র)—২৩, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৮৯, ৯২, ৪৯, ১৬৪, ১৮৬, ১৮৮
ব্রহ্মসংহিতা—৪৭, ৮২, ৯৮, ১১৪, ১৩০, ১৩৬-৩৭, ১৭০, ১৭৬-৭৭, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ২০৬, ২১১, ২১৯, ৩৫৩-৫৪, ৩৬০
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—১৭৬, ৩২৫
ব্রাহ্মণ—৪, ১২, ২৯
ভক্তিরত্নাকর—২০৮
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—২১১, ২৩০, ২৯২, ৩১০, ৩১৫-১৮, ৩২৫, ৩২৭
ভগবন্নামকৌমুদী—১৭৭, ১৯৫
ভগবৎসন্দর্ভ—১১৫, ১৫৪, ১৫৮-৫৯, ১৬১, ৩৫৭
ভাগবত-তাৎপর্য—৪১
ভাবার্থদীপিকা—১৩৬

মৎস্যপুরাণ—১২, ৪৬

মন্ত্রভাগবত—২০

মহাভারত—১-২, ৪, ৬-১৫, ১৮, ২০, ২৪-২৫, ৩০, ৪৫, ৬৭-৬৮, ৮৩, ১০৮, ১১২, ১২২, ২০৩-০৪, ২৬১

মহাভাষ্য—৪, ৩১

মাণ্ডুক্য উপনিষদ—৯২

মাধুর্যকাদম্বিনী—১০০, ১৩০

মালবিকাগ্নিমিত্র—২৪৭

মুণ্ডক উপনিষদ—১৩৩, ১৪৪, ১৫১

মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র—২০৫, ২১০

রসবিলাস—১৩০

রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—১২১, ১২৪, ৩২৬

রাধাবিপ্রলম্ভ—৩৯

রাধাতন্ত্র—২৬৮

রাসোল্লাসতন্ত্র—২৬২

রুদ্রযামল—১৯৫, ২১৫, ২২১, ২২৪

লঘুতোষণী—৩৫৩, ৩৬০

লঘুভাগবতামৃত—১০৫, ১০৮-০৯, ১১৩, ১৮১-৮৩, ২২৩, ২৮৪, ৩৫৬

ললিতমাধব—৩৫২-৫৪, ৩৫৭

লিঙ্গপুরাণ—২৩, ৩২২

লোচন—৪৮

লোচনরোচনী—২৭৫, ৩৫৩-৫৫, ৩৫৯-৬০

শতপথব্রাহ্মণ—১২, ২৯

শতপথসংহিতা—২৫

শাণ্ডিল্যসূত্র—১৫-১৬

শাণ্ডিল্যসংহিতা—৯২

শারীরকভাষ্য (শঙ্করভাষ্য)—৮৯, ১৮৬

শিশুপালবধ—১৫৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—৮২-৮৩

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—৮৪

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—৮৩

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—৯১, ৯৭-৯৮, ১১২, ১১৭, ১৭৭, ১৮২, ১৮৫, ১৮৯, ১৯২-৯৩, ২০৫, ২১৭, ২২৫, ৩৬০

শ্রীভাষ্য—৩৫, ৩৮, ৪০, ১৬২

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—২১, ১৩৩, ১৬৫

ষট্‌সন্দর্ভ—৮৮, ৯০, ৯১, ৯৭-৯৮, ১০৮, ১১২, ১১৫, ১১৭, ১২৭, ১৪৯-৫০, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৮-৫৯, ১৬১, ১৭২, ১৭৭, ১৮২, ১৮৫, ১৮৯, ১৯২-৯৩, ২০৫, ২১৭, ২২৫, ৩২৩, ৩৫৩, ৩৫৭, ৩৬০

সংকল্পকল্পদ্রুম—১০০, ২৮৫, ৩৫৯

সংহিতা—২৩, ৩২, ৪৫, ৪৭, ৮২, ৯২, ৯৬, ৯৮, ১১০, ১১৪, ১৩০, ১৩৬ ৩৭, ১৭০, ১৭৬-৭৭, ১৮১-৮২, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ২০৬-০৭, ২১১-১২, ২১৬, ২১৯, ২৩২, ২৬১, ২৬৮, ২৭১, ২৮০

সঙ্গীতরত্নাকর—২৪৭

সদুক্তিকর্ণামৃত—৪৯, ৮২

সম্মোহনতন্ত্র—৪৫, ৪৭

সর্বদর্শনসংগ্রহ—৪২

সর্বসংবাদিনী—১০৮, ১১৫, ১৪২, ১৭০-৭১

সাম্বপুরাণ—২৩

সারসংগ্রহ—৩৬০

সাহিত্যদর্পণ—২৪৭

সিদ্ধান্তজাহ্নবী—১৪৯

সিদ্ধান্তরত্ন—বেদান্তকামধেনু দ্রষ্টব্য

সিদ্ধিত্রয়—৩৯

সূতসংহিতা—২৩

সৌপর্ণশ্রুতি—২৯২

স্কন্দপুরাণ—২, ৮২, ৯৬, ১৭৬, ২০৮, ২১০

হরিবংশ—২-৩, ৯-১০, ৪৫, ৬৭-৭৬, ৭৮-৮০, ৮২-৮৩, ২০৫, ২০৮-০৯,
২৩০, '২৪৭-৪৮, ২৬৭, ৩৫১

হরিভক্তিবিলাস—১৭৭

হর্ষচরিত—৩২, ৪৭

হারীতসংহিতা—২৩

নাম-সূচী

[ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নামের তালিকা]

অর্জুন—৪, ১১৩, ১১৬, ১২৩, ১২৫, ১৩৩-৩৪, ১৪০-৪১, ১৬০, ১৭১-৭২, ২৩৬, ২৪৪, ২৬৪, ২৯৪, ৩২৬

অণ্ডাল (গোদাম্বাজী)—৩৪-৩৫, ৩৮

অদ্বৈতাচার্য—৪৪, ৮১

অনাথপিণ্ডদ—২৫২

অনিরুদ্ধ—১৭-১৮, ১০৮-১০৯, ১৮৩, ১৮৮, ২১১

অভিনবগুপ্ত—৪৮

অমরসিংহ—৮৯

অলিভার লজ—১১৫-১১৬

অশ্বঘোষ—৯

আনন্দবর্ধন—৪৮

আর্যভট্ট—১১

ইন্দ্র—৪, ২১, ২৯, ১২১, ১২৬, ১৩৫, ২০৫

ঈশ্বরপুরী—৮১

উদ্ধব—৮৮, ১৭৩, ১৭৮, ২২৩-২৫, ২২৭, ২২৯-৩৮, ২৪০, ২৬৭, ২৭১, ২৮৪-৮৫

উমাপতি ধর—৪৪, ৮০

কল্হন—১১-১২

কপিল—৩৭, ১১০

কবিকর্ণপূর—১০০, ১৭৬, ২৮৫, ৩২৪, ৩৬০

কবীর—৪১

কালিদাস—৫৪, ২৪৭

কুব্জা—২৩১, ২৭৩, ৩২০

কুমারিল—২৩

কৃষ্ণ-আঙ্গিরস—৪, ৬

কৃষ্ণদাস—২০৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (চৈতন্যচরিতামৃতকার)—৪৩, ৪৫, ১০০, ১১২, ১৩৭, ১৫৪, ১৫৬, ১৬৬, ১৮২, ১৯৫, ২০৪, ২০৬, ২০৯, ২১১, ২৫৫, ২৬০, ২৬২, ২৬৪, ২৭১, ২৭৪-৭৫, ২৮১, ৩০৬, ৩১২, ৩১৭, ৩২৪, ৩৩১-৩২, ৩৩৮, ৩৬০

কৃষ্ণ-বাসুদেব (বাসুদেব-কৃষ্ণ)—৪, ৬-৭, ১২, ১৪-১৫, ২০-২২, ২৮-৩১, ৪৫, ১৯৫

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—২৭

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—২৫৮

ক্ষেমেন্দ্র—৪৯

গদাধর—৪৩, ২৮৫

গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক—৯৭

গোপকৃষ্ণ (গোপালকৃষ্ণ)—১০, ১১, ১৩, ২৫, ৪০

গোবিন্দ—৩৫, ৭২, ১৩৭

গোবিন্দ (ভৃত্য)—৩৩৫, ৩৩৭

গোবিন্দদাস—৮৪

গৌড়পাদ—৯২

ঘোর-আঙ্গিরস—৪, ৭, ৩০

চণ্ডীদাস—৪৪, ৮০-৮২, ৮৪, ৩৩৪, ৩৪১

চন্দ্রশেখর—২৮৫

চন্দ্রাবলী—২৬৯, ২৭৯, ৩৫২

চার্বাক—২৯০

চৈতন্যদেব (মহাপ্রভু)—৩, ৩৮, ৪১-৪৪, ৫২, ৮০-৮৪, ৮৭, ১১৫, ১২৭, ১৪৯, ১৫৪, ১৬০, ১৬৪, ১৭০-৭১, ২১৫, ২৭০, ২৮৫, ২৮৭, ২৯১-৩০১, ৩০৫-০৬, ৩১৩, ৩১৭, ৩১৯, ৩২১-২৩, ৩২৬-৪৪

জয়দেব—৪৪, ৪৬, ৮০, ৮২, ১১২, ২৯৯, ৩৩৯, ৩৪১

জয়বন্ত—৪৯

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৬

জীবগোস্বামী—৪৪, ৪৭, ৮৮, ৯০-৯২, ৯৬-১০০, ১০৮, ১১২, ১১৪-১১৫, ১১৭-১১৮, ১২৭, ১৩০, ১৩৭, ১৪১-৪২, ১৪৯-৫১, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৮-৫৯, ১৬১, ১৬৭-৭২, ১৭৭, ১৮০, ১৮২, ১৮৫, ১৮৭-৮৯, ১৯২-৯৫, ১৯৭-৯৮, ২০৫-০৬, ২১৭-১৮, ২২০, ২২৫, ২৩০, ২৬০, ২৭০, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ৩০১, ৩২৩, ৩৫২-৬০

জ্ঞানদাস—৮৪

জ্ঞানেশ্বর—৪২

তুকারাম—৪১-৪২

তুলসীদাস—৪১

দীনেশচন্দ্র সেন—২০৯

দেবাচার্য—১৪৯

নগেন্দ্রনাথ বসু—২০৮-০৯

নম্মাড়্বার (শঠকোপ)—৩৪-৩৫, ৩৮-৩৯

নরহরি চক্রবর্তী—২০৮

নরোত্তম দাস—৮৫

নাথমুনি—৩৯-৪০

নানক—৪১

নাপ্পিন্নাই—৫০

নামদেব—৪২

নারদ—৮, ২৫-২৬, ১৯১, ১৯৪, ২১৮, ২২১-২২, ২২৯, ২৩১-৩২, ২৮৫

নারায়ণ—৬, ১৮, ২৬, ২৮-২৯, ৩৫, ৪০, ৪২, ১১৭, ১৫০, ১৫৫, ১৮১-৮৩ ২১১, ২৭২

নারায়ণ-বিষ্ণু (বিষ্ণু-নারায়ণ)—৪, ২৮-৩০

নিত্যানন্দ—৪৪, ২৮৫

নিম্বার্ক—৩৯, ৪২-৪৪, ৫০, ৫২, ১৬৩, ২৮২, ২৯১

নীলকণ্ঠ—২০, ২৪৭

পতঞ্জলি—৪, ৬, ১৬, ২৫, ৩১

পরমহংসদেব—২৩৮

পরশুরাম—১১০, ১১৮, ১৮১

পাণিনি—৪, ৬, ২৫

পার্শ্বনাথ—২৬

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—১৪৯

প্রদ্যুম্ন—১৭-১৮, ১০৮-০৯, ১৮৩, ২১১, ২৩১

প্রবোধানন্দ সরস্বতী—২১০

প্রমথনাথ তর্কভূষণ—১৯-২০, ২৯২-৯৩

বঙ্কিমচন্দ্র—৯, ১২, ৪৬. ১১৫

বরাহমিহির—১১-১২, ৩২

বলদেব বিদ্যাভূষণ—১১৩, ১২১

বলরাম (সংকর্ষণ)—৪-৫, ১৭-১৮, ৩৩, ৬৪, ৭০-৭১, ৭৭, ৯৭, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১২৫, ১৮৩, ১৮৫, ২১১, ২২০, ২২২, ২৩১, ২৮০

বলরামদাস—৮৪

বল্লভাচার্য—৪১-৪৩, ৫২, ৯০; ৯৩, ১৬১, ১৬৩, ২৮২, ২৯১

বল্লালরাজ—৪০

বাণভট্ট—৩২, ৪৭

বাদরায়ণ—২৪, ৮৯

বামন (আলঙ্কারিক)—৪৮

বাসুদেব—৪-৫, ১২-১৩, ১৭-১৮, ২৩, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৪৪, ১০৮-০৯, ১২২, ১২৫, ১৫০, ১৫৩, ১৮৩, ১৮৮, ১৯:, ১৯৪-৯৫, ২১১, ২৩১, ২৪৮

বাসুদেব ঘোষ—৩৪১

বিট্‌ঠলনাথ—৪৩, ৯৩, ৯৬

বিদ্যাপতি—৪৪, ৮০-৮৩, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৪১

বিবেকানন্দ—২৩৮, ২৬৪

বিল্বমঙ্গল (লীলাশুক)—৮২, ৮৮. ১২৪, ৩৪১

বিশাখা—২৬৯, ৩০৪

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—১০০, ১২১, ১২৪, ১৩০, ১৪৩-৪৪, ১৯৮, ২২২, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ৩০১, ৩২৪, ৩২৬, ৩৫৩, ৩৫৫-৫৯

বিষ্ণু—৪, ৬, ১৭, ২৬, ২৮-৩১, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৫১, ৬৭, ৮৭-৮৮, ১০৪, ১৩৪-৩৫, ১৩৭-৩৮, ১৪২, ১৪৮, ১৫২, ১৫৮, ১৬৩, ১৭১, ১৭৬, ১৮০, ২০৬, ২১৮, ২৩০, ২৬৯

বিষ্ণু-কৃষ্ণ—৩০-৩১

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—৫৩

বিষ্ণুস্বামী—৪২

বুদ্ধদেব—১২, ১৪, ২১, ২৬, ১১১

বৃদ্ধগর্গ—১১-১২

ব্যাসদেব—২, ৮, ৬৮, ৯৫, ১১০, ১৭২-৭৩, ২৬১

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—২৫-২৬, ৫৩

ভট্টনারায়ণ—৪৮

ভরদ্বাজ—২৪

ভাণ্ডারকর—১৬, ২৫-২৬, ৩৬, ৫৩

ভানুজী দীক্ষিত—৮৯

ভাস—৯, ৮২

ভাস্বানি—২৫২

ভৃগু—২৪

ভেজ্জল—৪৯

ভোজবর্মন্—১০

মধুসূদন সরস্বতী—৯৪, ১৩৭, ১৯৯

মধ্বাচার্য (আনন্দতীর্থ)—৩৯, ৪১, ৫২, ৯০, ১৬১, ১৬৩, ১৮৭ ৮৮, ২৯১

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী—১১৬

মাঘ—১৫৭

মাধব—৫

মাধব কবীন্দ্র ভট্টাচার্য—২৩২

মাধবাচার্য—(সংশোধন ও সংযোজন দ্রষ্টব্য)—৪২

মাধবেন্দ্র পুরী—৪৪, ৮১

মালধর বসু—৮৩
মীরাবাঈ—৩৫, ৪১
মেগাস্থিনিস—৫-৬, ৩১
যজ্ঞ শাতকর্ণী—৩৩
যতীন্দ্র রামানুজদাস—৫৩
যামুনাচার্য—২৩-২৪, ৩৯-৪০
যীশুখৃষ্ট (—ধর্ম)—১০, ২৪-২৮, ১১৬, ২৩৮
রঘুনাথ দাস—৩৩২
রঘুনাথ ভাগবতাচার্য—৮৪
রত্নগর্ভ—৩৫১
রবীন্দ্রনাথ—১৩, ১৪৫, ২২৬, ২৫২, ২৫৭
রমাপ্রসাদ চন্দ—১২, ৫৩
রাজেন্দ্রলাল মিত্র—৩০
রাধা (—ভাব)—৩৮, ৪২-৫০, ৭৮, ৮০, ১২৯, ২১৩, ২১৬, ২৫৫, ২৬৯-৭১,
২৭৭-৮২, ২৮৪-৮৫, ২৮৭, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৬-০৭, ৩১০-১১,
৩১৪, ৩১৬, ৩২৪, ৩৩১-৩২, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২-৪৩,
৩৫১-৫২, ৩৫৯
রাধা কুমুদমুখোপাধ্যায়—১২
রাধাকৃষ্ণণ—২৪, ৫৩
রাধাগোবিন্দ নাথ—১৫৫
রামচন্দ্র—৩৪, ৪১, ১১৮, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ১৯৬-৯৭, ২৫৫
রামচন্দ্র (আলঙ্কারিক)—৪৯
রামানন্দ—৪১
রামানন্দ রায়—৪৪, ৮৯, ২৮৭, ২৯৩-৩০১, ৩০৩-৩০৬, ৩১০, ৩১৩, ৩৩২,
৩৩৪, ৩৩৬
রামানুজ—১৬, ১৯-২০, ২৩, ২৭-২৮, ৩৫, ৩৮-৪২, ৫২, ৯০, ১৪০,
১৬১-৬৪, ১৯০, ২৯১, ২৯৩, ৩৫৭
রুক্মিণী—৪১, ১২৩, ১২৫, ২০৪, ২৬৮, ২৭২-৭৪, ২৭৭, ২৭৯
রূপ কবিরাজ—৩৬০

রূপ গোস্বামী—৪৪-৪৬, ১০০, ১০৫, ১০৮-১১১, ১১৩, ১২১, ১৫৪, ১৮১, ১৮৩, ২১১, ২১৫, ২২২, ২২৭, ২৩০, ২৩২, ২৪১, ২৬৮, ২৭২, ২৭৮, ২৮৪, ২৯২, ৩০৪-০৫, ৩১০, ৩১৫-১৭, ৩২০-২১, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৩৫১-৫৩, ৩৫৬

লক্ষ্মী – ১৭, ২৩, ৪২, ৪৫, ৫০, ১২২, ১৯০, ২১১, ২৩১, ২৬২, ২৭২, ৩১৩, ৩২৬, ৩৫৪

লক্ষ্মীধর—১৭৭, ১৯৫

লক্ষ্মী-নারায়ণ—৪০

ললিতা—২৬৯, ৩০৪, ৩১১

লোচন- ৩৮

শঙ্করাচার্য—২৩, ৩৮-৪১, ৪৩, ৮৯-৯০, ৯৪, ১৪৮-৪৯, ১৬১-৬২, ১৬৩, ২৯৩

শশিভূষণ দাশগুপ্ত—২৮৩

শাণ্ডিল্য—২৩

শুকদেব—১৮০, ১৯৪, ২৩০, ২৪৩-৪৬, ২৫৯, ২৬১, ২৬৭-৬৮ ৩২২, ৩২৬, ৩৫৪-৫৭

শৌরী—৫,

শ্রীঅরবিন্দ—১৯০, ১৯৭

শ্রীদেবী—১৭, ২৩

শ্রীধর দাস—৪৯

শ্রীধরস্বামী—৪২, ৫২, ৯৩, ১৩৬, ১৫৬, ১৮৩, ১৮৯, ১৯৬, ২৪৬, ২৬১

শ্রীনাথ চক্রবর্তী—১৭৬, ২৭০

শ্রীবাস—২৮৫

শ্রীরমাপতি—৪১

সত্যেন্দ্রনাথ (দত্ত)—৩

সনাতন গোস্বামী—৪৪, ৮৭, ৯১, ১০০, ১ ৭, ১৫৪, ১৬০, ১৭৭, ১৯৫, ২০৫, ২০৬, ২৪৭, ২৬৮, ২৭০-৭১, ৩১৭, ৩১৯, ৩২৮-২৯, ৩৫১

সার্বভৌম (বাসুদেব)—৪৪

সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য—২৪৯

সুকুমার সেন—২০৯

সুদেব মিশ্র—১৩০
সূর্য—২৮-৩০
স্বরূপ দামোদর—৪৪, ৮১, ৩৩২-৪০, ৩৪৩
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—৯৭
হাল (সাতবাহন নরপতি)—৪৭-৪৮, ৮২
হেমচন্দ্র (আলঙ্কারিক)—৪৯,৮৯
হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী—১১-১২, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০, ৫৩

বিবিধ

অংশাবতার—৪, ৯১, ১০৯-১১, ১১৩-১১৫, ১৮২

অংশাংশ অবতার—১০৯-১১

অংশুমতী (নদী)—৪, ৭

অক্রুর—১৯০

অঘাসুর (-লীলা)—১২৫, ২৬৮

অচিন্ত্যতত্ত্ব—১৮৩

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ—১৯, ৪৪, ১৬১, ১৬৪-৬৫, ১৬৮-৬৯

অদ্বয়তত্ত্ব (অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব)—১৪৮, ১৫৪-৫৭, ১৫৯-৬১, ১৬৩-৬৪, ১৭২-৭৩, ১৭৬, ১৯৯, ৩১১

অদ্বৈতবাদ—৩৮-৪১, ৯০, ১৫৪, ১৬১-৬২, ১৯০

অধিরূঢ়ভাব—২৭৫-৭৮

অনুক্রমণী—৪

অনুবাদ—১৮৫-৮৬

অনুরাগ—২৭৪-৭৫, ৩০১, ৩২৯, ৩৫৮

অন্তর্দশা—৩৪০

অন্তর্যামী—১৮-১৯, ১৫০-৫১, ১৫৫, ১৭৯, ২৪৪, ২৫০, ২৫-

অন্তরঙ্গ সাধন—২৯৪

অন্নকূট—৮৪

অপৌগণ্ড—৩৪৯-৫১

অপ্রকট (-লীলা)—৭৮, ৮৫, ৯৭-১০১, ১১৭, ২২২-২৫, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৬০

অপ্রপঞ্চ—১০৪

অবতার—৪, ৩৪, ৯১, ১০৪-০৭, ১০৯-১১১, ১১৫, ১১৭, ১৮০, ১৮২

অভ্যারোহতত্ত্ব-২৩৭

অভ্যুপগমবাদ—৩৫৫

অর্থ—২৮৮, ৩৩১

অষ্টসিদ্ধি—১১৮

অহংগ্রহোপাসনা—৩২৭

আড়্বার (আলোয়ার)—১৬, ২৮, ৩৩-৩৯, ৪৯-৫২, ৮২, ২৪১, ৩০৫
আত্মবিদ্ (সম্প্রদায়)—২২
আত্মারাম—২৬০-৬১
আন্তর (অভ্যন্তর) সাধন—৩১৬-১৭, ৩২৭-২৮
আবেশ অবতার—১১০
আবেশরূপ—১০৫-১০৬
আভীর—১০
আরোপসিদ্ধা (ভক্তি)—২৯৪
আশ্রয়-(তত্ত্ব)—১৩২-৪৫, ১৭৮
উত্তমা ভক্তি—২৯৫-৯৬, ৩০৮
ঐকান্তিক—১৫, ২৫-২৬, ৩৬, ১০৮, ২৩৬
একেশ্বরবাদ—১৪, ২০-২২, ৩১, ৫১
ঐশ্বর্য (রূপ, গুণ, লীলা)—২, ৩৪, ৬৮, ৭৬, ৭৯-৮০, ৮৩, ৮৫, ১১৫-১১৬
১২১-৩০, ১৩২, ১৭৯, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৭, ২৪৫-৪৬,
২৮০-৮১, ২৯০
ঔপনিষদ—১৫৬
কংসবধ (-লীলা)—১২২-২৩, ১২৭, ২২২, ২২৫
করুণা—১২৭-২৯, ১৯৬-৯৭
কলাবতার—১১০
কাত্যায়নীব্রত—৭৫, ২৪৯, ২৫১, ২৫৩
কাম—২৮৮, ৩০১-০২; ৩৩১
কালিয় (-দমন)—১০, ৬৯-৭১, ৭৬-৭৭, ৮২, ৯৪, ১২২-২৩, ১৯৬, ২১০
কৃষ্ণলোক—৪৩, ২০৪, ২১৭-১৮, ২২৫
কর্ম—১৯০
ক্ষেত্রজ্ঞ—১৫০
খাণ্ডিক্য-কেশিধ্বজ—১৩৪, ১৩৮
গুণাবতার—১০৬-০৭, ১০৯, ১৮০
গোপীদের দশা—১৭

গোকুল (ব্রজ, বৃন্দাবন)-লীলা—২-৪, ৮, ২৫, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৫১-৫২, ৬৮, ৯৬, ১০০, ১২২, ১২৪-২৭, ১৪১, ১৯০, ১৯৬-৯৭, ২০৩-২১৩, ২১৫-১৭, ২২৩-৩০, ২৩২, ২৩৭-৩৮, ২৪০, ২৫১, ২৫৫, ২৫৮, ২৮৪, ৩১৩, ৩২৫, ৩৩৮, ৩৪১-৪৪, ৩৫৪, ৩৬১

গোবর্ধন(-ধারণ)—৮, ৪৯, ৭১-৭৪, ৭৭-৭৮, ৮৪, ১২৩, ১২৬, ২০৫-২১০, ২১৬-১৭, ২৭৮, ৩৩৫-৩৬

গোলোক—২০৩-০৭, ২১৭, ২১৯, ২২৫

গৌড়ীয় বৈষ্ণব—১৯, ৩৮-৩৯, ৪৩-৪৬, ৫০, ৫২, ২৮৪, ২৮৭, ২৯১, ৩০৬ ৩৫২, ৩৬০

ঘোষুণ্ডি—৫-৬, ৩১

চটক (পর্বত)—৩৩৫

চতুর্বর্গ—২৩২, ২৮৭-৮৮

চতুর্ব্যূহ (-তত্ত্ব,-পূজা,-রূপ)—১৬-১৮, ২৩, ৩১, ১০৭-০৯, ১৮২, ২১১ ১

ছলিক—২৪৭-৪৮

ছালিক্য—২৪৮

জরাসন্ধ (-বধ)—৮

জীবশক্তি (তটস্থশক্তি)—১৬৪-৬৫, ১৭০, ১৯৮, ২৭২

জীবাত্মা—৩৯, ১৫১

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—২৯৫

জ্ঞানশূন্যাভক্তি—২৯৫-৯৬

তদেকাত্মরূপ—১০৫-০৬

তন্ময়—১৫

তামিল পাণ্ডুয়—৩৪

ত্রয়ীময়—৭১

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি—১৮

ত্রিমূর্তি—১০৫, ১৮০

দন্তবক্র (-বধ)—২২৩

দাবানলভক্ষণ—১২৫
দামবন্ধন—১২৩, ১২৮
দাস্য—৩৪, ৪৩, ১০০, ১২৩, ২৩৫, ২৪০, ২৯৬-৯৮, ৩০১, ৩১৩, ৩১৫, ৩২১, ৩২৬-২৭, ৩৩০
দিব্যজীবন—১৯৭
দিব্যপ্রবন্ধ—৩৫, ৩৮, ৫০
দ্বারকা (-লীলা)—৪, ৯৬, ১২৩-২৬, ১৪১, ১৮২, ২০৪, ২১০-১১, ২২৩, ২৭২
দ্বৈত (ভেদ)-বাদ—৪১, ১৬১, ১৬৩, ২৯১
দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ)-বাদ – ২০,৪২, ১৬১, ১৬৩
দ্রাবিড়বেদ – ৩৫
ধর্ম—২৮৯, ৩৩১
ধারণা—১৩৮-৩৯
নবদ্বীপ লীলা – ৩৪২, ৩৪৪
নববৃন্দাবন – ৩৫২
নানাঘাট – ৫-৬, ৩৩
নামসংকীর্তন – ৩১৯, ৩২১-২৩
নায়নমার(নায়নার) – ৩৩,৩৮
নায়িকা (কান্তা)-ভাব – ৩৪, ৩৮
নিত্যকান্তা – ২৬৯
নিত্যদাস – ৩০৩, ৩৪৩
নিত্যপরকীয়া – ৩৫৫
নিত্যপ্রেয়সী – ২৬৯
নিত্যলীলা – ৩৫৪
নিত্যসখী – ৩০৪
নিত্যসিদ্ধ—২৯১, ৩০৩, ৩১১, ৩১৪-১৫, ৩৪৪
নিত্যস্থিতি—২১৯-২১, ২২৪, ২২৯
নিত্যস্বকীয়া—৩৫৭, ৩৬০
নৈয়ায়িক—২৯১
নৈরুক্ত (সম্প্রদায়)—২২
পঞ্চরাত্র (পাঞ্চরাত্র, পাঞ্চরাত্রিক)—১৫-২০, ২৩-২৪, ৪০, ৪৫, ৮৫, ১০৮, ১৭৯, ১৯৫, ২৯১
পঞ্চরূপ—১৭-১৯
পরকীয়া—৩৪, ৩৮, ২৪১-৪২, ২৪৬, ২৫৯, ২৮২, ৩৫১-৫৩, ৩৫৫, ৩৫৮-৬১
পরতত্ত্ব – ১৭৮-৭৯, ১৮৪-৮৫

দ্বারকা (-লীলা)— ৪, ৯৬, ১২৩-২৬, ১৪১, ১৮২, ২০৪, ২১০-২১১, ২২৩
দ্বৈত (ভেদ)-বাদ—৪১, ১৬১, ১৬৩, ২৯১
দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ)-বাদ—২০, ৪২, ১৬১, ১৬৩
দ্রাবিড়বেদ—৩৫
ধর্ম—২৮৯, ৩৩১
ধারণা—১৩৮-৩৯
নবদ্বীপলীলা—৩৪২, ৩৪৪
নববৃন্দাবন—৩৫২
নানাঘাট—৫-৬, ৩৩
নামসংকীর্তন—৩১৯, ৩২১-২৩
নায়ন্‌মার (নায়নার)—৩৩, ৩৮
নায়িকা (কান্তা)-ভাব—৩৪, ৩৮
পরমাত্মা—৩৯, ৯০, ১০৭, ১১৯, ১২৫, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৮, ১৫০-৫২, ১৫৪-৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৭২, ১৭৭, ২১৯, ২৪৪, ২৫৬
পরাবস্থা (অবতার)—১১০
পরিকর—৯৬, ১১৯, ১২৩, ১২৬, ১৬৮, ১৭০, ১৯২, ২১০, ২১৬, ২২৩, ২৪০, ২৮৪-৮৫, ৩০৩, ৩১১, ৩১৩ ১৬, ৩২৪, ৩২৮-২৭, ৩৫৭ ,
পরিপূর্ণ (অবতার)—১১০
পরিভাষা বাক্য—১৮৮-৮৯
পরোক্ষবাদ—১৭৩
পাশুপত (দর্শন)—২৩
পুরলীলা—১২৪, ১২৭
পুরুষ—৮৮, ১৭৯, ১৮১ ৮২, ১৮৬, ১৯০
পুরুষাবতার—১০৬-১০৭, ১০৯, ১৮০
পুরুষার্থ—১৬০, ২৮৮-৯১, ২৯৩-৯৪, ৩২২, ৩৲
পুরুষোত্তম—২২, ৩৭, ১১২, ১৪৯, ১৬২, ১৮৩, ১৮৯-৯০, ২০৩, ৩৫৬
পুষ্টিমার্গ—৪৩
পূর্ণবাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ—১৭৯, ১৯৫
পূতনা (-বধ)—৮, ১০, ৬৮, ৭৬, ৯৪, ১২৩, ১৯৬-৯৭, ২১০, ২১৭-১৮

পৌগণ্ড—৩৪৯-৫০
পূর্ণাবতার—১১০
প্রকট (-লীলা)—৮৫, ৯৭-১০১, ১১৭, ২২২-২৪, ২৫৬, ৩৫২-৫৫, ৩৫৬-৫৭
প্রত্যাহার—১৩৮-৩৯
প্রপত্তিবাদ (শরণাগতি)—১৯, ৫৯, ৯০, ২৩৬-৩৭, ২৯৪
প্রাণায়াম—১৩৮-৩৯
প্রাভব (অবতার)—১১০
প্রেম—২৭৪-৭৫, ২৯১, ৩২৮-২৯
প্রেমবিলাসবিবর্ত—৩০০-৩০১
প্রেমভক্তি—২৩৫-৩৭, ৩০৮, ৩২০, ৩২২, ৩৩১, ৩৫১
বস্ত্রহরণ (-লীলা)—৯, ৭৫, ৭৮, ৮২, ২১০, ২৪৯, ২৫১-৫৩
বহিরঙ্গ (বাহ্য) সাধন—২৯৪-৯৫, ৩১৬-১৮
বাৎসল্য—৩৪, ৪৩, ১০০, ১২৩-২৫, ১৯৩-৯৪, ১৯৬, ২৪০, ২৯৭-৯৮, ৩০১,
৩১৩-১৫, ৩২১, ৩৩০
বাসুদেববর্গ—৪
বিজাতীয় ভেদ—১৫৯, ১৬২-৬৪, ১৭০, ১৭২
বিভব (অবতার)—৩৪, ১১০
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—২০, ৩৫, ৩৯-৪২, ১৬১-৬২
বীর (-পূজা, -বাদ)—১৬
বেণুগীত—২৪২, ২৪৯-৫১
বেসনগর—৫-৬, ৩১
বৈকুণ্ঠ—২০৫, ২১১-১২
বৈধীভক্তি—৩০৮, ৩১৩, ৩১৭-১৮, ৩২৬
বৈষ্ণব (-ধর্ম, -সম্প্রদায়)—১৪-১৫, ১৯, ৩১, ৩৩-৩৪, ৩৬-৩৯, ৪১-৪৬,
৪৯-৫২, ২৭০, ২৮৪, ২৯১, ৩০৬, ৩৫২, ৩৬০
বৈষ্ণব পুরাণ—৬৭, ৭৩-৭৪
বৌদ্ধ (-দর্শন, -ধর্ম, -সম্প্রদায়)—২৩, ২৮, ৩২-৩৩, ৩৮, ২৯১, ২৯৩
ব্রজবিধু (বৃন্দাবনচন্দ্র)—২১৩

ব্রহ্ম (পর-, -তত্ত্ব)—১৪, ১৭, ১৯, ৪৩, ১৩৩-৩৬, ১৩৯-৪৪, ১৪৮-৫০, ১৫২, ১৫৪-১৬৬, ১৬৮-৭২, ১৭৭-৭৯, ১৮৪, ১৮৫, ১৯০, ১৯২, ১৯৬-৯৯, ২০৩, ২১২, ২১৫-২১৬, ২১৯, ২৩৩, ২৬০, ২৬৩, ২৭২

ব্রহ্মমোহন (-লীলা)—১৯৭

ব্রহ্মলোক—২০৩

ব্রহ্মসম্প্রদায়—৪১

ভক্তি (-তত্ত্ব, -বাদ)—২০, ২২, ৩৭, ৩৯-৪০, ২২৯-৩০, ২৩২-৩৭, ২৪০, ২৬৭, ২৯১-৯৬, ৩০৬, ৩০৮, ৩১০-১৪, ৩২০, ৩২২-২৩, ৩২৬, ৩২৯-৩১

ভগবান, ভগবৎ (-তত্ত্ব)—১৪-১৫, ২০-২১, ১৪৮, ১৫০, ১৫২-৫৭, ১৫৯-৬১, ১৭২, ১৭৯, ১৮১-৮৬, ১৮৮, ১৯০-৯১, ১৯৬-৯৭, ১৯৯, ২০৩, ২১৬-১৭, ২২৯-৩০, ২৩৩-৩৪, ২৩৭, ২৪০-৪১, ২৪৬, ২৪৮, ২৫০, ২৫৩-৫৫, ২৫৯, ২৬২-৬৪, ২৬৯-৭০, ২৯৪-৯৬, ২৯৮, ৩০৬, ৩১১, ৩২২, ৩৫১, ৩৫৯

ভাগবতধর্ম—৩, ১৫, ২০-২৮, ৩০-৩৪, ৪৪, ৫১

ভাগবতশ্রবণ—৩১৯, ৩২৩-২৪

ভাব (মহাভাব)—২৭১, ২৭৪-৮০, ৩০০, ৩২৮-৩০, ৩৫৫, ৩৫৮-৫৯

ভাবভক্তি—২৩৫, ২৩৭, ৩০৮

ভেদ (-তত্ত্ব)—১৬১-৬৪, ১৭০-৭২

ভ্রমরগীত—২২৩

মঞ্জরী—৩১৪

মথুরা (-লীলা)—৪-৫, ১৪, ৯৬, ৯৯, ১২৩-২৪, ১২৬, ১৪১, ২০৩-০৪, ২০৭-০৮, ২১০-১১, ২১৭-২০, ২২২-২৩, ২৭২, ৩২৫

মথুরাবাস—৩১৯, ৩২৫

মধুর, কান্তা, শৃঙ্গার (-রস, -প্রেম, -ভাব, -লীলা)—৪৩, ১২৩-২৫, ১৯৬, ২৪০-৪১, ২৬৭, ২৭২, ২৯৭-৯৮, ৩০৫, ৩১৩, ৩১৫, ৩২১, ৩৩০, ৩৫২

মন্বন্তরাবতার—১০৬, ১০৯-১০, ১১৭

মহাকাল পুরাখ্যান—১৮৭
মাদন—২৭৮-৮০, ৩৪২, ৩৫৫
মাধুর্য—২, ৩৪, ৬৮, ৭৬, ৭৯-৮০, ৮৩, ৮৫, ৯৯, ১০৯, ১২১-২৪, ১২৭-৩০,
১৩২, ১৯৭, ২১০-১১, ২৭৬, ২৭৮, ২৯৮
মায়া (বহিরঙ্গা) -শক্তি—১৬৪-৬৫, ১৭০, ২১৭-১৮, ২৭২
মিশ্রভক্ত—২৩৪-৩৫
মিশ্র (আরোপসিদ্ধা) -ভক্তি—৩০৮
মীমাংসা দর্শন—২৩৬, ২৯১
মৃদ্‌ভক্ষণ (-লীলা)—১২৬
মোক্ষ (মুক্তি)—৩৭, ৪১, ৭৭, ২৯০-৯৩, ২৯৫, ৩৩১, ৩৫১
মোদন—২৭৮-৭৯
মোরা (শিলালেখ)—৫
মোহন—২৭৯
যজ্ঞপত্নী (-কাহিনী)—২৫৬, ৩২০
যমলার্জুনভঙ্গ—১৭৯, ২১০
যাজ্ঞিক (সম্প্রদায়)—২২
যাদব—৫-৬, ১৪, ৫১, ২৩১
যুগল (-তত্ত্ব, -লীলা, -উপাসনা)—৪৩, ২৮২-৮৪, ৩০৪
যুগনদ্ধ—২৮৩
যুগাবতার—১০৬, ১০৯-১০, ১১৭
যোগদর্শন (পাতঞ্জল)—২১, ২৩, ১৩৮, ২৯১
যোগমায়া—৯৩, ১৮১, ২০৫, ২৪৫-৪৬, ২৫৪, ২৬'
রতি (ভাব)—৩৪, ৩৮, ২৬৭, ২৭২-৭৫, ২৭৭, ৩০১, ৩১৩-৩১৫, ৩২১,
৩৩০, ৩৫৫
রাগাত্মিকা—৩১০-১৪
রাগানুগা—৩০২, ৩০৮, ৩১০, ৩১২-১৮, ৩২৪, ৩২৬-২৮, ৩৩০
রাসলীলা—৯, ৭৪-৭৬, ৭৮, ৮২-৮৩, ৮৫, ৯৩, ১২৩-২৪, ১৩০, ২১০, ২২৬,
২৪০, ২৪২-৪৪, ২৪৬-৪৮, ২৫৩, ২৫৫-৬৪, ২৬৭-৬৮, ৩১৩,
৩৩৬, ৩৩৯, ৩৫১, ৩৫৬-৫৮

রুদ্র সম্প্রদায়—৩৯
রূঢ় ভাব—২৭৫-৭৭
লীলা—২-৩, ৮, ২৫, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৫১-৫২, ৬৮, ৭৮, ৮৫, ৮৭, ৮৯-১০১, ১১৪, ১১৭, ১২১-২৭, ১৪১, ১৯৬-৯৭, ২০৩-২১৩, ২১৬-১৭, ২১৯-২০, ২২২-২৫, ২২৭, ২৩২, ২৪০, ২৪৫-৪৭, ২৫১, ২৫৩, ২৫৫-৬৪, ২৮৫, ৩০১-০২, ৩০৪, ৩১১, ৩১৩, ৩১৬, ৩২৩, ৩২৫, ৩৩৮, ৩৪১-৪৪, ৩৫২-৫৪, ৩৫৬-৫৭, ৩৬০
লীলাবতার—১০৬, ১০৯-১১, ১১৭, ১৮০
শক্তি—৮০, ৮৮, ৯০-৯১, ৯৮, ১২৩-২৪, ১২৭-২৮, ১৩৫, ১৫৯, ১৬৪-৭০, ১৭৮, ২১৬-১৮, ২৪৫, ২৭২, ২৮০, ৩১০-১১, ৩১৪-১৫, ৩৫৭
শক্ত্যাবেশ অবতার—১০৬
শঙ্খচূড় (-বধ)—১২৬
শান্ত (-রস, -রতি, -প্রেম)—৪৩, ২৪০, ২৯৬, ২৯৮
শিশুপাল (-বধ)—৮-৯, ১২৩, ১২৭
শুদ্ধভক্ত—২৩৪-৩৫
শুদ্ধা (স্বরূপসিদ্ধা) -ভক্তি—২৯৪, ৩০৮
শুদ্ধসৃষ্টি—১৭-১৮
শুদ্ধাদ্বৈতবাদ —৪২-৪৩, ৯০, ১৬১, ১৬৪
শুদ্ধেতর সৃষ্টি—১৭-১৮
শুভ ধারণা—১৩৫
শুভাশ্রয়—১৩৮-৪১
শ্রীবৈষ্ণব—১৯, ৩৭-৩৯, ৪১-৪২
শ্রীমূর্তি —৩১৯, ৩২৫-২৬
শ্বেতদ্বীপ—২৫-২৬, ১৮১, ১৯০, ২০৪, ২০৬, ২১৯
সংবিৎ—১৫৯, ২১৬, ২৭২
সখী (-ভাব, -ভজন, -সাধনা)—৩৮, ৩০৩, ৩০৫-০৬, ৩১৩
সখ্য (-রস, -প্রেম, -রতি)—৩৪, ৪৩, ১০০, ১২৩-২৫, ১৯৬, ২৪০ ২৯৭-৯৮, ৩১৩-১৫, ৩২১, ৩২৬-২৭, ৩৩০
সজাতীয় ভেদ—১৫৯, ১৬২-৬৪, ১৭০-৭২

সত্ত্বনিধি—১০৪
সনক সম্প্রদায়—৩৯, ৪২
সন্ধিনী (আধারশক্তি)—১৫৯, ২১৬, ২৭২
সপ্তদশী কলা—২১৩
সমঞ্জসা (রতি)—২৭২-৭৫, ২৭৭
সমর্থা (রতি)—২৭২-৭৪
সাংখ্যদর্শন—১৮, ২১, ২৩, ২৯১
সাত্বত (-জাতি, -বিধি, -শাস্ত্র)—৫-৬, ১৪-১৫, ২৪, ৪৪, ৫১, ৬৭, ১৫৬
সাধনভক্তি—২৩৫, ২৩৭, ২৯২, ২৯৬, ৩০৮, ৩১৮, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৯
সাধারণী (রতি)—২৭২-৭৫
সাধুসঙ্গ—২৩৪-৩৫, ৩১৯-২১, ৩২৯
সাধ্য (প্রীতি, প্রেম)-ভক্তি—২৯২-৯৩, ২৯৬, ৩০৮
সিদ্ধদেহ—২৯১, ৩১৬
সিদ্ধপুরুষ—১১৮
সিদ্ধাবস্থা—৩১৪
সুফী—২৫৮
স্থিতপ্রজ্ঞ—১৩৯-৪০
স্বকীয়া—৩৪, ৩৮, ৪২, ২৪১-৪২, ২৪৬, ২৮২, ৩৫২-৫৩, ৩৫৮-৬১
স্বগত ভেদ—১৫৯, ১৬২-৬৪, ১৭০-৭২
স্বয়ংরূপ—১০৫, ১১১, ২১৫
স্বরূপভেদ—১৭১
স্বরূপশক্তি (চিৎশক্তি)—৮৮, ৯০-৯১, ৯৮, ১২২-২৩, ১২৭, ১৩৫, ১৫০, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৯-৭০, ২১৬-১৭, ২৪৫, ২৭২, ২৮০, ৩১০-১১, ৩১৪-১৫, ৩৫৭
হরীশক—৭৪-৭৫,২৪৭-৪৮
হিরণ্যগর্ভ—১৫৬,
হ্লাদিনীশক্তি—৪৩, ৮০, ১৫৯, ২১৬, ২৭২, ৩৫৬, ৩৫৮

ইংরেজী ঃ

Barth—৫-৬

Buitenen J. B. Von—১৫৮

Colebrooke—২৪, ৫৩

Comparative Studies in Vaisnavism & Christianity—২৬

Eckhart Meister—২৫২

Garbe—১২, ৫৩

Grierson—২৭, ৫৩

Guenther H. V.—১৮৩

Hopkins—৫

Idea of the Holy (The)—৭৯, ১৭৭, ১৮৪

Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita—১৬

In Tune with the Infinite—১৯৯

Keith—৫, ৩০, ৫৩

Life Divine (The—১৯৭

Monier Williams—৮২

Mysticism—২৫৮

Old Testament—২৪১

Orphic Mysteries—২৪১

Pargiter—১২

Perseus—১০-১১

Philosophy of the Srimad Bhagavata (The—২৪৯

Philosophy of the Vaisnava Religion (The)—৯৭

Plotinus—২৪১

Pusalkar A. D—৫১

Ralph Waldo Trine—১৯৯

Rudolf Otto—৭৯, ১৭৭, ১৮৪

Sarma D. S—৫০
Schrader F. O.—১৫, ১৬, ১৯, ৫৩
Shakespeare—৯৫
Spiritual Marriage —২৪১
St. Paul—২৩৮
The Subhasraya Prakarana and the Meaning of Bhavana—১৩৯
Underhill (Mrs)—২৪০-৪১, ২৫৮
Weber—১০, ২৪-২৭, ৫৩
Winternitz—১২, ৫৩
Yuganaddha—২৮৩

শ্লোক-সূচী

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা··· ··	১৭৫
অজাতপক্ষা ইব মাতরং··· ··	১৪৫
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে······	৫৪
অনয়ারাধিতো নূনং······	২৭০
অনুগ্রহায় ভূতানাং······	২৪৫, ৩৪৩
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং······	২৯২
অবজানন্তি মাং মূঢা····	১৪২
অয়ি নন্দতনুজ······	৩৩০
অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব······	২০১
অহমাত্মা গুড়াকেশ······	১৩৪
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং······	২১২
আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া······	১৩০
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং······	৩০৬
আসামহো চরণরেণু······	২২৯
ইতি মতিরুপকল্পিতা··· ·	৯৩, ১৮০
ইদং বৃন্দাবনং রম্যং··· ··	২২১
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং ····	১১৩
উভয়োর্ভাবমুন্নীয়······	২৩৮
একঃ স কৃষ্ণো······	১৭২
একাত্মনীহ······	২৮১
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ ···	১৮১, ১৮৮
এবং বহুবিধৈ রূপৈ······	২০৩
এবং মদর্থোজ্ঝিত······	২৪২
এষ প্রকৃতিরব্যক্তো······	১১২
ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য······	১৫৩
কথং পুরাণসারাণাং······	২৬৩
কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু·· ··	৬৫

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো······	১৭৫
কৃষ্ণ এব হি··· ··	১১২
কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধং······	২২০
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা······	৩০৯
কৃষ্ণমেনমবেহি······	৯০, ১৪০, ২৪৪
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্ত······	৩২৮
কৃষ্ণস্তু পূর্ণতমতা—	২১১
গোপকৈঃ সহিতস্তত্র······	২২১
চয়ন্বিষামিত্যবধারিতং······	১৫৭
চিত্তস্যাভিনিবেশেন······	৩২৪
চেতোদর্পণমার্জনং······	৩২১
জন্মাদ্যস্য যতো······	১৩৬
জয়তি জননিবাসো······	৯৬
জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো······	১৬০
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য······	১৫৩
তমিমমহমজং······	১৫১-৫২
তং বন্দে পরমানন্দং······	১৯৬
তদ্ব্রহ্ম তৎ পরং······	১৫৮
তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য······	৬৫
তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ······	২৪২
তৃণাদপি সুনীচেন······	৩৪৬
তেষাং গোপবধূ······	৬৬
তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবী······	২৭০
ত্বমস্য জগতো······	৭০
ত্বমাদিদেবঃ······	১৩৪
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং······	১০৮
দশমে দশমং······	১৩৬
দুরারাধ্যা রাধা······	৬৫-৬৬
দূরং দৃষ্টিপথাত্তিরোভব······	২৭৮

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং…… ১৪০
দেবস্তৈব স্বভাবো…… ৭২
দেবী কৃষ্ণময়ী…… ২৮০
দ্বা সুপর্ণা সযুজা…… ১৫১
ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট…… ২৪৩
ন তথা মে প্রিয়তমো…… ২৬২
ন তেঽভবন্বেশ…… ৭১
ন দ্বারবন্ধাবরণা…… ২১৪
ন বিনা বিপ্রলম্ভেন…… ২৫৭
ন সাধয়তি মাং যোগো …… ২৩৪
নাতঃ পরং পরম…… ১৪১
নানোপচারকৃত…… ৩০৯
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য…… ৩২২
নিগমকল্পতরো…… ৭৫
নেষ্টা যদ্ অঙ্গিনি…… ২৩১
নৌমি চন্দ্রাবলীং ভদ্রা…… ২৬৮
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্…… ২৪২
*পরাকৃতমনোদ্বন্দ্বং…… ১৯৯
পরিত্রাণায় সাধূনাং…… ১১৩
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং…… ১৯১
পরোক্ষপ্রিয়া ইব …… ১৭৫
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ…… ১৭৫
পিতাঽহমস্য জগতো…… ১১২
পুরুষমৃষভমাদ্যং…… ১৮০
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ…… ১০২
প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি…… ৯০
প্রীত্যো বভূব…… ৪৯

*এই শ্লোকের পাঠান্তর 'শুদ্ধি ও সংযোজন' অংশে দ্রষ্টব্য

বংশস্থ ভগবান্ রুদ্রঃ······ ২০৩
বংশীবিভূষিত······ ১৯৯
বংসৈর্বৎসতরী······ ৯৬, ৩৪৯
বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং······ ১৪৮, ১৭২
বনে বৃন্দাবনে ক্রীডন্······ ২০৩
বসন্তি যত্র ভূতানি······ ১৫৩
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্······ ১২২
বহু বার্যতে খলু······ ৩৬১
বাল্যস্ত পঞ্চমাব্দান্তং······ ৩৬১
বিক্রীডিতং ব্রজবধূভি······ ২৬১-৬২
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য······ ২১৫, ২২১
বৈকুণ্ঠাদপরো লোকো······ ২১২
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপত্বং······ ২০১
ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং······ ৮৮
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া······ ২৩৬
ভগবানপি তা রাত্রীঃ······ ২৬৫
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ······ ২৯২
মন্মনা ভব মদভক্তো······ ২৩৬
মম নাম সদাগ্রাহী······ ৩২৬
ময়া ততমিদং সর্বং······ ১৪৪
মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈ······ ২৭৭
মুহু মারুএণ······ ৪৭
মেঘৈর্মেদুরমম্বরং······ ৬৪-৬৫
মৈথুনং সহ কৃষ্ণেন······ ২৬২
যঃ কৌমারহরঃ······ ৩৬১
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং······ ১৮৩
যথা রাধা প্রিয়া······ ৬৪
যদা যদা হি ধর্মস্য······ ১১৭
যদা যদাধর্মস্য গ্লানিঃ······ ১২০

যদোর্বংশং নরঃ······ ৮৮
যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং······· ৮৮
যমুনাজলকল্লোলে ···· ২২১
যশঃ প্রভৃত্যেব··· ·· ৩২৪
যস্মাৎ ক্ষরমতীতে ··· ১৮৯
যাতে দ্বারবতীং······ ৬৬
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ····· ২৬৬
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে······ ২৬০
রাধয়া মাধবো দেবো ····· ৬৫
রাধা-বিলাস-রসিকং··· ·· ৬৫
রামাদিমূর্তিষু······ ১১৪, ১২৬
রামানুজং শ্রীঃ····· ৬৪
রুক্মিণী দ্বারবত্যাং··· · ৬৪০
লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং······ ৩৫১
শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা······ ৫৯
শৃঙ্গাররসসর্বস্বং······ ১০২
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ····· ৩৪৫
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা······ ৩৪৩
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা··· ·· ৬৪
সংভর্তেতি তথা ভর্তা······ ১৫২
স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম— ১৫৮
সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ······ ২৮০
স দেবো বহুধা······ ১১২, ২০১
স বেদৈতৎ······ ১৩৩
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য······ ১৩৭, ২৩৬
সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী······ ২৭৯
সহস্রপত্রং কমলং······ ২১১
সূক্ষ্মাবস্থা তু সা······ ৫৯
সুরিস্-সুহৃদ্-ভাগবত স্··· ··· ১৫

সৃষ্ট্যাদিকং হরের্নৈব…… ১০২

স্তবন্তি সততং যস্য…… ১৯৬

স্ত্রীণাং বিলাসবিব্বোকবিভ্রমা…… ৮৯

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়…… ১৫৮

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ…… ৩৫৫

গ্রন্থপঞ্জী

[উল্লেখপঞ্জী-বহির্ভূত আর যে-সব গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে]

সংস্কৃত ঃ

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ ১৩৬৬

ধ্বন্যালোক (আনন্দবর্ধন)—সম্পাদনা শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ১৩৫৭

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা—
সম্পাদক —শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ১৩৪৫

ঐ —শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে
শ্রীঅনিলবরণ রায়, ১৩৪৬

ঐ —শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, ১৩৩৭

বাংলা ঃ

অচিন্ত্যভেদাভেদ—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ১৩৫৭

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য—ঐ, ১৩৬০

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—শ্রীহরিদাস দাস, চৈতন্যাব্দ ৪৭০-৭১

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, ১৩৬৩-৬৫

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—শ্রীহরিদাস দাস, ৪৬২ চৈতন্যাব্দ

গৌরসুন্দর (শ্রীশ্রী)—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, ৪৪৭ চৈতন্যাব্দ

চৈতন্যদেব (শ্রীশ্রী)—স্বামী সারদেশানন্দ, ১৩৬৬

ভারতকোষ ১ম খণ্ড,

ভারতদর্শনসার—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৫৬

ভারতের সাধক ৩য় খণ্ড—শ্রীশঙ্করনাথ রায়,

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ,

শ্যামসুন্দর (শ্রীশ্রী)—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, ১৩৩৯

ইংরেজী :

Bengal Vaisnavism—Bipin Chandra Pal, 1933

Bhakti Cult in Ancient India —Bhagavat Kumar Goswami Sastri, 1922

Bhakti Renaissance—A. K. Mazumdar,

Chaitanya Movement (The)—M. T. Kennedy, 1925

Early History of Vaisnavism in South India—S. K. Aiyanger, 1920

India in the Vedic Age—P. L. Bhargava, 1956

Krishna—a study in the theory of Avataras—Bhagaban Das,

Sree Chaitanya—Tridandi Swami B. H. Bon, 1940

বুধমণ্ডলীর অভিমত

শ্রীচৈতন্যমঠ (মায়াপুর) ও তাহার শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের বর্তমান সভাপতি আচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ বলেন :

নিত্যধামগতা ডঃ সুধা বসু গোস্বামিগ্রন্থসমূহ যত্নের সহিত অনুশীলন করিয়া 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ভক্ত সুধীগণ ইহা পাঠ করিয়া নিশ্চয় আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থখানির ভাষা সরল ও সাবলীল, তজ্জন্য চিত্তাকর্ষক। আমার বিশ্বাস, ইহা বাংলা সাহিত্যসম্পুটের একখানি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

* * *

মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি ভাগবত-গঙ্গোত্তরী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেন :

'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলাম। এক কথায় অতি উপাদেয়। বিস্তৃত অধ্যয়ন বা গভীর বিদ্যাবত্তাতেই ইহা সম্ভব হয় নাই। লেখিকার তপস্যা আছে, সদ্গুরুর করুণাদৃষ্টিসম্পদ আছে। গৌড়ীয় গ্রন্থসমূহের নির্যাস সুনিপুণ লেখনীমুখে প্রকটিত হইয়াছে।

অবতরণিকাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, ঐশ্বর্য-মাধুর্য-ভগবত্তা, ধামের নিত্যতা, গোপিকা ও রাধিকার স্বরূপ, রাসলীলার অনির্বচনীয় মধুরিমা, উপসংহারে সাধনার ধারা—প্রত্যেকটি বিষয়ই শাস্ত্র-নিষ্ঠা ও নিবিড় অনুভূতির স্বাক্ষর বহন করে।

শুনিয়াছি লেখিকা এই মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আমাদের মধ্যে থাকিলে এই লেখনী হইতে আরও দান পাইতাম। মনে হয়, অল্প বয়সেই চলিয়া গিয়াছেন। পরিণত বয়স হইলে, সাধনা আরও পরিপক্ক হইলে দুই একটি স্থলের কিছু পরিবর্তন নিজেই করিয়া যাইতেন। যেমন, লিখিয়াছেন—অপ্রকট লীলা হৃদিবৃন্দাবনেই। এস্থলে লিখিতেন—হৃদিবৃন্দাবনে তো বটেই, নিত্যবৃন্দাবনেও। নিত্যবৃন্দাবন শুধু ভক্তমানসেই নহে, তাহা একটি প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত লীলা-ভূমি, ভক্ত-হৃদয়ে তাহার প্রতিফলন মাত্র। গ্রন্থপাঠে মনে হইল, মহদ্ভক্তের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় প্রসাদপ্রাপ্তি ঘটিল।

* * *

প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী (শ্রীগৌরাঙ্গমন্দির, শ্রীভূমি, কলিকাতা-৪৮) বলেন:

'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' জিজ্ঞাসু পাঠকের মৌলিক উপজীব্য হয়ে থাকবে। বিদুষী লেখিকা পুরাণ-ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়ে, আধুনিক মনীষীদের ভাবধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হলেও, প্রাচীন ঐতিহ্য-সংরক্ষণে সর্ব ক্ষেত্রেই সদাজাগ্রতা। তিনি পূর্বাচার্যগণের মতবাদ শ্রদ্ধাপূর্ণ নৈপুণ্যে নিজস্ব ভাষাগৌরবে স্পষ্টতররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি অসাধারণ ভাবভক্তি ও মননশীলতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার মর্মবাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের ধারায় অভিব্যক্ত করেছেন। এই ধারার ঐতিহ্য, সুপ্রাচীনতা, প্রামাণিকতা ও উৎকর্ষ যে সর্ব-ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে অভিনব দান সে কথা এ গ্রন্থে নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ভাবনা বিজ্ঞানসম্মত, অবিসংবাদিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী—এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। সখীর আনুগত্যে মঞ্জরী-ভাবনায় শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের সেবা-আরাধনাই যে ভগবৎ-সাধনার চরমোৎকর্ষ এবং স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে এই সাধনার প্রবর্তক, তা লেখিকা এমন নিপুণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে সাধারণ পাঠকও সম্পূর্ণভাবে তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবেন। গবেষণার ক্ষেত্রে গভীরতা ও রচনারীতির সাবলীলতায় লেখিকার ভাবৈশ্বর্য ও রসানুভবের মাধুর্য সুপরিস্ফুট। ভাগবতকে ভালো না বাসলে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলে গ্রহণ করে শ্রীরাধাপদাব্জমাধুর্য আস্বাদন-লালসার উদয় না হলে কেবল পাণ্ডিত্যের অভিমানে এ জাতীয় গ্রন্থরচনা সম্ভব নয়।

* * *

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

ডঃ সুধা বসু রচিত 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' শীর্ষক গ্রন্থখানি পাঠ করেছি। পাঠ করে আমার মন যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদের অনুভূতিদ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছে। আনন্দ এই কারণে যে, গ্রন্থখানি সুন্দর ভাষায় নিষ্ঠাসহকারে লিখিত একটি সুপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষাদ এই কারণে যে, তিনি এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হতে দেখলেন না, প্রকাশিত হবার আগেই চলে গেলেন। গ্রন্থের একস্থানে তিনি এই বলে খেদ প্রকাশ করেছেন যে তাঁর আচার্য শিবপ্রসাদ

ভট্টাচার্য মহাশয় এ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার আগেই পরলোকগমন করেছেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে সে মন্তব্য নিজের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হল্যে গেল।

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ'। তা কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। তাঁর আলোচিত বিষয় আরও অনেক বিস্তৃত। ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে অবতার হলেন, তারপর স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকৃতি পেলেন, পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যরূপে রাধভাবের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ হলেন, তার ইতিহাস এখানে দেওয়া হয়েছে। আনুষঙ্গিকভাবে ভাগবতধর্মের অন্তর্ভুক্ত নানা বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ফলে শুধু শ্রীমদ্‌ভাগবত নয়, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, রূপ ও জীব গোস্বামীর গ্রন্থাবলী, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ভাগবতধর্ম কেমন ভাবে বিকাশ লাভ করেছে তাও আলোচিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এটি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের একটি ব্যাপক আলোচনা গ্রন্থ।

গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা প্রাঞ্জল হওয়ায় এবং ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি আলোচিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য শুধু নয়, রসোত্তীর্ণও হয়েছে। চোদ্দটি অধ্যায়ে আলোচিত গ্রন্থখানি বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কোনো কৌতূহলী পাঠকের তৃপ্তিসাধন করার ক্ষমতা রাখে।

* * * *

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য পি আর এস বলেন:

ডঃ সুধা বসু রচিত 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' নামক গবেষণা-নিবন্ধটি ভক্তিসাহিত্য তথা ভাগবতধর্মের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক লইয়া একটি মূল্যবান্ আলোচনা। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', তিনিই সেই অদ্বয়তত্ত্ব যাঁহার সাধনায় যোগিগণ নিমগ্ন। কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য অতলস্পর্শী, দুরধিগম, অনির্বচনীয়, ভক্তসাধকের অনুভবমাত্রবেদ্য। কত কবি, কত র্মজ্ঞ, কত দার্শনিক মনীষী কৃষ্ণের সেই অলৌকিক মহিমা কত বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই না বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে অতি প্রাচীনকাল হইতে যে সুবিশাল সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা যেমনই ব্যাপক, তেমনই দুরবগাহ। বিদুষী লেখিকা তাঁহার এই নিবন্ধে ভক্তিসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, কৃষ্ণ-

চরিত্রের মূল হইতে বিচিত্র পরিণতি, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব, বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের সহিত আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদের সংঘর্ষ ও বিরোধ, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভাগবতধর্মের প্রসার ও রূপান্তর, শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণচরিত্রের যোগ ও তাহার ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি দুরূহ ও কৌতুহলোদ্দীপক তত্ত্ব ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক অজস্র তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অধ্যয়নের ব্যাপকতা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রসজ্ঞতা যুগপৎ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল আকর গ্রন্থের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় যেমন ইহাতে সুস্পষ্ট, আধুনিক দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মমীমাংসকগণের গবেষণাগ্রন্থ এবং তাঁহাদের পরস্পরবিরোধী মতবাদ ও ব্যাখ্যানপদ্ধতির সহিতও তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় এই গ্রন্থের সর্বত্র সুপরিস্ফুট। শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর চরিত্র ও তৎপ্রবর্তিত ভাগবতধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষায় এযাবৎ যত নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, আমি আশা করি, ডঃ বসুর এই গ্রন্থখানি তন্মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ও জিজ্ঞাসু পাঠকগণের কৌতূহল আরও উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে।

* * *

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী বলেন :

দিব্যধামগতা, পরম স্নেহভাজন ডক্টর সুধা বসুর 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি পাঠ করে বিশেষ আনন্দিত হলাম। আমাদের শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবানকে লাভের তিনটি শ্রেষ্ঠ উপায় হল: জ্ঞান, ভক্তি ও (নিষ্কাম) কর্ম। এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আমাদের দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বে বহু আলোচনা-প্রপঞ্চনা ও মতভেদ আছে—বিশেষ করে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে বিরোধের কথা ত সর্বজনবিদিত। কিন্তু ভারতদর্শনসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে সার্বজনীন, উদার, মহান পন্থাই মোক্ষের একমাত্র প্রকৃষ্ট সাধন। সুমধুর বৈষ্ণবধর্ম এরূপ সমন্বয়েরই মূর্ত প্রতীক। বৈষ্ণবধর্মগতপ্রাণা ডক্টর সুধাও যে তাঁর জীবনে

সমন্বয়ের স্বর্ণ-সিংহাসন স্থাপিত করতে পেরেছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই সুন্দর গ্রন্থখানি যেখানে অপরূপ মহিমায় জ্ঞানী ও ভক্তের মিলন সংঘটিত হয়েছে। এই গ্রন্থে একদিকে আমরা যেমন প্রমাণ পাই তাঁর গভীর জ্ঞানের, অন্যদিকে তেমনি পরিচয় পাই তাঁর প্রগাঢ় ভক্তিরও। তাই তাঁর গ্রন্থখানি কেবলমাত্র গবেষণাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-সমাহারই নয়, তার চেয়েও বড় কথা এটি পরমপুরুষের একটি অনুপম ভক্তিরসসিক্ত বন্দনাগীতি এবং সেইজন্যই অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ও তৃপ্তিদায়ক। বিদগ্ধা গ্রন্থকর্ত্রীর এটাই বিশেষ কৃতিত্ব।

যদিও লেখিকা তাঁব এই সার্থক গ্রন্থখানির প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি তবু তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি আমরা অনুভব করি তাঁর প্রাণপ্রতিম গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। তাই তার অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা .শাক করব না, কারণ তিনি যে অপূর্ব ভক্তিকুসুম বেখে গিয়েছেন ‹ার মধ্য দিয়েই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার ডঃ নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী বলেন:

ডঃ সুধা বসুব 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটি অ্যয়ন করলাম। গ্রন্থটির নাম শুনলে মনে হয়, লেখিকা শ্রীমদ্‌ভাগবতাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আলোচিত হয়েছে। যদিও গ্রন্থের প্রারম্ভে সংকল্পবাক্য প্রকাশিত হয়েছে—"ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইব, কারণ, আমাদের অনুভবে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে ব্রজলীলাই শ্রেষ্ঠ। এই লীলাতেই প্রেমঘন, আনন্দসর্বস্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় শক্তির পরিপূর্ণতম প্রকাশ" (পৃঃ-২) তথাপি এই গ্রন্থে অবতারতত্ত্ব, আশ্রয়তত্ত্ব, উদ্ধব ও বৃন্দাবনতত্ত্ব, সাধনার ধারা - ভৃতি বিবিধ বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, লীলা প্রভৃতি অতি বিচিত্র ও ভাবৈকবেদ্য। যার যেমন স্বভাব ও ভাব, তার তেমন অনুভব। কেউ বলে, তিনি নগণ্য মানব, কেউ মনে করে শরণ্য বরেণ্য দেবদেব। মাথুররঙ্গসভায় মূঢ় সভয়ে দূরে যায়, ভক্ত নিগূঢ়ভাবে

মুগ্ধ হয়। একই সময়ে মল্লগণের নিকট দর্পনাশী অশনি, রমণীনয়নে কমনীয় কন্দর্প, গোপগণের জীবনসম স্বজন, মাতাপিতার নয়নমণি স্তনন্ধয় তনয়, ভোজপতি কংসের ধ্বংসকারী মরণ, অসজ্জনের শাস্তিকারী শমন, অবিদ্বানের নিকট বিরাট, যোগীর সমাধিতে স্বরাট। শ্রীমদ্‌ভাগবত এইভাবে ভাবানুরূপরূপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে গ্রাহ্য বলেছেন। ডঃ সুধা বসু আধুনিকভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে রাষ্ট্রনীতিবিদ্, কূটনীতিজ্ঞ, দার্শনিক, রাজন্যবর্গের ভাগ্যবিধাতা বলেছেন। আধুনিক ভাববশতই লেখিকা এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-অলোচনার সার প্রকাশ করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ভারতীয় সাধনার বিবর্তনের ফলে পাঠকের চিত্তে গোপনায়কের স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে দেবতার স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, কিভাবে তাঁহাতে ভগবত্তা আরোপিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিভিন্ন লীলা পৌরাণিক যুগ হইতে চৈতন্য যুগে, প্রাকৃত লীলা হইতে অপ্রাকৃত লীলায় পরিণতি লাভ করিয়াছে" (৮৭ পৃঃ)। এইরূপ আলোচনায় শ্রীভাগবতশাস্ত্র ও ভাগবতাচার্যগণ অপেক্ষা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-পুঙ্গবগণ ও তদীয় ভারতীয় শিষ্যগণ অধিকমাত্রায় অনুসৃত হয়েছেন। এই জন্যই গ্রন্থের অবতরণিকায় শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা বিচার, শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ মানব, শ্রীকৃষ্ণ এক, না, একাধিক, ঋগ্বেদ ও পুরাণের কৃষ্ণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও পুরাণের কৃষ্ণ, পুরাণের কৃষ্ণ ও খৃষ্টান প্রভাব প্রভৃতি আলোচনায় লেখিকা প্রবৃত্ত হয়েছেন।

জিহ্বা কোমল ও কুশল, মাতৃস্তন্যপানে অনুপম অদ্বিতীয় উপায়। এতে মাতা প্রসন্নতায় সার্থক হন, পিপাসু তনয় তুষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্য গ্রহণ করলে মাতার স্বর্গীয়তার অপমৃত্যু হয়, পিপাসু হতাশার বিষমতায় বিড়ম্বিত হয়। স্তনন্ধয় তনয়ের মাতৃস্তন্যের মত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, লীলামাধুর্য জীব নিবহের জীবাতু। ভাগবতানুগত্যকোমল, শ্রদ্ধাকুশল লালসা-রসনায় আস্বাদন করলে শ্রীকৃষ্ণ কৃতার্থতায় উদ্ভাসিত হন, বাঞ্ছিততম বস্তুপ্রাপ্তিতে আস্বাদকের অন্তর নিরন্তর তৃপ্তি ও উৎকণ্ঠায় উচ্ছ্বসিত হয়। অবিশ্বাসতীক্ষ্ণ স্বাধীন যুক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ কাতর হন, ভাবুকের বুকে আঘাত লাগে।

গ্রন্থের শেষের দিকে আলোচ্য বিষয়গুলির বিশ্লেষণে শ্রীভাগবতসন্দর্ভাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে অনুসৃত হওয়ায় লেখিকা সফলতা লাভ করেছেন। পরিশ্রম, প্রজ্ঞা ও প্রতিভার দ্বারা অধিকারানুরূপ অনুশীলন করে লেখিকা ঐ সকল দুরূহ গ্রন্থের মর্ম স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ সকল শাস্ত্র এবং প্রকৃত সিদ্ধান্তবেত্তা

আচার্যগণের অনুসরণে আলোচ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে হলেও সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তার ফলে লেখিকার সার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণই প্রাণনাথ ও সাধনার ধারা প্রকাশ করে ডঃ সুধা বসু গ্রন্থটির সমাপ্তি করেছেন। মর্মন্তুদ সমাচার হলো এই যে, শ্রীকৃষ্ণই প্রাণনাথ ও তাঁর সাধনার ধারা মনন করে লেখিকা নিজ জীবনেরও সমাপ্তি করেছেন। লেখিকার অন্তিম সময়ের ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দসান্নিধ্যনিধির প্রাপ্তি হোক এবং এই 'ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটি পাঠকসমাজে পঠিত, পরীক্ষিত ও যথোচিতভাবে পুরস্কৃত হোক এই কামনা করি।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	পঠিতব্য
দশ	১৪	‘বিবিধ’-এর পর ‘ইংরেজী’
তের	৭	‘সাহায্যে’-র পর ‘কয়েকটি প্রসঙ্গ’
ছত্রিশ	১৯	আশ্লিষ্য
৮	২১	স্কন্ধের
৩৮	১১	শাস্ত্রেও
৪২	২৩	মাধবাচার্য
৫৫	২৬	তত্রভবতঃ
৬৪	২৭	বনভুবঃ
৭২	১৪	সজাতীয়
৭৮	১৪	বসুদেবের
৮৫	২	রচয়িতার
৮৮	৫	পরব্রহ্ম
৯৩	১৭	বিট্‌ঠলাচার্য
৯৪	৬	‘আরও’-এর স্থলে ‘তা ছাড়া’
১০২	১০	শৃঙ্গাররস · র্বধং
১১৫	৪	ভগবৎসন্দর্ভ
১১৬	১৬	কারুণিক
১৩০	৬	অন্যান্য অবতারে দেখা গেলেও
১৩৬	১৫	(আশ্রয়তত্ত্বকে)
১৪৭	১৩	গীতবিতান
১৫৪	৬	ভগবৎসন্দর্ভ
১৫৮	৪	যস্মিংশ্চ
১৬০	২৪	শ্লোকটির
১৭০	১০	সজাতীয়
১৭২	২৫	তাহা
১৯৬	১	ভবন্তি সততং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	পঠিতব্য
১৯৯	২৭-২৮	পাঠান্তর : পরাকৃতনমদ্‌বন্ধং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। সৌন্দর্যসারসর্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ ॥
২১২	২৩	ব্রহ্মানন্দে
২২৫	২৪	পঞ্চ মহাভূত যেমন ····
২৬৮	১১	উক্তির্ণ তু
৩২২	২৬	বাচ্য
৩২৫	১৭	বাসং
৩৪৩	২০	পরম করুণাময়
৩৪৬	২৪	ভক্ত্যুখ
৩৫৮	১২	জাতু
৩৬১	৩০	সা চৈবাস্মি
৩৬৪	৭	কৌষীতকি
৩৬৪	১৮	গোপালচম্পূ—১৯২
৩৬৯	৪	১৮৯
৩৬৯	৮	৯০
৩৬৯	১৪	২৬৩
৩৮০	১১	একান্তিক, ঐকান্তিক, একান্তিকবাদ
৩৮১	৬	২১৮-২২২
৩৮২	৩	দাস্য—২৪০
৩৮৮	২৭	হ্লাদিনীশক্তি